www.banglainternet.com
represents

Srershto Biggan Bisoyok Rochona

Abdullah Al Muti

সূচি

জীবন বিজ্ঞান ও ভাষা	১৫
মরুর দেশের বিজ্ঞান	১৯
সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানচেতনা	৩০
বিকিনি	৪৩
আন্তর্জাতিক ভূতত্ত্ব-বর্ষ	৫০
সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এত জরুরি কেন	৫৯
জীবাণু ও মানুষ	৬৩
বিজ্ঞান ও শিশু-সাহিত্য	৭৪
রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচিন্তা	৮৩
প্রযুক্তি ও তৃতীয় বিশ্ব	৯৫
বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান	১০৯
জ্যোতিষ বনাম জ্যোতির্বিদ্যা	১১৮
বিজ্ঞান-বিপ্লব ও বিজ্ঞান-লেখক	১২৮
মানুষ ও তার পরিবেশ	১৩৯
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য	১৫৩
পরিবেশের সংকট ঘনিয়ে আসছে	১৬২
জলাজমি যেন সোনার খনি	১৭৪
নদীরা হ্রদেরা কেন মরে যায়	১৮২
জীবজগতের বৈচিত্র্য কমে আসছে	১৯১
লবঙ্গ-এলাচের সুরভি ও প্রজাতির উৎস	২০২

banglainternet.com

জীবন বিজ্ঞান ও ভাষা

ভাষার রূপ সম্পর্কে পণ্ডিতজনের মধ্যে মতামতের নানা বিভিন্নতা থাকলেও এ বিষয়ে সবাই একমত হবেন যে, ভাষার কাজ হচ্ছে প্রধানত মনের ভাব প্রকাশ। আবার এই ভাব প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য হল পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। তা'হলে দেখা যাচ্ছে, পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উপায় এবং উপকরণ হিসেবেই ভাষার প্রধান সার্থকতা। সভ্যতার অগ্রগতির ফলে সমাজের উৎপাদন প্রক্রিয়ার এবং সামাজিক সম্পর্কে জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও সৌকর্য সাধনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

আমাদের পরিবেশের রয়েছে তিনটি মৌল উপাদান। এই তিনটি উপাদানের চরিত্র অনুযায়ী তিন ধরনের নিয়ন্ত্রণের সমস্যা দেখা দেয়। যেহেতু ভাষার জন্ম পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে, অতএব ভাষাকে এই তিন ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। পরিবেশের এই প্রধান উপাদান তিনটি হল : (ক) আমাদের চারপাশের প্রকৃতি (জৈব ও জড়) এবং এই প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক; (খ) চারপাশের মানুষের সমাজ— মানুষে মানুষে সম্পর্ক, ব্যক্তির সাথে ব্যক্তি, ব্যক্তির সাথে গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীর সাথে গোষ্ঠীর সম্পর্ক; এবং (গ) আমাদের নিজের সাথে নিজেরই সম্পর্ক, ব্যক্তির সাথে তার অন্তর্লীন ব্যক্তিসত্তার সম্পর্ক। সাহিত্যকে যদি মানুষের নিরন্তর সংগ্রামের সাথী হতে হয়, ক্রমান্বয়ে তার উন্নততর রূপান্তরের সহায়ক হতে হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তাকে এই তিন ধরনের উপাদানেরই যোগান দিতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাভাষায় আবেগমূলক রচনার আধিক্য যতখানি, ব্যক্তিমানসের আত্মকণ্ডুয়নের চর্চা যত প্রবল, প্রকৃতি সম্পর্কিত, প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক রচনার সংখ্যা তেমনি নগণ্য। বাংলাভাষায় যত বই প্রতিবছর লেখা হয় তার শতকরা একভাগও প্রকৃতির বিষয়ে, বিজ্ঞান সম্পর্কে লেখা হয় কিনা সন্দেহ।

banglainternet.com

এক হিসেবে মনে হতে পারে প্রকৃতির সাথে আমাদের যে সম্পর্ক সে তো হল অতি আদিম সম্পর্ক। সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তার চাইতে জটিলতর এবং নিজের সাথে সম্পর্ক আরো জটিল। সেই জন্যেই আদিম যুগে মানুষের ভাষা ছিল অতি সাদামাটা গদ্য, নিতান্তই প্রয়োজনীয় ক'টি ভাব প্রকাশের

প্রয়োজনে তার সৃষ্টি। তারপর সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে ঘটেছে সাহিত্যের বিকাশ—সাদামাটা গদ্য থেকে উদ্ভব ঘটেছে কাব্য, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যরূপের। কথাটা এক হিসেবে সত্যি, আবার সত্যি নয়ও। মনের সুকুমার ভাবের প্রকাশের জন্যে ভাষার শব্দসম্ভার যতটা বেড়েছে, প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনার বর্ণনার জন্যে বেড়েছে তার চাইতেও বেশি বই কম নয়। বিশেষ করে বর্তমানকালে আধুনিক যন্ত্রযুগের কল্যাণে, ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামে, প্রাণের জটিল রহস্য উদ্ঘাটনে, মহাশূন্য অভিযানে বিচিত্র নতুন নতুন ভাষার সৃষ্টি হচ্ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা ভাষার গায়ে এই ভাষাতাত্ত্বিক আলোড়নের ছাপ এখনো পুরোপুরি পড়েনি। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই যে নতুন ভাষাগত প্রকাশ মাধ্যমের সৃষ্টি হচ্ছে, বাংলা ভাষায় তাকে গ্রহণ করতে না পারলে নিঃসন্দেহে আমরা সভ্যতার অগ্রযাত্রায় পিছিয়ে পড়ব।

সুখের বিষয়, গত এক শতাব্দীর ওপর থেকে বাংলা সাহিত্যের দিকপালরা এ সত্য উপলব্ধি করেছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর বসু প্রমুখ লেখকরা, প্রধানত গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি কল্পনানির্ভর রচনায় আত্মনিয়োগ করলেও বাংলাভাষার দৈন্য উপলব্ধি করে বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাতেও হাত দিয়েছেন।

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে (১২৭৯) সেই প্রবল ইংরেজ আধিপত্যের যুগে বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ করে তার প্রথম সংখ্যাতেই লিখেছিলেন :

> "যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙালীরা বাংলা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই; বাংলায় যে কথা উক্ত না হইবে তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখনও বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা সকল দেশের লোকে বুঝে না, বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর থেকে মাতৃভাষা সম্পর্কে চেতনা বাংলাদেশের বাঙালিদের মধ্যে প্রবল হয়েছে। কিন্তু তা'সত্ত্বেও ভাষা আন্দোলনের পরেও আমাদের লেখকদের রচনায় ভাষার আবেগমূলক, হৃদয়মূলক দিকটির ওপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মননশীল চিন্তা ও কর্মের বাহন হিসেবে ভাষা প্রয়োগের সে ধরনের উদ্যোগ ততটা চোখে পড়ে না। এ যাবত এ জাতীয় উল্লেখযোগ্য যে ক'টি বই প্রকাশিত হয়েছে তা' প্রায় আঙ্গুলে গোনা চলে।

বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আমাদের তিন ধরনের বই-এর প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমত বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার প্রয়োজন বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের জন্য। প্রধানত বিজ্ঞানীদেরই লিখতে হবে এসব রচনা। যাঁরা লিখবেন তাঁদের একাধারে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে বিদেশের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির

সাথে যোগসূত্র বজায় রাখতে হবে আবার বাংলাভাষার ওপরও থাকতে হবে যথেষ্ট দখল।

দ্বিতীয়ত, দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের নানা বিভাগের জ্ঞান বিস্তৃত করতে হবে। এর কিছুটা হওয়া সম্ভব বিদেশী ভাষা থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে। কিন্তু এদেশের মানুষের প্রয়োজনের উপযোগী বই শুধু এ দেশের লোকেই যথাযথভাবে লিখতে পারেন। এ ধরনের বই-এর লেখক বৈজ্ঞানিক হলেই ভালো, তবে না হলেও চলবে যদি বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশনে কোনোরকম বিকৃতি না ঘটে। আবার এ জন্যে বৈজ্ঞানিক ও ভাষাবিদদের সম্মিলিত প্রচেষ্টারও প্রয়োজন হতে পারে। তবে যাদের জন্য লেখা তাদের সমস্যা আগে লেখকদের গভীরভাবে জানতে হবে। কৃষির উৎকর্ষ সম্পর্কে বই লিখবেন যে লেখক তাঁর যদি আমাদের দেশের কৃষকের নানা সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা না থাকে তা'হলে সে বই লেখা নিরর্থক হবে।

তৃতীয়ত, আমাদের দেশের জনসাধারণকে (বিশেষ করে তরুণ সমাজকে) বিজ্ঞানমনা করে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন বিজ্ঞাননির্ভর সাহিত্য। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মুক্তচিন্তা, পরীক্ষা-নির্ভরতা, কুসংস্কার-অবিশ্বাস, প্রকৃতির কল্যাণকর রূপান্তরের প্রেরণা সঞ্চারিত করতে হবে আমাদের সমগ্র সাহিত্যে। এ জন্যে বর্তমান যুগের চালকশক্তি যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক চিন্তা, বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল এবং বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি তার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমাদের সব সাহিত্যিকের অবশ্যই প্রয়োজন।

বিজ্ঞান বিষয়ে রচনার ভঙ্গি কী হবে সে সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। এ বিষয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত রয়েছে এবং বর্তমান স্তরে রচনাশৈলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ পাঠকের জন্যে বৈজ্ঞানিক রচনায় যথাসম্ভব সহজ সরল ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী। তবে বিজ্ঞানীদের নিজেদের মধ্যে ব্যবহারের জন্যে যেসব রচনা তা' যে সকলের জন্যেই সুবোধ্য হবে এমন প্রত্যাশা বা দাবি কেউ করবেন না।

বৈজ্ঞানিক রচনার প্রসঙ্গে পরিভাষার প্রশ্ন কেউ কেউ তোলেন এবং এ সম্পর্কেও বর্তমান অবস্থায় সর্বসম্মত কোনো নীতি রয়েছে বলে মনে হয় না। শ্রদ্ধেয় ড. মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি প্রায় সব বৈজ্ঞানিক শব্দেরই বাংলা প্রতিশব্দ গ্রহণের পক্ষপাতী। আবার বন্ধুবর সুবোধ দাসগুপ্ত 'অ্যাটম' 'এনার্জি' এসব শব্দও বাংলায় চালিয়ে দেবার পক্ষে। বলাবাহুল্য রচনার নৈপুণ্য ও ভাষার প্রসাদগুণে এঁরা দু'জনেই প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় লেখক।

banglainternet.com

বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক রচনার প্রশ্নটি আমাদের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রশ্নের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সাংস্কৃতিক অগ্রগতির কথা কল্পনা করা যায় না। এই সত্যটি উপলব্ধি না করলে বৈজ্ঞানিক রচনার সমস্যাটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার এবং এর সমাধানের দায়িত্বকে খাটো করে ফেলার আশঙ্কা রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক রচনার ক্ষেত্রে আমাদের জনশক্তি বর্তমানে নিঃসন্দেহে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সীমাবদ্ধ জনশক্তির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। এদেশে যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিজ্ঞানকর্মী রয়েছেন তাঁদের সকলের সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে সংগঠিত করতে হবে। কিন্তু তার সাথে দেশে যে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক জাগরণের সমস্যা, জনসমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিস্তার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি উদ্বোধনের সমস্যা, তার সমাধানের দায়িত্ব প্রধানত ভাষা আন্দোলনের ও মুক্তিসংগ্রামের অভিজ্ঞতাস্নাত আমাদের দেশের তরুণসমাজকেই নিতে হবে। মূলত দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনসমস্যার প্রয়োজনে তরুণসমাজ ভাষা ও বিজ্ঞানের হাতিয়ার প্রয়োগে উদ্যোগী হলেই শুধু আমাদের উদ্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ সম্ভব হবে।

[১৩৭৬/১৯৭০]

[উৎস : *বিজ্ঞান ও মানুষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫]

মরুর দেশের বিজ্ঞান

আজ আমরা আমাদের চারপাশে বিজ্ঞানের যে বিপুল ঐশ্বর্যে অভিভূত তার বিস্ময়কর সমৃদ্ধি আকস্মিক ঘটেনি। বিজ্ঞানের বর্তমান আকাশচুম্বী উৎকর্ষের পেছনে রয়েছে সভ্যতার আদি যুগ থেকে শুরু করে ইতিহাসের দীর্ঘ, সর্পিল যাত্রাপথ, দুনিয়ার দেশে দেশে অসংখ্য সত্যসন্ধানীর অক্লান্ত সাধনা, প্রাকৃতিক ও সামাজিক নানা শক্তিকে জয় করার জন্য মানুষের দুরূহ প্রচেষ্টা।

প্রাচীন সমাজে বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছিল প্রধানত মানুষের শ্রম আর অভিজ্ঞতা থেকে : প্রকৃতিকে আয়ত্ত করে খাদ্য উৎপাদন, নিরাপদ আশ্রয় ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ, আর রোগব্যাধির কবল থেকে মুক্তির জন্য মানুষের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার ফল হিসেবে। এসব প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হয়েছিল মানুষের বিপুল অনুসন্ধিৎসা— প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য তার মনের অন্তহীন জিজ্ঞাসা।

আদি সভ্যতার উন্মেষ ঠিক কোথায় সবার আগে হয়েছিল সে-সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। কিন্তু আজ আমরা যে অঞ্চলকে মধ্যপ্রাচ্য বলি তার উষর মরু যে একদিন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার অতি প্রাচীন সভ্যতাকে লালন করেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। নীল নদের অববাহিকা আর মেসোপোটেমিয়ার সেই প্রাচীন সভ্যতার স্রষ্টারা কৃষি, গণিত, জ্যোতিষ, নির্মাণকৌশল প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা বিভাগে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন। মিসর আর ব্যাবিলনিয়ার এই সভ্যতার বিকাশ চিরস্থায়ী হয়নি। মধ্যপ্রাচ্যে এই দু'টি সভ্যতার আলো স্তিমিত হয়ে যাবার পর গ্রিক সভ্যতার ভাস্বর আলোকে বিকশিত হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা— দেখা মেলে থেলিস, ডেমোক্রিটাস, হিপোক্রাটিস, অ্যারিস্টটল প্রমুখ কালজয়ী প্রতিভার।

খ্রিস্টীয় সাল গণনা শুরু হবার আগেই গ্রিক সভ্যতারও পতন ঘটে। তারপর কয়েক শতাব্দী ধরে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দেখা দেয় এক দীর্ঘ অন্ধকার যুগ। বহুদিন পর সপ্তম শতকে আবার মধ্যপ্রাচ্যের আরবদের ওপর এসে পড়ে মানবসভ্যতার ধারাকে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব। গ্রিকদের দাসসমাজের জায়গায় ইসলাম প্রবর্তিত গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এক নতুন সভ্যতার উদ্ভব ঘটায়। অজ্ঞানতার প্রায় অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি জনগোষ্ঠী অল্প সময়ের মধ্যে গ্রিক জ্ঞানবিজ্ঞানকে আত্মস্থ করে জ্ঞানসাধনার একটি নিজস্ব বিশিষ্ট ধারা প্রবর্তন

banglainternet.com

করে। দীর্ঘ সাত-আট শতাব্দী ধরে পূর্ববর্তী গ্রিক, চীনা ও ভারতীয় বিজ্ঞানের সংশ্লেষ ঘটিয়ে আরবের মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাতে নিজেদের মৌলিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাওয়া নতুন তত্ত্ব যোগ করেন। আর প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরবর্তীকালের নবজাগ্রত পাশ্চাত্যের যোগসূত্র ঘটিয়ে তাঁরা মানবসভ্যতার অবিচ্ছিন্ন বিকাশেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

দেশে দেশে বিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন ধারার পরিচয় পাওয়া যাবে দু'একটি ছোট-খাট দৃষ্টান্ত থেকে। চিনির ব্যবহার চীন দেশে প্রথম আবিস্কৃত হয় বলে আমরা জানি। কিন্তু আখের রস থেকে এক ধরনের চিনি তৈরির নিয়ম খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ভারতীয়দের জানা ছিল। ক্রমে ক্রমে ভারত থেকে পারস্যের মধ্য দিয়ে আখের চাষ মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছায়। আরব ও মিসরীয় রসায়নবিদরা চুন ও ছাই-এর সাহায্যে আখের রস জ্বাল করে পরিষ্কার চিনি তৈরির পন্থা আবিষ্কার করেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষে ইতালীয় পর্যটক মার্কোপোলো দেখতে পান, চীন দেশে চিনি তৈরির কলগুলো চালাচ্ছে বেশিরভাগই মিসরীয় কারিগররা।

কাগজ তৈরির পদ্ধতি আবিস্কৃত হয় চীন দেশে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে। চীনের বাইরে প্রথম কাগজ তৈরির কল প্রতিষ্ঠিত হয় মধ্য এশিয়ার সমরখন্দে ৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে। তার পরের বছরই সমরখন্দ আরবদের অধিকারে আসে। এরপর বাগদাদে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয় ৭৯৩ সালে। আরব অধিকৃত স্পেনের মাধ্যমে ইউরোপীয়রা আরবদের কাছ থেকে কাগজ তৈরির কৌশল শেখে মাত্র ত্রয়োদশ শতকে।

সপ্তম শতকের শুরুতে আরবের মরুভূমিতে ইসলামধর্মের অভ্যুদয়ের পর অল্পদিনের মধ্যেই আরবদের অধিকার চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। একটি অধঃপতিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, প্রথাশাসিত সমাজে ইসলামধর্ম গণতন্ত্র, সাম্য ও জ্ঞানচর্চার এক নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করে। আরবদের নতুন সভ্যতার সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অনুকূল পরিবেশও বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হয়। আরব আধিপত্যের ফলে খণ্ড খণ্ড নানা জাতির মাধ্যমে যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় তা জ্ঞানচর্চার পথ বহুলাংশে সুগম করে তোলে। বিশাল এলাকা জুড়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং তাদের আয়ত্ত জ্ঞানভাণ্ডার একটি সাধারণ ভাষা প্রবর্তনের ফলে হয়ে দাঁড়ায় সমগ্র অঞ্চলের সাধারণ সম্পদ।

হজরত মোহাম্মদ (দ.) ইন্তেকাল করেন ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে। তারপর মাত্র বছর দশেকের মধ্যেই ইসলামের জয়পতাকা ছড়িয়ে পড়ে উত্তরে সিরিয়া, পশ্চিমে মিসর আর পূর্বে পারস্য পর্যন্ত। একশো বছরের মধ্যে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা পেরিয়ে স্পেন হয়ে দক্ষিণ ফ্রান্স পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায় আরবদের আধিপত্য। আর পূর্বদিকে তাঁদের অধিকার বিস্তৃত হয় মধ্য-এশিয়ায় সমরখন্দ পর্যন্ত। এই বিশাল

এলাকা জুড়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কেন্দ্র গড়ে ওঠায় কয়েক শতাব্দী ধরে এই অঞ্চল হয়ে দাঁড়ায় দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি।

ইসলামের আবির্ভাবের বহুদিন আগেই গ্রিক সভ্যতা জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। গোঁড়া ও ধর্মান্ধ গ্রিক শাসকরা এথেন্সের বিদ্যাপীঠগুলো উঠিয়ে দিয়েছেন; সম্রাট জাস্টিনিয়ান বিখ্যাত প্লেটোর অ্যাকাডেমি বন্ধ করে দেন ৫২৯ সালে। গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল মিসরের আলেকজেন্দ্রিয়া শহরে। এখানে জ্ঞানচর্চা কিছুটা চলছিল, কিন্তু তারও তখন প্রায় নিভু নিভু অবস্থা। পশ্চিম ইউরোপ তো অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু গ্রন্থ গিয়ে পৌঁছেছিল পারস্য দেশে। পারস্যের জুন্দিশাপুর শহরে আস্তানা গেড়েছিলেন এথেন্স থেকে বিতাড়িত একদল পণ্ডিত। গ্রিক ও সংস্কৃত ভাষা থেকে তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই সিরীয় ও পাহ্‌লভী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। আরবরা পারস্য অধিকার করার পর তাঁরা এসব বই আরবীতে অনুবাদ করার ব্যবস্থা করলেন। ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে দামেশ্‌কে উমাইয়া বংশের পত্তন হয়; এঁরা প্রায় একশো বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই একশো বছর প্রধানত দিগ্বিজয়ের কাল। উমাইয়াদের আমলে মুসলমানদের অধিকার সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা, চীনের সীমান্ত পর্যন্ত মধ্য এশিয়া এবং আফগানিস্তান হয়ে সিন্ধু ও পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সময়ে বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-এর অনুবাদে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়।

অষ্টম শতকের মাঝামাঝি ক্ষমতায় এলেন আব্বাসীয়রা; আর তাঁদের সময়ে দেখা দিল আরব বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ। আব্বাসীয় বংশের দ্বিতীয় খলিফা আল-মনসুর (৭৫৪-৭৭৫) বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন ৭৬২ সালে। এর পরের মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাগদাদ সেকালের দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শহর হয়ে দাঁড়ায়। শুধু যে জনসংখ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য আর ঐশ্বর্যের চাকচিক্যে বাগদাদ বড় হয়ে ওঠে তা' নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার দিক দিয়েও বাগদাদ হয়ে ওঠে সেকালের পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু।

৭৫০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলে বিপুল আকারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্র থেকে গ্রহণ আর আত্মসাতের পালা। এই সময়ের মধ্যে অ্যারিস্টটল, গ্যালেন, প্লেটো, টলেমি, ইউক্লিড, আর্কিমিডিস প্রমুখ গ্রিক মহারথীদের প্রায় সব বই আরবীতে ভাষান্তরিত হয়ে গিয়েছে।

আল-মনসুরের সময়ে বহু গ্রিক বিজ্ঞানীর বই আরবীতে অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়; তার মধ্যে ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস্' (জ্যামিতিতত্ত্ব); টলেমির 'আল-মাজেস্ট' (জ্যোতির্বিদ্যা) এবং হিপোক্র্যাটিস ও গ্যালেনের চিকিৎসাবিদ্যার বই-এর কথা উল্লেখ করা যায়। ৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় এক জ্যোতিষী বিখ্যাত

banglainternet.com

জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই 'ব্রহ্মসিদ্ধান্তে'র এক খণ্ড নিয়ে বাগদাদে হাজির হন। আল-মনসুর অবিলম্বে তারও অনুবাদের ব্যবস্থা করেন।

নবম শতকে বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-এর অনুবাদ ব্যাপক আকারে চলতে থাকে। পঞ্চম আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশীদ (৭৮৬-৮০৯) এবং তাঁর পুত্র সপ্তম আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩) গ্রিক, ভারতীয় ও অন্যান্য ভাষা থেকে অনুবাদের কাজে বিশেষ উৎসাহ দেন। আল-মামুন গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-এর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করার জন্য বাইজান্টাইন সম্রাটের দরবারে এক প্রতিনিধিদল পাঠান। তাঁর উৎসাহে অ্যারিস্টটলের বইগুলো গ্রিক থেকে আরবীতে অনুবাদ করা হয়। এছাড়া ৮৩০ সালে তিনি বাগদাদে 'বায়তুল হিক্‌মা' (জ্ঞানগৃহ) নামে এক বিশাল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এমনি সব উদ্যোগের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে বিজ্ঞানের নানা বিভাগে এমন ব্যাপক চর্চা শুরু হয় যে, দশম-একাদশ শতকে মুসলিম বিজ্ঞানীরা মূল্যবান মৌলিক আবিষ্কার করতে শুরু করেন।

এসব প্রচেষ্টা যে শুধু বিজ্ঞানের তত্ত্বগত আলোচনায় সীমাবদ্ধ থেকেছে তা' নয়। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকেও সমানভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। খলিফা হারুন-অর-রশীদ বাগদাদে একটি সরকারি হাসপাতাল স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এই হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক হয়েছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ আল-রাজি (৮৬৫-৯২৫)। নবম ও দশম শতকের মধ্যে মুসলিম জাহানে অন্তত ৩৪টি হাসপাতাল স্থাপন করা হয়।

আল-মামুন ৮২৯ সালের দিকে পৃথিবীর ব্যাস মাপার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দেখলেন, দুপুরে সূর্য যখন আস্‌ওয়ান শহরে ঠিক মাথার ওপরে, তখন আলেকজান্দ্রিয়ায় সূর্য ঠিক মাথার ওপর থেকে দক্ষিণে রয়েছে ৭° ১২′ কোণ করে। দু'টি জায়গার মধ্যকার দূরত্ব আর এই কোণের মাপ থেকে তিনি পৃথিবীর ব্যাস হিসেব করলেন (আধুনিক এককে) ৭,৮৫০ মাইল। এই পরিমাপ বর্তমান হিসাবের চেয়ে মাত্র মাইল পঞ্চাশ কম।

প্রথম যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে রসায়নবিদ আবু মুসা জাবির ইবনে-হাইয়ানের (৭২০-৮১৩) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কুফায় (বর্তমানে ইরাকের অন্তর্গত) বাস করতেন; হারুন-অর-রশীদের উজির জাফর আল-সাদিক ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু। জাবির ইবনে-হাইয়ান বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে অসংখ্য বই লিখে গিয়েছিলেন। 'জেবের' নামে তাঁর বহু বই ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

জাবির ধারণা করেছিলেন, সেকালে যে ছ'টি ধাতুর (সোনা, রূপা, সিসা, টিন, তামা, লোহা) কথা জানা ছিল, তাদের সবারই মৌলিক উপাদান হল গন্ধক ও পারদ—গন্ধক দেয় দাহ্যতা আর রূপান্তরের গুণ, আর পারদ দায়ী ধাতব

গুণাগুণের জন্য। যেমন, সিসাকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে গন্ধক আর পারদ; আবার এই দু'টি উপাদানকে বিশেষ কৌশলে যুক্ত করে পাওয়া যেতে পারে সোনা। এই সোনা তৈরির স্বপ্নে বিভোর হয়ে তাঁর পরে আরো অসংখ্য ব্যক্তি আল-কিমিয়ার সাধনায় জীবনপাত করেছেন। কিন্তু জাবির তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে নিপুণ ও সুশৃংখল পদ্ধতির প্রয়োগ করেন সে জন্য তিনি 'বৈজ্ঞানিক রসায়নচর্চার জনক' বলে পরিচিতি লাভ করেছেন।

জাবির যে সব প্রধান প্রধান বিষয় উদ্ভাবন করেন তার মধ্যে রয়েছে : সিরকার পাতন থেকে ঘন অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি; রঙিন কাচ তৈরির উন্নত পদ্ধতি; কাপড় ও লোহা সংরক্ষণের জন্য রঙ ও বার্নিশের ব্যবহার; খনিজ থেকে আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি প্রভৃতি ধাতু শোধনের প্রক্রিয়া।

খলিফা মামুনের সময়ে একজন প্রভাবশালী গণিতবিদের আবির্ভাব হয়— তাঁর নাম মুহম্মদ ইবনে-মুসা আল-খোয়ারিজমী (সম্ভবত ৭৮০-৮৫০)। নাম থেকেই বোঝা যায় খোয়ারিজমে (বর্তমান উজবেকিস্তানের খিবা শহর) তাঁর জন্ম। মধ্যযুগের গণিতবিদদের ওপর তাঁর মতো এমন প্রভাব আর কেউ বিস্তার করতে পারেননি।

খোয়ারিজমী ভারতীয় ও গ্রিক গণিতের শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলোর যোগসাধন করেন এবং তাঁরপর তাঁর নিজের আবিষ্কার দিয়ে গণিতশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর মাধ্যমেই প্রধানত ভারতীয় দশমিক সংখ্যাপদ্ধতি পাশ্চাত্যের কাছে পৌঁছায় এবং গণিতচর্চায় বিপ্লব সৃষ্টি করে। বীজগণিতের উদ্ভবও তাঁর এক অক্ষয় কীর্তি। বীজগণিতের যে অন্য নাম 'অ্যালজেবরা' তাও এসেছে তাঁর দেওয়া নাম ('হিসাব আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা') থেকেই। বীজগণিতের সরল ও দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধানের পদ্ধতিও তিনি বের করেন।

মামুনের সময়ে আল-কিন্দী (৮১৩-৮০) নামে আর এক বিজ্ঞানী আলোকতত্ত্বের ওপর বই লেখেন। এই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে চক্ষুরোগের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল; সে জন্য চোখ ও আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু আরব বিজ্ঞানী চর্চা করেছেন। আল-কিন্দী জোয়ার-ভাটা, রঙধনু প্রভৃতি বিষয়েও মূল্যবান গবেষণা করেছিলেন।

সেকালের বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ আল-রাজির নাম আগে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। এঁর পুরো নাম আবু-বকর মুহম্মদ ইবনে-জাকারিয়া আল-রাজি। ইনি রায় (বর্তমান তেহরান নগরীর কাছে) নামে স্থানে ৮৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন; তবে অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন বাগদাদে। আল-রাজির অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে প্রধান হল 'আল-হাবাই' নামে বিশাল চিকিৎসাকোষ। তিনি চক্ষুরোগ, বসন্ত ও হাম রোগ সম্বন্ধে মূল্যবান তত্ত্ব আবিষ্কার করেন; বসন্ত ও হামের যথাযথ বর্ণনা তিনিই প্রথম করেন। ভাঙা হাড় জোড়া লাগাবার জন্যে 'প্লাস্টার কাস্ট' তৈরির

banglainternet.com

পদ্ধতিও তিনি উদ্ভাবন করেন। আল-রাজি শুধু যে চিকিৎসাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তা' নয়, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নতত্ত্বেরও তিনি ব্যাপক চর্চা করে তার বিস্তারিত ফলাফল লিখে গিয়েছেন।

বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে মেঘহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে আরবের লোকেরা চিরদিনই নক্ষত্রজগতের রহস্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। বাণিজ্যপ্রিয় দূর-দূরান্তগামী আরবদের কাছে নক্ষত্রলোকের আকর্ষণ চিরকালের। মুসলিম বিজ্ঞানীরাও গোড়া থেকেই জ্যোতির্বিদ্যার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রথম যুগের মুসলিম জ্যোতির্বিদদের মধ্যে আল-ফারঘানি (মধ্য-এশিয়ার ফরঘানায় জন্ম) এবং আল-বাত্তানির (মেসোপটেমিয়ার বাত্তানে জন্ম সম্ভবত ৮৫৮-৯২৯) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে যে সব মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন, তা' ইউরোপের রেনেসাঁ যুগে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ব্যবহার করেছিলেন। উন্নত যন্ত্রপাতি ও উন্নত গণিতপদ্ধতি ব্যবহার করে আল-বাত্তানি দিনের দৈর্ঘ্যের যে হিসেব বের করেন তার সাহায্যেই সাতশো বছর পরে সংশোধিত 'গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার' তৈরি হয়।

দশম শতকের শুরুতে বাগদাদে একদল বিজ্ঞানী এক গোপন সংস্থা স্থাপন করে জনপ্রিয় ভাষায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রচার করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা এর নাম দেন 'ইখ্ ওয়ানুল সাফা' (পবিত্রতা ও আন্তরিকতার সংঘ)। এঁদের কর্মকেন্দ্র পরে বসরায় স্থানান্তরিত হয়। তাঁরা জোয়ার-ভাটা, ভূমিকম্প, গ্রহণ, শব্দতরঙ্গ প্রভৃতি নানা বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে ৫২ খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এঁরা এমন মত প্রকাশ করেন যে, যুগে যুগে পৃথিবীতে জলবায়ু ও পরিবেশের নানা পরিবর্তন ঘটে চলেছে। শস্য-শ্যামল উর্বর জায়গা পরিণত হচ্ছে মরুভূমিতে, কোথাও সমুদ্রের পানিতে ডুবে যাচ্ছে ডাঙা; আবার অন্য কোথাও সমুদ্র থেকে জেগে উঠছে মাটি।

দশম শতকের শেষ দিকে মুসলিম প্রভাবে সুদূর পশ্চিমে স্পেন দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। কর্ডোভা হয়ে দাঁড়ায় 'জগৎ-মণি'— ইউরোপের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থল। এছাড়া স্পেনের গ্রানাডা, সেভিল ও টলেডোতেও জ্ঞান-চর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। গ্রিক ও আরব বিজ্ঞানের বহু গ্রন্থ আরবী থেকে ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনুবাদ হতে থাকে। এইভাবে গ্রিক বিজ্ঞান আরবীর মাধ্যমে আবার ইউরোপে এসে পৌঁছায়। পরবর্তীকালে ইউরোপের মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ্ প্রমুখ মুসলিম মনীষীর রচনা গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং ইউরোপের রেনেসাঁ বা নবজাগরণে বিশেষ সহায়তা করে। আরবরা স্পেনে ফুল ও ফলের বাগান করতে প্রেরণা দেন। ধান, আখ, কমলা, তুলার চাষও তাঁরাই এখানে প্রবর্তন করেন।

দশম শতকের শেষে মুসলিম জাহানের পূর্ব প্রান্তে তিনজন বিরাট প্রতিভাশালী ব্যক্তির উদ্ভব হয়—এঁরা হলেন আল-বেরুনী (৯৭৩-১০৫০), ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭) এবং ইবনুল হাইসাম (৯৬৫-১০৩৯)। আল-বেরুনী পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গজনীর সুলতান মাহমুদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং শাহ্নামার কবি ফেরদৌসীর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি পাক-ভারত উপমহাদেশে এবং অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন এবং জ্যোতির্বিদ্যার একটি বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন।

আল-বেরুনী ছিলেন এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ—একাধারে চিকিৎসাবিদ, জ্যোতির্বিদ, পদার্থবিজ্ঞানী, ভূগোলবিদ ও ইতিহাসবিদ। তিনি আরবী, পারসী ও সংস্কৃত এই তিনটি ভাষাই ভালভাবে জানতেন; তাঁর মাধ্যমেই ভারতীয় সংখ্যারীতি, শূন্য ও দশমিকের ব্যবহার পাশ্চাত্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিশুদ্ধতা নির্ণয় করার জন্য তিনি ১৮ রকম ধাতু ও বিভিন্ন মণিমুক্তার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিখুঁতভাবে হিসেব করে বের করেন। প্রাকৃতিক ঝরনা ও আর্টেজিয় কুয়ার কারণ যে মাটির তলার পানির চাপ এ ব্যাখ্যাও তিনি দেন। সিন্ধু উপত্যকা এক কালে সমুদ্রের তলায় ছিল বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে খ্যাতনামা মুসলিম বিজ্ঞানী আবু আলী আল-হুসেন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা ৯৮০ সালে বোখারার কাছে (বর্তমান উজবেকিস্তানে) জন্মগ্রহণ করেন। ১০৩৭ সালে হামাদানে (বর্তমান ইরানে) তাঁর মৃত্যু হয়। ইবনে সিনা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে গবেষণা করে প্রায় একশো গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু মধ্যযুগের সবচেয়ে খ্যাতিমান চিকিৎসাবিদ হিসেবেই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি 'আল-কানুন ফিল তিব' (বা চিকিৎসাবিদি) নামে চিকিৎসাবিদ্যার যে বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন তা' উইলিয়াম হার্ভের সময় পর্যন্ত ছ'শো বছর ধরে ইউরোপের সবচেয়ে প্রামাণ্য চিকিৎসাগ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়। পঞ্চদশ শতকের শেষ তিরিশ বছরে ল্যাটিনে অনূদিত কানুনের ১৬টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়; ষোড়শ শতকে হয় ২০টির বেশি সংস্করণ। এই বইতে চর্মরোগ ও অন্যান্য রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও ৭৬০ রকম ওষুধের বর্ণনা রয়েছে। যক্ষ্মা যে ছোঁয়াচে রোগ আর পানির মাধ্যমে নানা রকম রোগ ছড়াতে পারে তা ইবনে সীনাই প্রথম বের করেন।

বিজ্ঞান ও দর্শনের অন্যান্য বিভাগেও ইবনে সিনার অসামান্য অবদান রয়েছে। 'কিতাবুল শিফা' (বা নিদানশাস্ত্র) নামে তিনি একটি দার্শনিক বিশ্বকোষ রচনা করেন। এতে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে, বিশেষ করে সংগীতের শব্দতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি মূল্যবান আলোচনা করেছেন। সূক্ষ্ম পরীক্ষার সাহায্যে তিনি বহু বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বের করেন। আল-কিমিয়ার সাহায্যে নিকৃষ্ট ধাতু থেকে সোনা তৈরি সম্ভব একথা ইবনে সিনা বিশ্বাস করতেন না; তাঁর মতে বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে

banglainternet.com

মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নানান খনিজ সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা বহু যুগ পর্যন্ত ব্যবহৃত হতে থাকে। তিনি পর্বত সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে কতকগুলো তত্ত্ব উল্লেখ করেন।

মধ্যযুগের সবচেয়ে খ্যাতিমান পদার্থবিদ আবু আলী আল-হাসান ইবনুল হাইসাম ৯৬৫ সালে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন; আর ইন্তেকাল করেন ১০৩৯ সালে কায়রোতে। তিনি বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ও পরীক্ষামূলক চর্চার মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তাঁর রচনা ষোড়শ শতকে ল্যাটিনে অনূদিত হয় এবং লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি; জোহান কেপলার; আইজাক নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীর গবেষণায় প্রভাব বিস্তার করে।

আল-হাইসামের গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল আলোকতত্ত্ব। এ বিষয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার বর্ণনা দিয়ে তিনি 'কিতাব আল-মানাজির' (বা 'আলোকতত্ত্ব') নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর আগে গ্রিক পণ্ডিত ইউক্লিড (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক) আর টলেমি (খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক) বলেছিলেন, চোখ থেকে এক রকম রশ্মি বেরিয়ে দৃশ্যমান বস্তুতে পড়ে, তাতেই আমরা সে-সব বস্তু দেখতে পাই। আল-হাইসাম এই তত্ত্বের বিরুদ্ধতা করে প্রচার করলেন, দীপ্তিমান উৎস থেকে আলো কোনো কিছুর গায়ে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ে, তাই আমরা সেই বস্তুকেই দেখি। সেকালের অধিকাংশ পণ্ডিত আল-হাইসামের মত মানতে চাননি; কিন্তু আল-বেরুনী ও ইবনে সিনা তাঁকে সমর্থন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি 'আলোকতত্ত্বের জনক' বলে স্বীকৃতি লাভ করেন।

আল-হাইসাম ইস্পাতের সাহায্যে নানা ধরনের বক্র আয়না তৈরি করে আলোর প্রতিফলন সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন। আলোর প্রতিসরণ সম্বন্ধেও তিনি বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এইসব পরীক্ষা থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে, অপেক্ষাকৃত ঘন মাধ্যমের তুলনায় হাল্কা মাধ্যমে আলোর বেগ বেশি আর বিভিন্ন মাধ্যমে বেগের এই তারতম্যই আলোর প্রতিসরণের কারণ। প্রতিসরণের ফলে আলোর পথ কী পরিমাণে বেঁকে যায় তাও তিনি মেপেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিসরণের নিয়মগুলো তিনি নিখুঁতভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। এর প্রায় ছ'শো বছর পরে ওলন্দাজ গণিতবিদ স্নেল (Snell) এই নিয়মগুলো প্রকাশ করেন। সূর্য ওঠার আগে আকাশ আলোকিত হয়ে ওঠার কারণ যে বাতাসের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলোর প্রতিসরণ এ ব্যাখ্যা আল-হাইসাম দেন। খুব ছোট ছিদ্রের ভেতর দিয়ে আলো গেলে পেছনে প্রতিবিম্ব পড়ে এটাও তিনি লক্ষ্য করেন; এ থেকেই পরে ক্যামেরার উদ্ভব হয়েছে।

পারস্যের নিশাপুরের ওমর খইয়ামকে (সম্ভবত ১০৩৮-১১২৩) আমরা সচরাচর বিখ্যাত কবি হিসেবে জানি। কিন্তু তিনি আরবী ভাষায় জ্যোতির্বিদ্যা, বীজগণিত ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে যেসব মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন তার কথা

হয়তো অনেকেরই জানা নেই। সলজুক বংশের সুলতান জালালউদ্দীনের জ্যোতির্বিদ হিসেবে ১০৭৫ সালে তিনি প্রচলিত বর্ষপঞ্জি গণনার উন্নতি সাধন করেন। মনে হয় তাঁর সময়ে তিনিই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় গণিতবিদ ছিলেন।

দশম শতক থেকেই মুসলিম সভ্যতার অবনতির সূচনা হয়েছিল। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যেতে থাকে কলহপরায়ণ ছোট ছোট রাজ্যে। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি ধর্মের গোঁড়ামি বিশেষভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মুক্তবুদ্ধির চর্চা, স্বাধীন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং সাধারণভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় ভাটা পড়ে। এই সময়ের সবচেয়ে খ্যাতিমান জ্ঞানসাধক ইবনে রুশ্‌দ্ (১১২৬-১১৯৮) স্পেনের কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণত অ্যারিস্টটলের গ্রিক দর্শনের ভাষ্যকার ও উত্তরসূরি হিসেবে তাঁর খ্যাতি কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রেও তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বলেন, বিশ্বের সব কিছু অকস্মাৎ সৃষ্টি হয়েছে এমন মনে হয় না; বরং সব জিনিস ক্রমে ক্রমে এক রূপ থেকে অন্য রূপ গ্রহণ করেছে অর্থাৎ পরিবর্তনশীল বিশ্বে সৃষ্টি অনবরতই ঘটছে। তাঁর এই মতামতে ক্রমবিকাশবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

এদিকে ত্রয়োদশ শতকে মুসলিম সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে পশ্চিমে খ্রিস্টান ও পূর্বে মোংগল ও তাতারদের অভিযান শুরু হয়। চেংগিস খান ও তাঁর পৌত্র কুবলাই খান এশিয়া ও ইউরোপের বিশাল এলাকা জুড়ে মোংগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্ধর্ষ মোংগল সেনাপতি হুলাগু খান তাঁর তাতার সেনাদল নিয়ে ১২৫৮ সালে বাগদাদ নগরী লুণ্ঠন করেন। তার সাথে সাথে বহু মূল্যবান আরবী পুথিপুস্তক ধ্বংস হয়ে যায়। ১৪০১ সালে তাইমুর লঙ বাগদাদের এই ধ্বংস সম্পূর্ণ করেন।

হুলাগু খান বাগদাদের পাঠাগারগুলো ধ্বংস করলেও আজারবাইজানের অন্তর্গত মারাগাতে তিনি একটি মানমন্দির তৈরি করেন এবং খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ নাসিরউদ্দীন তুসীকে (১২০১-১২৭৪) তার পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করেন। এই মানমন্দিরে চার লক্ষের ওপর বই সংগ্রহ করা হয়। নাসিরউদ্দীন তুসী টলেমির 'আলমাজেস্ট' গ্রন্থে বর্ণিত গ্রহদের ভ্রমণপথ সংক্রান্ত মতের সমালোচনা করেন। এর ফলেই পরবর্তীকালে কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মত প্রচারের পথ প্রশস্ত হয়।

নাসিরউদ্দীন তুসীর শিষ্য কুতুবুদ্দীন শিরাজী (১২৩৬-১৩১১) রঙধনুর কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, হাওয়ায় যে ছোট ছোট পানির কণা ভেসে থাকে তাতে সূর্যের আলোর দু'বার প্রতিসরণ ও একবার অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে মুখ্য রঙধনু তৈরি হয়; আর দু'বার প্রতিফলন ও দু'বার অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে সৃষ্টি হয় গৌণ রঙধনু।

banglainternet.com

তাইমুর লঙের পৌত্র উলুগ বেগ ১৪২০ সালের কাছাকাছি সমরখন্দে সে কালের দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা মানমন্দির তৈরি করেন। এখান থেকেই ১৪৩৭ সালে সৃষ্টি হয় 'জিয্ উলুগ বেগ' নামে বিখ্যাত নক্ষত্র-তালিকা। এর পরে কয়েক শতাব্দী ধরে এটি সারা দুনিয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নক্ষত্র-তালিকা বলে স্বীকৃত পেয়েছে।

এই সময়ে মধ্যপ্রাচোর যে অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানীর নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে সিরিয়ার জীববিজ্ঞানী ইবনুল নাফিসের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি চিকিৎসাবিদ্যা, বিশেষ করে চোখের রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। হৃদপিণ্ড, শিরা ও ধমনীর সাহায্যে আমাদের দেহে কিভাবে রক্ত সঞ্চালন ঘটে তা' খুব সম্ভবত ইবনুল নাফিসই প্রথম বর্ণনা করেন। তবে সাধারণত রক্ত সঞ্চালন আবিষ্কারের কৃতিত্ব উইলিয়াম হার্ভেকে দেওয়া হয়।

স্পেনের মালাগার বাসিন্দা আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনুল বায়তার (মৃত্যু ১২৪৮, দামেশকে) উদ্ভিদতত্ত্ব, ওষুধ হিসেবে উদ্ভিদের ব্যবহার এবং খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে নানা রকম গবেষণা করেন। তিনি সারা স্পেন ও উত্তর আফ্রিকা এবং পরে সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর ভ্রমণ করে রোগ নিরাময়কারী উদ্ভিদের সন্ধান করেন।

পঞ্চদশ শতকের পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে বিজ্ঞানের চর্চায় আর তেমন নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। যেন সেখানে এক অন্ধকার যুগ নেমে আসে: আর এদিকে ইউরোপের অন্ধকার যুগ কেটে গিয়ে সেখানে রেনেসাঁর আবির্ভাব শিল্পে, বিজ্ঞানে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে।

রেনেসাঁ যুগে ও তার পরে ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চার বিপুল বিকাশ প্রধানত আরব বিজ্ঞানের প্রভাবকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে। আরবদের মাধ্যমেই ইউরোপের দরবারে পৌছায় মানবসভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডার।

চুম্বকশলাকা উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকে এ তত্ত্ব আবিষ্কারের কৃতিত্ব সম্ভবত চীনাদের। কিন্তু দশম ও একাদশ শতকে আরব নাবিকেরাই প্রথম সমুদ্রে জাহাজ চালাবার জন্য চুম্বকশলাকা ব্যবহার করেন। এর ফলেই বিশ্বের চতুর্দিকে নিরাপদে সমুদ্রযাত্রা সম্ভব হয়ে ওঠে।

আরবরা পৃথিবীর গোলকত্ব সম্বন্ধে জেনেছিলেন গ্রিক পণ্ডিত টলেমির রচনা থেকে। পৃথিবী গোল এ ধারণা কলম্বাস প্রথম পেয়েছিলেন স্পেনে আরবী বই থেকে: আর এ থেকেই ভারত সন্ধানে পশ্চিম দিকে সমুদ্রযাত্রার পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে। কলম্বাসের এই অভিযানের ফলেই আমেরিকা মহাদেশে 'নতুন বিশ্ব' আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল।

সেকালে মুসলিম বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানচর্চার পথ স্বভাবতই সহজ ছিল না। অ্যারিস্টটলের প্রভাবে আচ্ছন্ন পণ্ডিতসমাজে জ্ঞানচর্চা হয়ে দাঁড়িয়েছিল গ্রিক

মনীষীদের মতামতের চর্বিতচর্বণ। এই বিপুল গ্রিক প্রভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বাধীন অনুসন্ধান চালানো, খ্যাতিমান গ্রিক পণ্ডিতদের মত খণ্ডন করে নতুন সত্যের সন্ধান ছিল অতি দুরূহ। মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাঁদের নবলব্ধ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীনভাবে সত্য সন্ধানের এই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন।

মনে রাখতে হবে, তাঁদের সামনে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঐতিহ্য ছিল অতি সীমিত, পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছিল প্রায় অনুপস্থিত। পদে পদে পর্বতপ্রমাণ বাধা অপসারণ করে তাঁদের এগোতে হয়েছে।

প্রথম যুগের এই অভিযাত্রী বিজ্ঞানীদের তাঁদের মতামতের জন্য নির্যাতনও ভোগ করতে হয়েছিল যথেষ্ট। শুধু যে প্রথাসিদ্ধ পাণ্ডিত্যের বিরোধিতা ছিল তা নয়: খামখেয়ালি, কলহপরায়ণ, ক্ষমতালিপ্সু রাজন্যদের রোষ এবং ধর্মান্ধ শাস্ত্রকারদের বিরুদ্ধতারও সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁদের অনেককেই। মিসরের উদ্ধত খলিফা আল-হাকিমের ক্রোধবহ্নি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইবনুল হাইসামকে তাই মস্তিষ্কবিকৃতির অভিনয়ের আশ্রয় নিতে হয়েছে। ইবনে সিনাকে রাজরোষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বারবার আত্মগোপন করতে হয়েছে; শরীরতত্ত্বের জ্ঞান-লাভের জন্য শবব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে হয়েছে তাঁকে অতি গোপনে; অভিযুক্ত হতে হয়েছে 'নাস্তিকতার' অপরাধে। জ্ঞানসাধনার 'অপরাধে' ইবনে রুশ্‌দকে কারারুদ্ধ হতে হয়েছে: অবশেষে কর্ডোভা ছেড়ে স্বেচ্ছানির্বাসন নিতে হয়েছে মরক্কোতে। রাজকীয় ফরমানে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে তাঁর রচনা।

বলা বাহুল্য, এ ধরনের বিরুদ্ধতার সামনে এই মনীষী বিজ্ঞানীরা আত্মসমর্পণ করেননি। শত বিপত্তি সত্ত্বেও অনুসন্ধিৎসা, সত্যসন্ধান, জ্ঞান সাধনার অনির্বাণ আলো জ্বালিয়ে তাঁরা মানবসভ্যতার ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন। আজকের দিনের মানুষ আমরা তাঁদের এই একাগ্র সাধনার উত্তরসূরি; আর তাঁরা আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির পথিকৃৎ।

[১৩৭৭/১৯৭০]

[উৎস : *বিজ্ঞান ও মানুষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫]

banglainternet.com

সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানচেতনা

মানুষ যখন থেকে মানুষ হিসেবে তার 'কৃতি' বা ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করেছে, সংস্কৃতির উদ্ভব বলা যায় সে সময়েই। আর সংস্কৃতি বিষয়ে চিন্তাভাবনাও কিছু নতুন নয়, বিশেষ করে আমাদের মতো আবহমানের ঐতিহ্যে লালিত দেশে সংস্কৃতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা, আলোচনা নেহাত কম হয়নি। সে হিসেবে বিজ্ঞানচেতনা কথাটা বরং নতুন। এদেশে আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটেছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে, বিজ্ঞানচেতনা আরো সাম্প্রতিক বলা যেতে পারে। এ দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা তাই আজকের দিনে সঙ্গতভাবেই অনেকের কাছে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে।

সংস্কৃতি আমাদের সাথে দীর্ঘকাল ধরে আছে বলেই যে সংস্কৃতির সংজ্ঞা দেয়া সহজ তা নয়। উনিশ শতকের বিদগ্ধ ইংরেজ পণ্ডিত ম্যাথিউ আরনল্ড সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন : 'এযাবৎ পৃথিবীতে যা কিছু শ্রেষ্ঠ বিষয় জানা বা বলা হয়েছে তার সাথে পরিচিতিই হল কালচার বা সংস্কৃতি।'

> এই শতাব্দীতে এ দেশের একজন বিদগ্ধ লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরী 'সংস্কৃতি-কথা' নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা প্রসঙ্গে কিছুটা ভিন্ন সুরে বলেছেন '... সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা; প্রকৃতি-সংসার ও মানব-সংসারের মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা... বাঁচা, বাঁচা, বাঁচা। প্রচুরভাবে গভীরভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা।' এরপর এই কাব্যময় প্রকাশের তিনি যে সারার্থ করেছেন সে হল 'জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রেমের। সংস্কৃতিবান হওয়ার মানে প্রেমবান হওয়া।'

সে হিসেবে প্রায় সমসাময়িক গোপাল হালদারের বর্ণনা একেবারেই সাদামাটা আর সরাসরি। তিনি 'সংস্কৃতির রূপান্তর' প্রসঙ্গে বলছেন :

> 'মানুষ হিসেবে মানুষের আসল পরিচয়ই তার সংস্কৃতি, এই 'কৃতি'র বা কাজের বলেই মানুষ 'মানুষ' হইয়াছে। প্রকৃতির নিয়মও বুঝিয়া উঠিতেছে, বাধা ছাড়াইয়া যাইতেছে। ... মানুষের জীবন-সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি।'

স্পষ্টতই এসব সংজ্ঞার অর্থ হুবহু এক নয়, তাদের ঝোঁকও বিভিন্ন। মানব সভ্যতার বিকাশের ধারার সাথে সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক মেনে নিয়ে কেউ জোর দিচ্ছেন মানুষের আয়ত্ত জ্ঞানের ওপর, কেউ তার সুকুমার অনুভূতি অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তির ওপর, কেউবা তার জীবন-সংগ্রামের সামগ্রিক কর্মধারাকেই ধরছেন সংস্কৃতি হিসেবে। বলা বাহুল্য সংস্কৃতি যেমন স্থানু নয়, ইতিহাসের ধারায় ক্রমপরিবর্তনশীল, তেমনি তার সম্পর্কে মানুষের ধারণাও ক্রমাগত পরিবর্তিত আর বিবর্তিত হয়েছে। আবার সংস্কৃতিকে আমরা কোন দৃষ্টিতে দেখছি তা স্বভাবতই অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত কর্মধারার ওপর।

সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় কাব্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, খেলাধুলা এসব একটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির অঙ্গ। এসবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটে মানুষের সুকুমার মানবিক বৃত্তির। এমনি সুকুমার বৃত্তির উৎস হিসেবে ধরা হয় হৃদয় নামে এক রহস্যঘন দুর্জ্ঞেয় প্রপঞ্চ। ধর্মকেও ধরা হয়ে থাকে সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে; ধর্মের প্রভাব ব্যবহারিক জীবনে বিস্তৃত হলেও তার ধ্যানধারণার কেন্দ্র নির্বস্তুক অধ্যাত্মলোকে। সাহিত্য, শিল্প বা ধর্ম যাই হোক এ সব কিছুরই রয়েছে সামাজিক ভিত্তি। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন রূপে তার প্রকাশ। পশু-শিকারী আর কৃষিভিত্তিক দুই ধরনের সমাজেই উদ্ভব ঘটেছে হাতিয়ার প্রভৃতি উপকরণের, আচার-অনুষ্ঠানের, শিল্প-কর্মের, উৎসবের। এ সবই তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ; সামাজিক প্রয়োজন থেকেই এ সবের উদ্ভব। তবে দুই ধরনের সমাজের ক্রিয়াকর্ম ভিন্ন ধরনের বলে তাদের শিল্পচেতনা আবর্তিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু আর ভাবকে অবলম্বন করে।

স্থান ও কালের পরিবর্তনে মানুষের সামাজিক প্রয়োজন বদলে যায়, সংস্কৃতির চরিত্রেও ঘটে রূপান্তর। এই প্রভেদ ও রূপান্তর দেখা দেয় যেমন মানুষের বস্তুসম্পদে, তেমনি মানস-সম্পদে, আবার তেমনি তার সামাজিক সম্পর্কেও। বাংলাদেশের কাব্যে আর গানে যে নদী আর মেঘ, দিগন্তবিস্তৃত শস্যখেত, ষড়ঋতুর পরিবর্তন এমন বিরাট প্রভাব বিস্তার করে আছে এটা নিঃসন্দেহে এই পলিমাটির দেশে দীর্ঘকালের কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রার ছাপ বহন করে; এ দেশের গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতিতে আজ যে অনেক ক্ষেত্রে বিপুল পার্থক্য দেখা দিচ্ছে এ-ও জীবন-পদ্ধতির তারতম্যের কারণেই ঘটছে। এমনি জীবনযাত্রার ছাপ আঁকা সব দেশের কাব্যে, গানে, আচার-অনুষ্ঠানে, ধর্ম আর দর্শনেও।

কিন্তু সংস্কৃতি বিকাশের এই ধারায় বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানচেতনার স্থান কোথায়? এ কথা মানতেই হবে, মানুষের সভ্যতার দীর্ঘকালের প্রবহমান ধারায় এই স্থান দুর্নিরীক্ষ্য। আজ থেকে বহু হাজার বছর আগে মানুষ জয় করেছে অগ্নিশিখাকে,

banglainternet.com

তাকে বশ করেছে নিজের জীবন যাপনের প্রয়োজনে; নির্মাণ করেছে আশ্রয়, সৃষ্টি করেছে পরিধেয়, জীবন যাপনের নানা উপচার। কিন্তু এসব পরিবর্তন ঘটেছে অতি ধীরে ধীরে। আজকের বিজ্ঞানীদের মতে প্রায় ২০ লাখ বছর আগে মানুষ নামবাচ্য জীবের উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু সে মানুষ আগুনের ব্যবহার আয়ত্ত করেছে মাত্রই আজ থেকে তিন-চার লাখ বছর আগে। অগ্নির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির শক্তির ওপর মানুষের প্রথম বড় রকম বিজয় সূচিত হয়েছে; তার জীবনযাত্রায় এসেছে এক বিরাট পরিবর্তন। অর্থাৎ মানুষের বিশ লক্ষ বছরের ইতিহাসে অধিকাংশ সময়ই পশুর সাথে তার প্রভেদ তেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ নেয়নি।

গত পঞ্চাশ হাজার বছর সময়কে যদি আধুনিক মানুষের যুগ বলে গণ্য করা হয় তাহলেও এর অধিকাংশ কেটেছে বন-জঙ্গলের ফল-মূল খেয়ে আর পশু শিকার করে। পরিকল্পিত উৎপাদন ছিল অতি সামান্য। এই সময়ে কি মানুষের কোনো ভাষা ছিল? খুব সম্ভব ছিল, কিন্তু তার পরিচয় আমাদের জানা নেই। তবে আমরা জানি এই সময়েও মানুষ পাথরের তৈরি অস্ত্রে রেখেছে তার শিল্প-কর্মের স্বাক্ষর: পাহাড়ের গুহায় ছবি এঁকেছে, শিকারে সাফল্যের আশায় নাচ-গান প্রভৃতি নানা আচার-অনুষ্ঠানের আশ্রয় নিয়েছে। ফসল উৎপাদন অর্থাৎ কৃষির উদ্ভব মাত্র আট-দশ হাজার বছর আগে। প্রায় একই সময়ে উদ্ভব পশু-পালন পদ্ধতির। এরও পরে আজ থেকে মাত্র পাঁচ-ছ' হাজার বছর আগে উদ্ভব ঘটেছে উৎপাদনের কাজে ধাতুর ব্যবহার এবং প্রাথমিক নগরসভ্যতার। মোটামুটি এ সময় থেকেই শুরু সভ্য মানুষের ইতিহাসেরও।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে এদিক থেকে তার উৎপাদন বিকাশের ধারা হিসেবে দেখা চলে। উৎপাদনের নতুন নতুন কৌশল আয়ত্ত করার ফলে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করে মানুষ তার সংখ্যা বাড়িয়ে তুলেছে। কিন্তু বহু হাজার বছর ধরে এই উৎপাদন-কৌশলের বিকাশ যেমন ধীর গতিতে এগিয়েছে, মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধিও হয়েছে তেমনি ধীরে ধীরে।

অথচ আজ এই অবস্থার এক আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ঐতিহাসিককালে অর্থাৎ গত পাঁচ-ছ' হাজার বছরে মানুষের উৎপাদন শক্তির বিকাশ ক্রমে দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়েছে, তার সভ্যতার বিকাশ হয়েছে ত্বরান্বিত। নগরসভ্যতার বিস্তার শ্রম বিভাগের মাধ্যমে জন্ম দিয়েছে নানা ধরনের কুশলী কর্মীর; এই কর্মের সাথে যোগ ঘটেছে বিভিন্ন ধরনের ধাতু ও অন্যান্য খনিজ বস্তুর ব্যবহার। পণ্যদ্রব্যের বিকাশের ফলে জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পেয়েছে; আর সেই সঙ্গে শুধু যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি দ্রুত হয়েছে তাই নয়, সামাজিক সংগঠনেও ঘটেছে ক্রমাগত পরিবর্তন। দাসভিত্তিক সমাজ থেকে উত্তরণ ঘটেছে সামন্ত সমাজে;

আজ থেকে মাত্র তিন-চারশ' বছর আগে দেখা দিয়েছে ধনতান্ত্রিক বণিক সমাজ; বিংশ শতাব্দীতে এসে উদ্ভব ঘটেছে সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার।

সামাজিক প্রভাবের ক্রমদ্রুততার দৃষ্টান্ত হিসেবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাপকাঠিটা বিবেচনার জন্য সবচাইতে সহজ। অনুমান করা হয় যে, কৃষি ব্যবস্থার উদ্ভবের কালে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় আট হাজার বছর আগে সারা পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি পঞ্চাশ লাখ অর্থাৎ মাত্র আজকের ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যার কাছাকাছি। আর সে সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেত এত ধীর গতিতে যে, অঙ্কটা বেড়ে দ্বিগুণ হতে সময় লাগত প্রায় দেড় হাজার বছর। ধনতন্ত্রের বিকাশের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ সতের শতকের মাঝামাঝি পৃথিবীর লোকসংখ্যা দাঁড়ায় পঞ্চাশ কোটির মতো—অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশের আজকের লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। এই সংখ্যা দ্বিগুণ অর্থাৎ একশ' কোটি হয় দু'শ বছরে অর্থাৎ উনিশ শতকের মাঝামাঝি। এরপর জনসংখ্যা আবার দ্বিগুণ হয়ে দু'শ কোটিতে পৌঁছয় মাত্র আশি বছর পর অর্থাৎ ১৯৩০ সালে। এর পরেরবার জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে চারশ' কোটিতে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪৫ বছর পর—১৯৭৫ সালে। এই হারে চললে আবার জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে আটশ' কোটি হবে এর ৩৫ বছর পর অর্থাৎ ২০১০ সালের কাছাকাছি।

এভাবে জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাওয়াকে কি আমরা অগ্রগতি বলব? আজকের দিনে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া শক্ত। কিন্তু জনসংখ্যার এই বিপুল বৃদ্ধি মানুষের জীবনসংগ্রামে সাফল্যের একটা লক্ষণ তো বটেই। এককালে যে মানুষ ছিল প্রকৃতির শক্তির সামনে অসহায় ক্রীড়নক, আজ সে চারপাশের পরিবেশকে জয় করে বিপুলবিক্রমে বিশ্বচরাচরে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে নিজের। এই সাফল্যেরও যে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে সে বিষয়ে হয়তো সে যথাসময়ে সচেতন হয়নি। পরিকল্পিত হয়নি বিশ্বসভ্যতার বিস্তার। তাই আজ পরিবেশ দূষণ, প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষিত হবার সম্ভাবনা আর এক ব্যাপক পারমাণবিক ধ্বংসলীলার আশঙ্কা মানুষের সভ্যতার সামনে বিশাল সতর্কচিহ্ন হিসেবে ভেসে উঠেছে।

কিন্তু কোন্ শক্তির বলে মানুষ প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে গত মাত্র কয়েক শতাব্দীতে এই অসাধারণ সাফল্যের অধিকারী হল? বলা বাহুল্য এ হল তার মেধা আর উদ্ভাবনেরই ফসল; জিজ্ঞাসা আর নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃতির ক্রিয়াকর্মের বিচিত্র নিয়মাবলীর উদ্‌ঘাটন; আর সে-সবকে তার জীবনসংগ্রামের প্রয়োজনে নিয়োগ—সংক্ষেপে যাকে বলা চলে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির শক্তি।

প্রকৃতির নিয়মকে তো মানুষ জানতে চেয়েছে তার উদ্ভবের সেই ঊষালগ্ন থেকেই। সংস্কৃতির উদ্ভব যেমন সংগ্রামের প্রয়োজনে, বিজ্ঞানেরও উদ্ভব তেমনি

banglainternet.com

পরিবেশকে মানুষের বশ করে জীবনকে আরো স্বচ্ছন্দ; আরো আনন্দময় করার তাগিদেই। কিন্তু গোড়ার দিকে এই জিজ্ঞাসা আর উদ্ভাবনের ধারা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের—বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি ছিল অপরিণত। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে তার ঘটেছে পরিণতি—ক্রমাগত দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়েছে তার বিকাশ।

কৃষি আর পশুপালনে প্রকাশ ঘটেছে প্রযুক্তির; আশ্রয় বা আচ্ছাদন নির্মাণে, স্থাপত্য আর ধাতুশিল্পেও মানুষকে নানা কলা-কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে প্রাকৃতিক নিয়মের মূলতত্ত্ব বা সূত্রের কোনো খবর না রেখেই। ক্রমে ক্রমে বহু হাজার বছরের পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে মানুষ নির্দিষ্ট তথ্য থেকে প্রাকৃতিক নিয়মের সাধারণ সূত্র উদ্ভাবন করতে শিখেছে। আর তখনই সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানের।

ইতিহাসবিদরা বলেন কৃষি ও নগরসভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটেছিল মধ্যপ্রাচ্যে। এই সভ্যতার বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচ ছ' হাজার বছর আগে সুমের, ব্যাবিলন, মিসরে দীর্ঘকালের নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ থেকে জন্ম হয় জ্যোতির্বিদ্যার। প্রায় কাছাকাছি সময়ে জ্যোতির্বিদ্যার বিকাশ ঘটে ভারতীয় উপমহাদেশে ও চীনে। জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা দিন-মাস ঋতুর হিসেবের মাধ্যমে সহায়ক হয় কৃষি কাজে, সমুদ্র বা মরুভূমি পাড়ি দিতে দিক নির্ণয়ে। এইসব হিসেব থেকে উদ্ভব হয় জ্যামিতি ও গণিতের। প্রকৃতির নিয়মের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এসব নিয়ম শুধু বর্তমান ঘটনাকেই ব্যাখ্যা করে না, ভবিষ্যতের ঘটনার পূর্বাভাসও দিতে পারে। জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা থেকে মানুষ শুধু যে মোটামুটি নিয়মিত নীলনদের বন্যার দিনক্ষণ নির্ণয় করতে শেখে তা নয়, চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতি আপাত-অনিয়মিত ঘটনার পূর্বাভাসও দিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সেকালের এসব জ্ঞান কেন্দ্রীভূত হয় পুরোহিত রাজন্য শ্রেণীর হাতে আর সাধারণ মানুষের মধ্যে এই শ্রেণীর প্রতি এবং সাধারণভাবে জ্ঞানচর্চার প্রতি বিদ্বেষভাব গড়ে ওঠে।

মানুষের পরিবেশ পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বিকাশ, নানা অঞ্চলের লোকের সামাজিক যোগাযোগ প্রভৃতির সমাহার ঘটার ফলে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এশিয়া আর ইউরোপের সংযোগস্থল ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী আইওনিয়া অঞ্চলে এক আশ্চর্য সভ্যতার বিকাশ ঘটে। মিলেটাসের থেলিস, পিথাগোরাস, অ্যানাক্সগোরাস, সক্রেটিস, ডেমোক্রিটাস, হিপোক্র্যাটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, অ্যারিস্টারকাস, আর্কিমিডিস, এরাটোস্থিনিস, হিপারকাস প্রমুখ কালজয়ী দার্শনিক আর বিজ্ঞানী এই নতুন গ্রিক সভ্যতার ফসল। দাসভিত্তিক সমাজের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে লৌহযুগের আবির্ভাবকালের এসব গ্রিক মনীষী এক গভীর প্রকৃতি-জিজ্ঞাসার পরিচয় দেন। বিজ্ঞান আর দর্শন এ সময়ে ছিল অনেকটাই মেশামেশি হয়ে; কিন্তু প্রকৃতির রহস্য সন্ধানে গাণিতিক

শৃঙ্খলার প্রয়োগ সে সময়ের গ্রিসে আশ্চর্যরকম ফলদায়ী হয়ে এক সুসংবদ্ধ জ্ঞানরাজ্যের এবং চিন্তাচেতনার রূপ নেয়। ঐতিহাসিকভাবে এই সময়কে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানচেতনার উদ্ভবকাল বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

এই বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানচেতনার মৌলিক চরিত্র কী? বলা বাহুল্য মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা আর পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ থেকেই বিজ্ঞানের উদ্ভব। পৃথিবীতে প্রাণলোকের বিকাশের দীর্ঘ বিচিত্র ধারায় অন্যান্য প্রাণী যেখানে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য খাপ খাইয়ে নিয়েছে, বদলে নিয়েছে নিজেকে—সেখানে মানুষ বদলে নেয় তার পরিবেশকেই, করে নেয় তাকে নিজের অনুকূল। আর এজন্য পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির যোগ ঘটিয়ে সে আবিষ্কার করে প্রকৃতির নিয়মকানুন আর তাকে প্রয়োগ করে নিজের প্রয়োজনে। গ্রিক সভ্যতার একটি মূল বাণী ছিল : দেবতাদের নির্দেশ নয়, মানুষই হল সব কিছুর কেন্দ্র; সমাজের উদ্যোগ নিবদ্ধ হবে মানুষের প্রয়োজনে।

এই নতুন উদ্ভাবিত বিজ্ঞানকে দেখা যেতে পারে নানাভাবে : কখনো একে দেখা হয়ে থাকে মানুষের আয়ত্ত জ্ঞানের সমাহার হিসেবে, কখনো অনুসন্ধানের পদ্ধতি হিসেবে, কখনো উৎপাদন-প্রক্রিয়া উন্নয়নের উপায় হিসেবে, কখনো প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে আমাদের ধারণা ও অনুভূতি সৃষ্টির এক শক্তিমান মাধ্যম হিসেবে। তবু আবার এসব কিছু মিলিয়েই বিজ্ঞান এক ও অখণ্ড। বিজ্ঞান জন্ম দেয় নতুন উৎপাদন পদ্ধতির, নতুন নতুন শক্তির উৎসের, নতুন নতুন প্রয়োজনীয় বস্তুর—এ সবই সত্যি। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে বিজ্ঞান মানুষকে দেয় এক বস্তুনিষ্ঠ বিশ্বদৃষ্টি, বিশ্বের রহস্য অনুসন্ধানের এক সুসংবদ্ধ পদ্ধতি। গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে ভাববাদের ব্যাপক প্রাধান্য সত্ত্বেও গ্রিক সভ্যতার সময়েই এই বিজ্ঞানচেতনার স্পষ্ট রূপ প্রকাশ পায়। ভাববাদী দার্শনিকদের ব্যাখ্যা নানা ধর্মমতের জন্ম দিতে পারে, তারা একই সময়ে এক সাথে সহাবস্থানও করতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান একক ও অনন্য; বিভিন্নমুখী বিজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

বিজ্ঞান শুধু বিশ্বপ্রকৃতির বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দিয়ে সন্তুষ্ট নয়, নতুন নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই বর্ণনা ও ব্যাখ্যার রূপান্তরেও সচেষ্ট। প্রচলিত দর্শন ও ধর্ম যেখানে খুঁজছে 'শাশ্বত সত্য' সেখানে বিজ্ঞানের অন্বিষ্ট নিত্য রূপান্তরশীল প্রকৃতির রহস্য; বিজ্ঞান তাই নিত্য বিকাশশীল।

অন্য অনেক প্রাণীও অভিজ্ঞতা থেকে বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে; কিন্তু মানুষ শুধু জ্ঞান লাভ করে না, সেজন্য সুপরিকল্পিতভাবে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। এসব নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন নতুন তত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের

banglainternet.com

প্রয়োজন হয় নতুন শব্দের, নতুন বর্ণনাভঙ্গির, নতুন ভাষার। এভাবে বিজ্ঞান শুধু যে মানবসংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে তা নয়, মানবসংস্কৃতির ভাণ্ডারে বিপুল সম্ভার যোগ করেছে। এই যোগ শুধু শব্দভাণ্ডারে নয়, উৎপাদন-প্রক্রিয়ায়, চিন্তা-পদ্ধতিতে, বিশ্বদৃষ্টিতে, মনোভঙ্গিতেও।

বিজ্ঞানের বিকাশ যে ইতিহাসে সকল সময় একইভাবে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে এগিয়েছে তা নয়। গ্রিক সভ্যতার অবসানে নেমে এসেছে দীর্ঘকালের স্থবিরতা। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকে মুসলিম বিজ্ঞানীরা গ্রিক বিজ্ঞানকে সংকলিত ও ভাষান্তরিত করে তার সংরক্ষণ, বিস্তার ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তারপর এসেছে দীর্ঘকালের আপাতসুপ্তি; নতুন সামাজিক পুনর্জাগরণের সাথে যুক্ত হয়ে বিজ্ঞানের ব্যাপক বিকাশ পনের শতকের আগে শুরু হয়নি। এই সময়ে ইউরোপে দেখা দেয় রেনেসাঁ, ধর্মীয় অন্ধতার বিরুদ্ধে নতুন প্রশ্নশীলতার উদ্ভব ঘটে। ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার সহজ হয়ে ওঠে। ধনতন্ত্রের উদ্ভব নতুন নতুন অঞ্চলে বাণিজ্য বিস্তার সম্ভব করে তোলে। প্রকৃতির রহস্য সন্ধানও নতুন প্রাণ পায়।

কোপার্নিকাস, গালিলিও, কেপলার, তাইকো ব্রাহে, নিউটন, দেকার্ত, ভেসালিয়াস প্রমুখ বিজ্ঞানীদের বিপুল ও বিস্ময়কর আবিষ্কার মানুষের চিন্তাজগতে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করে। এই বিজ্ঞান-বিপ্লব জন্ম দেয় নতুন নতুন বিজ্ঞান-দার্শনিকেরও। একালের এমনি এক দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) জ্ঞান-চর্চাকে সনাতন পাণ্ডিত্যের সুউচ্চ বেদী থেকে নামিয়ে এনে ঘোষণা করেন : "বিজ্ঞানের সত্য এবং সঙ্গত লক্ষ্য শুধু এই—মানুষের জীবনকে যেন সমৃদ্ধ করা যায় নতুন নতুন আবিষ্কার আর শক্তিসম্ভারে।"

আজ আমরা জানি এই বৈজ্ঞানিক বিপ্লব কী বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে মানুষের জীবনে। শুধু সারা পৃথিবীকে মানুষ বশ করেনি, আঠার-উনিশ শতকের শিল্প-বিপ্লব মানুষকে মুক্তি দিয়েছে দুঃসহ কায়িক শ্রম থেকে, তার জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে অজস্র সুলভ পণ্যসামগ্রী উদ্ভাবনের মাধ্যমে। বিজ্ঞান আজ মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে কয়লা, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পরমাণু প্রভৃতি থেকে লভ্য বিপুল শক্তি-সম্ভার; খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বহু গুণে; রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্য মানুষকে পৌঁছে দিয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রান্তসীমায়; গ্রহলোকে ভ্রমণ আজ আর কল্পনাবিলাসমাত্র নয়। আধুনিক বিজ্ঞান এই বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে মাত্র গত তিন শতাব্দীতে। পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়ে প্রথম গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৬৫০ সালে। তারপর থেকে প্রতি ১০-১৫ বছরে গবেষণা পত্রিকার সংখ্যা দ্বিগুণ হতে হতে আজ দুনিয়াজোড়া এই সংখ্যা কয়েক লাখে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু বস্তুজগতের রূপান্তরের সাথে সাথে বিজ্ঞান আরো বড় বিপ্লব ঘটিয়েছে মানুষের মানসজগতে। প্রকৃতির নানা রহস্য সম্বন্ধেই যে কেবল মানুষ প্রশ্ন তুলেছে তা নয়, সে প্রশ্ন তুলেছে তার নিজের পূর্ব প্রজন্মের প্রবহমান ঐতিহ্য সম্পর্কে, পুরনো দিনের সকল ধ্যানধারণা সম্পর্কে। এই প্রশ্ন তোলা, সংশয় প্রকাশ করা, নতুন সত্য আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধানের পথে এগুনো—এ সবই বিজ্ঞানচেতনার প্রাথমিক অঙ্গ ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত। বলা বাহুল্য এলোমেলো দার্শনিক প্রশ্ন তুলে বিজ্ঞান এগোয়নি; প্রশ্ন তুলতে হয়েছে সুনির্দিষ্ট, তার জবাবও বের করতে হয়েছে সুনির্দিষ্ট। তারপর এমনি অসংখ্য সুনির্দিষ্ট জবাব থেকে সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ তত্ত্বের। এই তত্ত্ব আবার সহায়ক হয়েছে আরো নতুন নতুন প্রশ্নের জবাব পেতে।

বিজ্ঞানের ফলাফলকে অর্থাৎ তার উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীকে যদি বলা যায় বিজ্ঞানের বহিরঙ্গ, তাহলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতিকে, অনুসন্ধিৎসা, প্রশ্নশীলতা, চিন্তাচেতনাকে বলতে হয় তার অন্তরঙ্গ। বিজ্ঞানের অন্তরঙ্গকে বাদ দিয়ে তার বহিরঙ্গের বিকাশ সম্ভব নয়। গত কয়েক শতাব্দীতে ইউরোপে বিজ্ঞানের যে বস্তুগত সাফল্য তাকে বুঝতে হলে তার পেছনে এই মানসগত রূপান্তরের কথাটা সামনে রাখা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানচেতনার এই প্রকৃতিকে সনাতন সংস্কৃতির ধারকরা এবং ক্ষমতার ধ্বজাধারীরা অনেক ক্ষেত্রেই সহজে মেনে নিতে পারেননি। সতের শতকে কোপার্নিকাস আর গালিলিওকে বিশ্বরূপের ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে; জিওর্দানো ব্রুনোকে জ্যোতির্বিদ্যার সত্য প্রকাশের 'অপরাধে' জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছে। উনিশ শতকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে ডারউইনের ক্রমবিকাশের তত্ত্বকে। কিন্তু পাশ্চাত্যের সমাজে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত ক্ষমতা আজ এমনি স্বঘোষিত যে, তাকে অস্বীকার করা হয়ে উঠেছে অতি দুঃসাধ্য। এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে পশ্চিমের ধর্মনেতারা তাই ধর্ম আর বিজ্ঞানের পৃথক পৃথক ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে সন্ধিস্থাপন করছেন বিজ্ঞানের সাথে : বিশ্ব-প্রকৃতির রূপ, ক্রমবিকাশের তত্ত্ব, কৃত্রিম অঙ্গসংস্থাপন, জনন-প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বহু ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবস্থান আজ সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করছে।

পাশ্চাত্যে আধুনিককালের বিজ্ঞানচেতনাকে গত দু'তিনশ' বছর ধরে যে সংঘাত আর বিরোধিতার মুখে এগোতে হয়েছে আমরা আজও অনেকটা তার প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছি। তার কারণ, গোড়াতেই কবুল করে নেয়া হয়েছে, এদেশে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানচিন্তার আবির্ভাব একেবারেই সাম্প্রতিককালে। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উনিশ শতকের

banglainternet.com

মাঝামাঝি; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন ১৯২১ সালে। তবে কিছুটা ইংরেজ শাসকদের বিরূপতা আর কিছুটা বা মুসলিম সমাজের পাশ্চাত্য শিক্ষা বিমুখতার কারণে আজকের বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম মধ্যবিত্তের বিজ্ঞানচর্চার শুরু প্রকৃতপক্ষে কেবল গত দু'তিন দশক থেকে। এই সময়ের মধ্যে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার কিছুটা প্রসার ঘটেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও কিছু কিছু বিজ্ঞান গবেষণাগার গড়ে উঠেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার অর্থনৈতিক মূল্য যে আমাদের প্রচুর পরিমাণে দিতে হয়েছে তা আজ সবার কাছে দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ সতের শতকে আমাদের দেশ আর ইউরোপের মধ্যে জীবনযাত্রার মানে তেমন কিছু তারতম্য ছিল না, অথচ আজ আমাদের গড় মাথাপিছু আয়ের চেয়ে ইউরোপের বাসিন্দাদের গড় মাথাপিছু আয় প্রায় আশি গুণ বেশি। কাব্য, সঙ্গীত আর শিল্পকলার ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এই পলিমাটির দেশটি আন্তর্জাতিক নাট্যমঞ্চে প্রায়শই আজ চিত্রিত করুণার পাত্র হিসেবে। এই দারিদ্র্য আর পশ্চাদপদতার হাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মাতৃভাষা, শিক্ষা, স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের নামে এ দেশের মানুষ বারবার যে আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছে তাও অনেক ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শিক রূপ লাভ না করে মনে হয় যেন এক অন্ধগলিতে আবর্তিত।

স্পষ্টতই আমাদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ এক নিরুদ্ধ বিকাশ।

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন এ দেশে স্বাধীন অর্থনীতি বিকাশে যেমন আগ্রহী ছিল না, তেমনি ছিল না শিক্ষাব্যবস্থা বা বিজ্ঞানচেতনার বিকাশে; বরং ব্যাপক জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার বা প্রশ্নশীলতার বিকাশ তার জন্য ছিল বিপজ্জনক। মূলত এই ধারারই ফল হিসেবে আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার এখনো এক-চতুর্থাংশের সীমানা ডিঙ্গাতে পারেনি, সমগ্র শিক্ষা-কাঠামোয় এবং সমাজ-কাঠামোতেও—বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান প্রায় দুয়োরানির আসনে। এদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাতেও বিজ্ঞান শিক্ষার মানের সাথে পাশ্চাত্যের মানের প্রভেদ বিস্তর।

এমনি নিরক্ষর, শিক্ষাবঞ্চিত, দরিদ্র সমাজে সংস্কৃতির প্রসার যদি বা ঘটে—সে হয়ে দাঁড়ায় এক খণ্ডিত, সীমাবদ্ধ সংস্কৃতি। তাই দেখি আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গনে যে সব কৃতির পরিচয় তা প্রধানত হৃদয়ঘটিত, আবেগ আর অনুভূতিকে ঘিরে—কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রকলার জগতে তার বিস্তার। কিন্তু আজকের দিনে মানুষের কৃতির বিশাল প্রকাশ যে বিজ্ঞানে আর বিজ্ঞানচেতনায় তার উপস্থিতি এ সমাজে অতি ক্ষীণ। স্বভাবতই দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতেও তার প্রভাব সামান্য।

কথাটা যে একেবারে নতুন এ দাবি আমার নেই। অনেকটা এমনি ধরনের কথা আরো সুন্দর করে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) বইতে—আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে :

> 'বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।'

পরিবর্তনের চেষ্টা যে একেবারে হয়নি তা নয়। স্বাধীনতা লাভের পর পরই ১৯৭২ সালে এ দেশে ড. মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল। কমিশন তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন দু' বছর পরে—১৯৭৪ সালে। এই রিপোর্টে জোর দেওয়া হয়েছিল 'নানাবিধ কুসংস্কার, অনাচার ও দুর্নীতি অবসানের অনুকূল বিজ্ঞানমুখী, আদর্শবাদী ও সামাজিক উন্নয়নের পরিপোষক মনোভঙ্গী' গড়ে তোলার ওপর (পৃ. ২)। বলা হয়েছিল :

> 'বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য যে শুধু প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগে এক শ্রেণীর মানুষকে শক্তিশালী করে তোলা তা নয়, তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা। এর জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানের সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। সমাজের কল্যাণে বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমেই এরূপ যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে। ...বিজ্ঞান শিক্ষাকে অধিকতর ব্যাপক এবং অন্যান্য দেশের মানের সমকক্ষ করতে হবে।' (পৃ. ১০৮)

তারপর প্রায় এক যুগ অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু শিক্ষা কমিশনের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের দিকে আমরা কতদূর এগিয়েছি তা গবেষণাসাপেক্ষ। বরং ইতিমধ্যে কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা পরম উল্লাসে বিস্তার লাভ করছে সমাজের নানা স্তরে। প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় যে পরিমাণ ভাগ্যগণনা, সর্বরোগহর স্বপ্নাদ্য দাওয়াই প্রভৃতির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তা দেখলেই বোঝা যায় দেশে বিজ্ঞানচেতনার মান কোন পর্যায়ে। এমনকি বিজ্ঞান, প্রকৌশল বা চিকিৎসাবিদ্যার বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও অনেকেরই মন্ত্রপূত লাল সুতা বা সর্ববিপদহর পাথরে বিশ্বাস কিছুমাত্র কম নয়।

এ দেশের জনপ্রিয় কবি শামসুর রাহমান তাঁর কাব্যদৃষ্টিতে দেখেন 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ'। আমি কবি নই, তবু কল্পনা করতে পারি সেই উটের সওয়ার ভারাক্রান্ত অজস্র লাল সালু, কোষ্ঠি বিচার, আশ্চর্য ক্ষমতাযুক্ত মণিবন্ধ বেষ্টনী, মন্ত্রসিদ্ধ চাদর আর কবচের স্তূপে। আধুনিক যুগেও এ ধরনের মধ্যযুগীয় চেতনা ও আচারের প্রবল প্রভাব আড়ষ্ট করে রেখেছে এদেশের

banglainternet.com

জনসমাজের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগকে; বুদ্ধিজীবীদের এক বৃহৎ অংশও নিঃসন্দেহে পড়েন তার মধ্যে।

এই বিজ্ঞানবিমুখতার কারণ কী? সে কি শুধু আমাদের সমাজে প্রতিক্রিয়ার শক্তির প্রাধান্য? সামন্তবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের অবশেষ? অথবা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর জীবিকার প্রয়োজনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে গ্রহণ করেও বিজ্ঞানের চেতনাকে গ্রহণে অনীহা? কারণ যাই হোক, এই পরিস্থিতি আমাদের দেশের সামগ্রিক সামাজিক-আর্থনীতিক-সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ যেমন স্বাস্থ্যনীতি পালনে অক্ষম, তেমনি বিমুখ জনশাসনের পদ্ধতি গ্রহণে, অসমর্থ কৃষি বা শিল্পে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগেও। অর্থাৎ সমগ্র সমাজে বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত না হলে জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব নয়। মাঠের কৃষক, কারখানার শ্রমিক, সারা দেশের মানুষ বিজ্ঞানচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে না উঠলে অর্থাৎ সমগ্র জনসমাজে সংস্কৃতির অঙ্গরূপে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত না হলে শুধু পণ্য হিসেবে বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি আমদানি করে কোনো দেশ এযাবৎ প্রকৃত সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি দ্রুত ফল লাভের প্রত্যাশায় চীন কিছুদিন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে বিজ্ঞানী আর শিক্ষকদের মাঠে আর কারখানায় শ্রমদান করতে পাঠিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পরীক্ষা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে; দশ বছর পরীক্ষার পর তাদের নীতি বদলাতে হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা শেখায় যে, বিজ্ঞানের বহিরঙ্গের, তার প্রয়োগের চর্চা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তার অন্তরঙ্গ অর্থাৎ জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা আর উদ্ভাবনের অনুশীলন। তা নইলে বিজ্ঞান হয়ে পড়ে বন্ধ্যা, নিষ্ফলা অলঙ্কার মাত্র।

বিজ্ঞানকে সমাজের চেতনায় আত্মস্থ করতে হলে তাকে সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের দেশে এযাবৎ তা হয়ে ওঠেনি। এদেশে সুর ও ছন্দ, সাহিত্য ও শিল্পচর্চা যে অর্থে দেশজ রূপ নিয়েছে, সংস্কৃতিচেতনার অঙ্গীভূত হয়েছে, বিজ্ঞান সে অর্থে সংস্কৃতির অঙ্গে পরিণত হয়নি, রয়ে গিয়েছে মনোহারী পণ্যের রূপে সীমাবদ্ধ হয়ে। বলাবাহুল্য বিজ্ঞানকে সমাজের সর্বস্তরে আত্মস্থ করতে হলে একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই তা হওয়া সম্ভব। এ বিষয়ে আবার স্মরণ করা যেতে পারে আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে লেখা (১৩০৫) রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য :

> 'বিজ্ঞান চর্চার দ্বারা জিজ্ঞাসাবৃত্তির উদ্রেক, পরীক্ষণশক্তির সূক্ষ্মতা এবং চিন্তনক্রিয়ার যথাযথা জন্মে এবং সেই সঙ্গে সর্বপ্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও অন্ধ সংস্কার সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতো দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া যায়। কিন্তু আমরা বারংবার দেখিয়াছি আমাদের দেশের ইংরেজি শিক্ষিত বিজ্ঞান মেধা ছাত্রেরাও কালক্রমে তাহাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক কায়দা ঢিলা দিয়া অযৌক্তিক সংস্কারের হস্তে আত্মসমর্পণপূর্বক বিশ্রাম লাভ করেন। ... যতদিন পর্যন্ত না বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই বাহির হইতে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের মাটির মধ্যে বিজ্ঞানের শিকড় প্রবেশ করিতে পারিবে না।' (রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ: ৫০৮, ৫১৯)

সুখের বিষয় এই শিকড় প্রবেশ করাবার উদ্যোগ আজ চলছে। গত একশ' বছরে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে অসংখ্য বিজ্ঞানী আর বিজ্ঞান-লেখক বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়। বাংলাদেশে আজ উচ্চস্তরে বিজ্ঞানচর্চার উপযোগী কিছু বইও প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে। তবে এই উদ্যোগ এখনও দেশের প্রয়োজনের তুলনায় এক অতি ক্ষীণ উদ্যোগ, সমগ্র সমাজে বিজ্ঞানচেতনা বিস্তারের জন্য যে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন তা আজও গতিলাভ করতে পারেনি।

এই আলোচনা থেকে কারো মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে : তাহলে কি বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানচেতনাই আজকের দিনে সংস্কৃতির সব কিছু? সুকুমারবৃত্তি চর্চার মধ্য দিয়ে বহু হাজার বছর ধরে মানুষ যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে তার মূল্য কি ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসছে? এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, গত দু'তিনশ বছরে আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে মানুষের সংস্কৃতিতে যে বিশাল রূপান্তর ঘটে চলেছে তাকে গ্রহণ ও আত্মস্থ না করে আমাদের পক্ষে মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় তাল মিলিয়ে চলবার কোনো উপায় নেই।

এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে পঞ্চাশের দশকের শেষে বিলেতের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক সি. পি. স্নো-র 'দ্যা টু কালচারস এন্ড দ্যা সায়েন্টিফিক রেভলিউশন' (১৯৫৯) অর্থাৎ 'দুই সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিপ্লব' নামে গ্রন্থ (আসলে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত একটি ভাষণ) প্রকাশের পর যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার কথা। এই বইতে স্নো দেখিয়েছেন, পাশ্চাত্য জগতে আজ ব্যাপক সংখ্যায় বিজ্ঞানী সৃষ্টি হবার ফলে গড়ে উঠেছে তাঁদের এক নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল: এঁদের অনেকেরই সনাতন 'সাহিত্যিক' সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ অতি সামান্য—সাহিত্যকর্মে তাঁরা বিনোদনের উপকরণ খুঁজে পান না, দেখেন শুধু এক ব্যাপক নিরাশার সুর। আবার সনাতন ঐতিহ্যের ধারক সাহিত্যিক মহলে বিজ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের বিষয়েও রয়েছে অমার্জনীয় অজ্ঞতা; বিজ্ঞানীদের তাঁরা মনে করেন প্রায় অসংযত পরিমাণে আত্মবিশ্বাসী আর আশাবাদী। বিজ্ঞান-বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত এই দুই সংস্কৃতির সমন্বয়ের প্রশ্ন তুলেছেন লর্ড স্নো।

বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি থেকে আজ যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে তা নিয়েও উঠেছে নানা প্রশ্ন। বিজ্ঞানীর বস্তুনিষ্ঠতা কি সর্বত্রগামী? বিজ্ঞানের বিকাশের

banglainternet.com

সম্ভাবনা কি সর্বক্ষেত্রে সীমাহীন? সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বিজ্ঞানীর সৃষ্টিশীলতার স্বাধীনতা কতখানি? গবেষণার ফলাফলের প্রয়োগের ওপর তাঁর বা সমাজের সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণ কতটা কার্যকর? বস্তুজগতের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের নিয়ম যেভাবে প্রযোজ্য, তা কি একইভাবে প্রযোজ্য মনোজগৎ ও সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে?

এসব প্রশ্ন শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের নয়, আজকের পৃথিবীর সামগ্রিক সাংস্কৃতিক অঙ্গনেরই প্রশ্ন। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের সংস্কৃতি এমন ক্ষীণ বলেই এসব প্রশ্ন আজো তেমন প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু তবু সংস্কৃতির অঙ্গনে বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানচেতনার ভূমিকা কী সে প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের করতেই হবে; আর এ প্রসঙ্গ আজ যেমন গুরুত্বপূর্ণ আগামী দিনে তা নিঃসন্দেহে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আর এসব প্রশ্নের সুসংগত মীমাংসার ওপর নির্ভর করবে শুধু এ দেশের সাংস্কৃতিক রূপ নয়, আগামী দিনের সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের রূপরেখাও।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫

[উৎস : *বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭]

বিকিনি

বিকিনি।...

উদার মহাসাগরের বুকে ছায়ার মায়ায় ঘেরা ছোট্ট প্রবাল দ্বীপ।

সেখানে মানুষ কম, প্রকৃতির সৌন্দর্য বেশি—নগ্ন প্রকৃতির সৌন্দর্য!

অনেকখানি পানিকে ঘিরে রয়েছে সরু স্থলের ফালি: সাগরের কিনারায় কিনারায় তাল-নারকেলের সবুজ বন। ভোরের বাতাসে সুদীর্ঘ নারকেল পাতাগুলো আন্দোলিত হয়। শিশির-ভেজা সবুজ পাতা সূর্যের আলো পড়ে চিক চিক করে ওঠে।

বিকিনি, কাওয়াজেলিন, এনিওয়েটক, রংল্যাপ এবং আরো কয়েকটি ছোট ছোট প্রবাল দ্বীপ নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন, এই বিকিনি প্রবাল বলয়ের মাঝখানে আণবিক বোমার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। জায়গাটা মানুষের লোকালয় থেকে, বড় জনপদ থেকে সুদূর দূরে (ঢাকা থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মাইল): তবু অনেক বৈজ্ঞানিক ভয়ে অস্থির হলেন। এই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও না আবার পৃথিবীটা শুদ্ধ উড়ে যেতে হয়—গোটা পৃথিবীটাই বুঝি পরমাণুতে বিভক্ত হয়ে গুঁড়িয়ে গেল!

কিন্তু, না। বিস্ফোরণ নিরাপদে হয়ে গিয়েছে: সম্ভাব্য তেমন ভয়ঙ্কর কিছুই ঘটেনি।

আণবিক বোমার বিপুল খরচ বাদ দিয়ে প্রায় ২১ কোটি টাকা ব্যয়ে এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের তোড়জোড় আরম্ভ হল। বিকিনি প্রবাল বলয়ের মধ্যে নানা আকারের, নানা ধরনের ৭৩টি জাহাজ রাখা হল—বোমার আঘাতে ধ্বংস হবার জন্য। জাহাজগুলো বেশির ভাগই পুরনো: তাই খরচ বলছি ২১ কোটি টাকা (প্রায়), কিন্তু এগুলোকে আবার নতুন করে তৈরি করবার খরচ ধরলে ব্যয়ের অঙ্ক আরো বহুগুণ বেশি হবে।

এই জাহাজগুলোর মধ্যে ছিল যুদ্ধ-জাহাজ, ক্রুজার, বিমানবাহী জাহাজ, সাবমেরিন এবং আরও নানা ধরনের জাহাজ। এই সব জাহাজে আণবিক বিস্ফোরণের ক্ষতির পরিমাণ কী রকমের হয় তা দেখেই ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র তার জাহাজগুলোতে উপযুক্ত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

banglainternet.com

জাহাজগুলো অমনি খালি খালি সমুদ্রের ওপর ফেলে রাখা হয়নি। প্রত্যেক জাহাজকে দূর থেকে যাতে চিনতে পারা যায় তার জন্য নানাভাবে রং করা হয়েছে। তারপর তার ভেতরে নানারকম খুব সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রাখা হয়েছে—আণবিক বিস্ফোরণের যে তেজস্ক্রিয় ফলাফল সেগুলো পরীক্ষা করবার জন্য। কোনো জাহাজে রাখা হল পেট্রল, কোনো জাহাজে নানারকম ব্যাধির জীবাণু। ৩৩০০০ টনী যুদ্ধজাহাজ পেনসাকোলায় ছাগল, শূকর, ইঁদুর ভরে দেওয়া হল। বিস্ফোরণ শেষে এগুলোকে সাবধানে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য।

সব জাহাজগুলোকে প্রবাল বলয়ের মধ্যে সাজিয়ে রাখা হল। মূল যে জাহাজটার ওপর আণবিক বোমা সোজাসুজি ফেলা হবে তার নাম 'নেভাদা'—এটাকে সাদায় কমলায় রং করে দেওয়া হল। বিস্ফোরণের সময় উত্তাপ কতখানি হয় সেটা পরীক্ষা করবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা জাহাজের বিশেষ বিশেষ জায়গায় এমন বিশেষ রং লাগিয়ে দিলেন যার পরিবর্তন দেখে উত্তাপের পরিমাণ স্থির করা যাবে।

এ তো গেল প্রবাল বলয়ের ভেতরকার ব্যাপার। দেখা যাক, এর বাইরে কী রকমের ব্যবস্থা করা হল।

সহকারী নৌ-সেনাধ্যক্ষ উইলিয়াম ক্যান্ডিকে দেওয়া হল এই পরীক্ষাকার্যের নেতৃত্ব করতে। তিনি এজন্যে সবশুদ্ধ দুশোরও বেশি জাহাজ, দেড়শোটি বিমান এবং প্রায় ৪০ হাজার মানুষ আনিয়েছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছিলেন বহু বৈজ্ঞানিক,—খবর সংগ্রহ করবার জন্য সমবেত হয়েছিলেন প্রায় দুশো সাংবাদিক। সাংবাদিকরা ছিলেন পরীক্ষা-কেন্দ্র থেকে মাইল পনের দূরে পর্যবেক্ষক জাহাজ অ্যাপানেশিয়ান-এ। বিস্ফোরণ যেন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পান তার জন্য জাহাজে সব রকমের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। টেলিভিশনের পর্দা এবং বিস্ফোরণের সঠিক শব্দ শুনবার জন্য রেডিও লাউড স্পিকারের ব্যবস্থা ছিল। অধ্যক্ষ ক্যান্ডি নিজে ছিলেন কম্যান্ড জাহাজ মাউন্ট ম্যাক-কিনলীতে—বিস্ফোরণের কেন্দ্র থেকে এগার মাইল দূরে।

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি যে, বিকিনিতে যা' অল্পসংখ্যক অধিবাসী ছিল, তাদের অনেক আগে থেকেই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অনেক পূর্বদিকে রংএরিক দ্বীপের নিরাপদ আশ্রয়ে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কিছু ঠিকঠাক করা হল। তারপর এল নির্দিষ্ট দিন। পয়লা জুলাই, ১৯৪৬।

বিকিনির প্রভাত।...

সমুদ্রের বুক থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলে জেগে উঠল ভোরের সূর্য।...

নির্জন বিকিনি দ্বীপে নতুন ভোরের আলো। সে আলো গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল কাওয়াজেলিনে। লুটিয়ে পড়ল কাওয়াজেলিনের আণবিক বোমার ওপর।

গুরুদায়িত্ব ছিল আবহাওয়াবিদদের হাতে। তাঁরা জানালেন : আকাশ পরিষ্কার, পরীক্ষা চলবে। ক্যান্ডির অফিস থেকে চতুর্দিকে সংবাদ ছুটল, পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হবে।

চল্লিশ হাজার মানুষ। বিকিনির আশেপাশে—অনেক দূরে দূরে—দশ মাইলের বিপদ-সীমানার বাইরে চল্লিশ হাজার মানুষ উদগ্রীব, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

বিকিনির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ২০০ মাইল দূরে কাওয়াজেলিন দ্বীপ থেকে সোমবার ভোরে ছ'টায় 'ডেভস ড্রিম' বিমান আণবিক বোমা নিয়ে আকাশে উড়ল। ঠিক এই ধরনের একটা বোমা জাপানের নাগাসাকি শহরের ওপর প্রলয়ঙ্কর মৃত্যু-তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল, তারই জাতভাই চলল বিকিনির দিকে। এর পিছে পিছে চলল আর কতকগুলো পর্যবেক্ষণ বিমান—তার ভেতর থেকে প্রত্যক্ষভাবে আণবিক ধ্বংসলীলা দেখবার জন্য চললেন বৈজ্ঞানিক আর সাংবাদিকগণ।

বিকিনির পশ্চিমে এনিওয়েটক দ্বীপ থেকে রেডিও-চালিত মক্ষিকা বিমানগুলোও বিকিনির দিকেই উড়ে চলল।

'ডেভস ড্রিম' বিকিনির ওপর দিয়ে কয়েকবার পাক দিল—লক্ষ্যবস্তু নেভাদা জাহাজের ওপর থেকে হালকা মেঘগুলো সরিয়ে দিল। তারপর সেই ভয়াবহ মুহূর্তে—বিকিনি সময় নয়টা (বেঙ্গল টাইম ভোর সাড়ে চারটা) বাজবার আধ মিনিট আগে বোম্বার্ডিয়ার মেজর হ্যারল্ড উক সাগরের ৩০ হাজার ফিট উপরে একটা বোতাম টিপলেন—সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর আণবিক বোমা তার প্রচণ্ড নিদ্রিত শক্তি নিয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে এল। চল্লিশ হাজার উৎসুক মানুষ তার বিস্ফোরণের ভয়ঙ্করিতা অনুভব করলেন।

অনেক উঁচু পর্যবেক্ষণ বিমান থেকে যাঁরা বিস্ফোরণ দেখেছেন তাঁরা এর এই বর্ণনা দিয়েছেন :

> প্রথমে একটা সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ আলোর বিন্দু দেখা গেল—একটা উত্তপ্ত সাদা পিনের ডগার মতো—এর রশ্মি, একেবারে চোখের ভেতরে প্রবেশ করে। তার পর প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল আলোর ঝলকানি—ভীষণ চোখধাঁধানো কমলা রঙের আলো—তাকে চর্মচক্ষুতে দেখবার চাইতে অতীন্দ্রিয় দিয়ে অনুভবই করতে হয় বেশি। এরপরেই দেখা যায় আণবিক বোমার বিপুল শক্তি। উজ্জ্বল আলোর শিখাময় একটা বিরাট সাদা অগ্নি-গোলক চোখ ধাঁধিয়ে পাক খেতে খেতে ওপর দিকে উঠছে- সমস্ত বিকিনি দ্বীপকে এটা ঢেকে দিয়েছে। আর তার

banglainternet.com

ভেতর দিয়ে একটা গাঢ় লাল রঙের মেঘ ছত্রাকারে ওপর দিকে প্রায় ৬০ হাজার ফিট উঠে গেল। বাষ্পের মতো তেজস্ক্রিয় ধুম্রজাল মেঘের ওপর দিয়ে বিস্তৃত হ'ল।

ধীরে ধীরে এই মেঘের স্তম্ভ গাঢ় ধূসর ও সাদা রঙের মেঘে রূপান্তরিত হ'ল—পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই মেঘ অদৃশ্য হ'ল।

বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই স্থল ও জাহাজ থেকে রেডিও-চালিত মক্ষিকা বিমানগুলো মেঘপুঞ্জের মধ্যে ঢুকে যায়। যে তেজস্ক্রিয় মৃত্যুমেঘ বায়ুর উচ্চস্তরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল তাকে অনুসরণ করবার জন্য কয়েকটি মক্ষিকা বিমান পাঠানো হয়—কিছুদূর গিয়েই এই মেঘ হারিয়ে যায়। শুধু একটি ছাড়া আর সব মক্ষিকা বিমান মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে নিরাপদে স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসে। বিস্ফোরণের নিকটবর্তী স্থানের সমুদ্রজল পরীক্ষা করবার জন্য রেডিও-চালিত নৌকোও পাঠানো হয়েছিল।

চারদিক যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন সবাই দেখতে পেল নেভাদা জাহাজ অক্ষত অবস্থায় রয়েছে—সম্ভবত বোমাটি সঠিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর পড়েনি। লক্ষ্য কেন্দ্রের অনেক দূরের জাহাজেও তাপ-রশ্মির প্রভাবে আগুন লেগে গিয়েছিল। বিস্ফোরণের শব্দ নাকি অনেকের কাছেই আশানুরূপ মনে হয়নি।

পঁচাত্তর মিনিট পরে 'মাউন্ট ম্যাক-কিনলী' জাহাজ ধীরে ধীরে প্রবাল বলয়ের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। বিস্ফোরণের তিন ঘণ্টা পরে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক গাইগার কাউন্টার ও নানা রকম বিশেষ আত্মরক্ষামূলক পোশাক পরে নৌকো নিয়ে হ্রদের দিকে এগিয়ে চললেন। লক্ষ্যবস্তু থেকে অনেক দূরে থেকেই তাঁরা জানালেন :

সমুদ্র এখন অত্যন্ত বিপজ্জনক—পানি তেজস্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে। মূল কেন্দ্রের জাহাজে গিয়ে উঠতে অন্তত আরো কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে।

শেষ খবরে প্রকাশ, ৫টি জাহাজ ডুবেছে অথবা খুব বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৯টি, ৫টি অল্প ক্ষতিগ্রস্ত আর ৪০টা সামান্য ধ্বংসের কবলে পড়েছে।

এতগুলো মানুষের মধ্যে এই পরীক্ষায় মাত্র একজন লোকের একটা চোখ নষ্ট হয়েছে—একটা যন্ত্রের আঘাত লেগে। আর কারও কোনও রকম ক্ষতি হয়নি।

অধ্যক্ষ ক্যান্ডি যদিও বলছেন : আমাদের এই পরীক্ষা (Operation Crossroads) আনুষ্ঠানিক দিক দিয়ে পুরোপুরি সাফল্যমণ্ডিত, অনেকের মতে এটা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। এই বোমার স্বল্প কার্যকারিতায় অনেকেই বিস্মিত। তাঁরা ভাবছেন আণবিক শক্তি তা হলে একটা ফাঁকি মাত্র।

যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগ উল্লাসের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, আগামী আণবিক যুগেও বর্তমানের বড় বড় বাহিনী, যুদ্ধজাহাজ বা অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার অস্বীকার করা যাবে না,—এই কথাটাই বর্তমানের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। এই নৌ-বহর যদি খোলা সমুদ্রে থাকত আর উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারত তা'হলে ক্ষতির পরিমাণ হোত খুবই সামান্য।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, শুধু লোহার জাহাজ নিয়ে নৌ-বাহিনী তৈরি হয় না। জাহাজে মূল্যবান জিনিসপত্র থাকে, ইঞ্জিন-কলকব্জা থাকে, দাহ্য পদার্থ থাকে,—আর সবচেয়ে যা বড় কথা, মানুষ থাকে। এ সব যদি নষ্ট হ'ল, তা'হলে আর নৌ-বাহিনীর অস্তিত্ব রইল কোথায়?—বিকিনিতে আণবিক বোমা যতটা ক্ষতি করেছে, অন্য কোনও বোমাই অতটা ক্ষতি করতে পারত না।

বর্তমানের বোমা নাগাসাকিতে ফেলা বোমার সমপর্যায়ের। কোনও কারণে, এর বিস্ফোরণ নাকি নির্দিষ্ট সময়ের ৩ সেকেন্ড আগে হয়েছে। তার অর্থ, নাগাসাকিতে যে উচ্চতায় বোমা ফেটেছিল এখানে ফেটেছে তার চারগুণ উঁচুতে—মাঝপথে। এইজন্য এর প্রভাব বেশিরভাগ ছড়িয়ে পড়েছে ওপরের দিকে। এটাও ক্ষতি অল্প হবার একটা কারণ।

বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ছত্রাকারে যে মেঘ উঠেছিল, তার একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এটা যখন চল্লিশ হাজার ফিট উঁচুতে উঠেছে তখন মনে হ'ল এটা একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা পড়েছে। 'শাংরি-লা' জাহাজের পাইলট এর বর্ণনা দিয়ে বলেছেন : তিনি এই মেঘের মধ্যে হঠাৎ একটা বরফের চাদর দেখতে পেলেন- এই বরফ ২৮ হাজার ফিট উঁচুতে ছিল। বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, হয়তো এমনও হতে পারে যে, বোমার বিস্ফোরণের সময় প্রচুর পরিমাণ সমুদ্রের পানি বাষ্পীভূত হয়ে মেঘের সঙ্গে শূন্যে উঠে পড়েছিল। মেঘ যতই উঁচুতে উঠতে লাগল, আণবিক গ্যাস ততই ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল। এই ঠাণ্ডা গ্যাসকে বিস্ফোরণের ধাক্কা ক্রমেই আরো ওপরের দিকে ঠেলে দিতে লাগল। ২৮ হাজার ফিট উচ্চতায় এর তাপ এত কমেছিল যে, শূন্যেরও ৩০ ডিগ্রি নিচে নেমে এসেছিল। এই অবস্থাতেই বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে মেঘের ওপর বরফের চাদর সৃষ্টি করেছিল।

কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক মনে করেন, বিস্ফোরণের সময় তাপের সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় ১০ কোটি ডিগ্রি। এত উত্তাপে সব ধাতু গলে যাওয়ার কথা; কিন্তু

banglainternet.com

এডমিরাল সোলেবার্গ বলছেন : কোনও জাহাজের ধাতু গলে যেতে দেখা যায়নি।

মারাত্মক তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন মরণ-মেঘকে মক্ষিকা বিমান দিয়ে মাত্র ৩৫ হাজার ফিট উচ্চতা পর্যন্ত অনুসরণ করা গিয়েছে—নাগাসাকিতে দৃষ্ট মেঘের উচ্চতার অর্ধেক মাত্র। তারপর এরা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, এ রহস্যের সমাধান পাওয়া যায়নি।

আর একটা জিনিস অতি সাধারণ লোকের কাছেও খুব আশ্চর্যজনক ঠেকেছে। এই পরীক্ষা পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম বোমার পরীক্ষা; কিন্তু বিস্ফোরণের ধুম্রজাল যখন অপসারিত হ'ল তখন দেখা গেল, বিকিনির উপকূলে তাল নারিকেলের সারি অক্ষত রয়েছে—বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে তারা আন্দোলিত হচ্ছে। ... পেনসাকোলা জাহাজে ছাগলগুলো নিশ্চিন্ত আরামে ঘাস চিবুচ্ছে। এত বড় একটা প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে গেল, কিন্তু তাদের দেহে বা মনে কোনও রকমের বিকৃতিই যেন আসেনি।

এই জিনিসটা সকলের পক্ষে বোঝা একটুখানি শক্ত। তাই এই খবর শুনে অনেকে জীবদেহের ওপর আণবিক বোমার মারণ ক্ষমতাকে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে ব্যাপারটা যত সোজা মনে হচ্ছে, এর মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে তেমনি ভয়ঙ্কর।

আণবিক বোমার ক্ষতি হয় প্রধানত তিনভাবে। প্রথমত, মূল বিস্ফোরণের সংঘাত (blast)। দ্বিতীয়ত, তাপ-রশ্মির প্রভাব, যাতে নিকটবর্তী সব কিছুতে আগুন ধরে যায়। আর তৃতীয় হচ্ছে, সূক্ষ্ম, শক্তিশালী রশ্মির আক্রমণ—এদের এক কথায় বলা হয় গামা-রশ্মি।

বিস্ফোরণের পর এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে তীব্র আলোর ঝলকানিতে অনেক দূরের জিনিস পর্যন্ত পুড়ে যায়। প্রায় এক মাইলের মধ্যে খালি গায়ে মানুষের চামড়া পুড়ে বাদামি বা কালো রঙের হয়ে যায়, এই সব লোক মারা যায় কয়েক মিনিট অথবা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। দেড় মাইল পর্যন্ত মানুষের শরীর অল্প ঝলসে যায়।

বহু আগুন অবশ্য গৌণ কারণেও উৎপন্ন হয়—যেমন, গ্যাস অথবা ইলেক্ট্রিকের লিক থেকে;—তবে তাপ-রশ্মিতেও এক মাইল পর্যন্ত আগুন ধরে যায়।

তেজস্ক্রিয় ক্ষতির মধ্যে গামা-রশ্মির যে ফল সে বড় মারাত্মক। এরা দেহের চামড়ার ভেতর দিয়ে চলে যায়, কিন্তু কোনও প্রত্যক্ষ ক্ষতি দেখতে পাওয়া যায় না। চব্বিশ ঘন্টা পরে অস্বস্তিভাব, বমন এবং জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, মাথার চুল পড়ে যেতে থাকে। তিন সপ্তাহ পরে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়।

এই গামা-রশ্মি হাড়ের মজ্জাকে আক্রমণ করে; নতুন রক্ত-কণিকা আর তৈরি হতে পারে না। এইভাবে দেহের লোহিত ও শ্বেত রক্ত-কণিকা কমে গেলে আপনা আপনি রোগীর মৃত্যুর পথ তৈরি হয়। গামা-রশ্মি সব রকমের দেওয়ালকে ভেদ করে যেতে পারে। বিস্ফোরণের কেন্দ্র থেকে এক মাইল পর্যন্ত এর প্রভাব থাকে।

এই পরীক্ষার প্রায় এক বছর আগে, ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমা শহরে আণবিক বোমা ফেটেছিল প্রায় ১০ বর্গমাইল জায়গায় কাঠের ঘরবাড়ির উপর—তা' থেকে বিস্ফোরণে ও আগুনে ধ্বংস হয়েছিল প্রায় ৪ বর্গমাইল। সেখানকার ৩ লক্ষ ২০ হাজার লোকের মধ্যে মারা গিয়েছিল প্রায় ৮০ হাজার লোক।

এর পরেই নাগাসাকিতে বোমা পড়ে ৯ই আগস্ট—একটা উপত্যকার দেড় বর্গমাইল জায়গায় শিল্পাগার এতে বিনষ্ট হয়েছে। এখানে প্রায় ৪০ হাজার মানুষ মারা যায়। জাপানের ওপর আণবিক বোমার ফলাফল সম্বন্ধে এই খবরগুলো খুব অল্পদিন হ'ল প্রকাশ পেয়েছে, একটা বৃটিশ মিশনের বহুদিন ধরে অনুসন্ধানের পর।

তাঁরা মন্তব্য করেছেন : এই দুটি শহরই এক সময় ছিল উন্নতিশীল এবং জনাকীর্ণ; কিন্তু আজ এরা অন্ধকারের অতল গহ্বরে ডুবে গিয়েছে। এই হচ্ছে ভয়ঙ্কর আণবিক বোমার বিস্ফোরণের প্রকৃত স্বরূপ। আমেরিকা আজ আণবিক বোমাকে নিখুঁত করবার চেষ্টায় মত্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু এর একমাত্র ফল হবে একটা তৃতীয় মহাযুদ্ধ এবং মানুষের অনেক আদরের, অনেক গৌরবের এই গগনস্পর্শী সভ্যতার সম্পূর্ণ বিলোপ।

—মানুষের সভ্যতারও অপমৃত্যু!...

(১৩৫৩/১৯৪৬)

[উৎস : *বিজ্ঞান ও মানুষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫]

banglainternet.com

আন্তর্জাতিক ভূতত্ত্ব-বর্ষ

'অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুররাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী...'

—রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঐকতান' কবিতায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন : 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি। দেশে দেশে কত না নগর, রাজধানী—।' পৃথিবীর কথা সত্যি যে আমরা আজও কত কম জানি তা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। নগর রাজধানীর বিস্তারিত বিবরণ বাদ দেয়া যাক, যে পৃথিবীর নগরে আমরা বাস করছি তার সত্যিকার চেহারাটিই কি আজও আমরা ভালো করে জানি? শুনতে খুব আশ্চর্য লাগবে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে আজও পৃথিবীর সাত রকম ভিন্ন ভিন্ন আকারের ধারণা চালু রয়েছে। কোনে কোনো বিজ্ঞানীর মতে, চাঁদের উপরিতল সম্বন্ধে আমরা যতটা ভালো করে জানি পৃথিবী সম্বন্ধে ততটা জানিনে।

অথচ পৃথিবীর কথাই আমাদের সব চাইতে ভালো করে জানা দরকার। কেননা, পৃথিবীর চারদিকের অবস্থা আমাদের সমগ্র জীবনের ওপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে।

আজকের এই বিশ শতকে পৌঁছে একদিকে যেমন আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত পদসঞ্চার ঘটেছে, তেমনি বিজ্ঞানীর দুঃসাহসী অভিযান ঘোষিত হয়েছে পৃথিবীর দিকে দিকে। পৃথিবীর সমগ্র ভূভাগ মানুষ চষে বেড়িয়েছে, সন্ধানীরা নেমেছে গভীর সমুদ্রের তলায়, বেলুনে চেপে বিজ্ঞানী-মানুষ উঠেছে সুউচ্চ আকাশে, বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে চলেছে দিবা-রাত্রির সাধনা। কিন্তু তবু পৃথিবীর সব রহস্যের আজো কিনারা হয়নি।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, বহু শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে মহাদেশগুলোর স্থান পরিবর্তন ঘটেছে। এ কথা কি সত্যি? পৃথিবীর তুষার-ঢাকা এলাকা কমে যাওয়া থেকে মনে হয় পৃথিবী দিন দিন গরম হয়ে উঠছে। এটা সত্যি হলে তার কারণ কী? পৃথিবীকে মনে হয় যেন বিরাট একটা চুম্বক। তার এই চুম্বকের কী রহস্য? পৃথিবীর ওপরে বহু মাইল বিস্তৃত যে হাওয়ার চাঁদোয়া তার মধ্যেই রয়েছে দুনিয়ার সব দেশের আবহাওয়ার চাবিকাঠি। এই আবহাওয়ার পরিবর্তন সম্পর্কে

ভবিষ্যদ্বাণী করার কি কোনো উপায় বের করা যায় না? পৃথিবীর আবহাওয়ার ওপরে দক্ষিণ-মেরুর বা সূর্যের প্রভাবটা ঠিক কী ধরনের? উত্তর বা দক্ষিণ মেরুতে মাঝে মাঝে যে মেরু-জ্যোতি দেখতে পাওয়া যায় তা কী করে তৈরি হয়? কসমিক রশ্মিরই বা উৎপত্তির রহস্য কী?—এমনি আরো অজস্র, অসংখ্য প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞানীদের আজও ভালো করে জানা নেই।

এ রকম অস্পষ্ট জ্ঞান নিয়ে এগোতে গেলে বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রেই পদে পদে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অথচ সমস্যাগুলো এমন যে কোনো একটি দেশের বিজ্ঞানীদের পক্ষেই এগুলোর পুরোপুরি বা সন্তোষজনক সমাধান করা সম্ভব নয়। এসব রহস্য ভেদ করতে হলে সারা দুনিয়া জুড়ে গবেষণা এবং অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, আর তার জন্যে প্রয়োজন সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং সংযুক্ত উদ্যম।

দুনিয়ার ৬৪টি দেশের ৭০০০-এরও বেশি বিজ্ঞানী এই উদ্দেশ্যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের সম্মিলিত উদ্যোগে এ-বছরের (১৯৫৭) পয়লা জুলাই থেকে ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পালন করা হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক ভূতত্ত্ব-বর্ষ' হিসেবে (যদিও সময়টা আসলে আঠারো মাস)। এই আঠারো মাস ধরে একটি আন্তর্জাতিক কমিটির তত্ত্বাবধানে ৫৬টি দেশের বিজ্ঞানীরা তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি অনুযায়ী ব্যাপক গবেষণা চালাবেন। আর তাঁদের এই গবেষণার ফলাফল হবে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদেরই সাধারণ সম্পত্তি।

প্রশ্ন হতে পারে, ১৯৫৭-৫৮ সালেই হঠাৎ সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের এমন বিরাট আকারের ঐতিহাসিক সহযোগিতা কী করে সম্ভব হল?

—ব্যাপারটার সামান্য একটু ইতিহাস আছে।

১৮৮২-৮৩ সালে ছোট আকারে একটি মেরু-বর্ষ পালন করা হয়েছিল—উত্তর মেরুতে অভিযান চালানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। পঞ্চাশ বছর পরে ১৯৩২-৩৩ সালে ১২টি দেশের বিজ্ঞানীরা মিলে দ্বিতীয় মেরু-বর্ষ পালন করেন। তখন মোটামুটি ধারণা করা হয় যে, আবার পঞ্চাশ বছর পরে আরেক মেরু-বর্ষ পালন করা হবে। কিন্তু বছর পনের যেতে-না-যেতেই দেখা গেল বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতকগুলো মৌলিক তথ্য এমন জরুরি হয়ে উঠেছে যে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করা আর সম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মিলিত উদ্যোগে অবিলম্বেই প্রচুর তথ্য আহরণ করা প্রয়োজন। দেখা গেল ১৯৫৭-৫৮ সালে একটা শুভ যোগ রয়েছে। সাধারণত এগার বছর পর পর সূর্যের গায়ে সৌর-স্ফীতি এবং কলঙ্কের প্রাচুর্য দেখা দেয় আর পৃথিবীর ওপর নানাভাবে তার প্রভাব পড়ে। হিসেবমতো ১৯৫৭-৫৮ সালে আবার এমনি সৌর তৎপরতা দেখা দেবার

banglainternet.com

কথা, আর তখনই হবে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে অনেক অজানা রহস্যের তত্ত্ব-সন্ধানের সবচাইতে উপযুক্ত সময়। কাজেই ১৯৫০ সালে বিজ্ঞানীদের এক সভায় স্থির করা হল, দ্বিতীয় মেরু-বর্ষের পঁচিশ বছর পরেই অর্থাৎ ১৯৫৭-৫৮ সালে 'তৃতীয় বর্ষ' উদযাপন করা হবে—আর এবারে অভিযান চলবে শুধু উত্তর মেরুর রহস্য-উদ্ধারের জন্য নয়, সারা পৃথিবীরই রহস্য-উদঘাটনে।

ভূতত্ত্ব-বর্ষ যদিও সরকারিভাবে ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই থেকে শুরু হবার কথা, কিন্তু প্রস্তুতির কাজ চলতে লাগল ১৯৫৪ সাল থেকেই। এই বছরই মার্কিন বিজ্ঞানীরা দক্ষিণ মেরুতে অগ্রগামী অভিযাত্রী দল পাঠালেন। সোভিয়েত ও ব্রিটিশ অভিযাত্রীদলও রওয়ানা হলেন উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে। প্রধানত যে তেরটি বিভিন্ন দিকে ভূতত্ত্ব-বর্ষের অনুসন্ধান ও গবেষণার কাজ পরিচালনা করা হবে তার সব দিকেরই উদ্যোগ আয়োজন চলতে লাগল ১৯৫৪, ১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ সাল ধরে। দক্ষিণ মেরুর গবেষণা এই ১৩টি বিভিন্ন দিকের একটি মাত্র।

দক্ষিণ মেরু গবেষণা

কিন্তু দক্ষিণ মেরুর দিকেই বিজ্ঞানীদের প্রথম দৃষ্টি পড়ল কেন? দক্ষিণ মেরু-মহাদেশ হচ্ছে একটি বিশাল স্থলভাগ—৬০ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা—অর্থাৎ সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একত্র করলে যত বড় হবে প্রায় তত বড়। অথচ এই মহাদেশটির কথাই পৃথিবীর আর সব মহাদেশের তুলনায় আমরা সবচাইতে কম জানি।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন যে, দক্ষিণ মেরুতে সবচাইতে সমৃদ্ধ লোহা ও কয়লার খনির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তা ছাড়াও এখানে রয়েছে তামা, ইউরেনিয়াম, সোনা ইত্যাদি বহু দুর্মূল্য ধাতু। তবু এইসব খনিজের লোভই দক্ষিণ মেরুর সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের আগ্রহের সবচাইতে বড় কারণ নয়।

দক্ষিণ মেরু হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে বড় শীতল এলাকা। সারা পৃথিবীতে যত হিমবাহজাত বরফ আছে তার শতকরা ৮৬ ভাগই জমে রয়েছে দক্ষিণ মেরুতে—এমন বিপুল এর পরিমাণ যে, এই বরফ সবটা যদি গলে যায় তা হলে সারা পৃথিবীতে সমুদ্রের উচ্চতা ফেঁপে উঠবে দেড়শো থেকে দুশো ফুটের মতো। বিজ্ঞানীদের এটা জানা আছে যে, দক্ষিণ মেরুর শীতল হাওয়ার সঙ্গে বিষুব অঞ্চলের উষ্ণ হাওয়ার নিরন্তর আদান-প্রদান চলছে এবং তার ফলে দক্ষিণ মেরুর এই বিপুল বরফের পুঞ্জ শীতাতপের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে সমগ্র পৃথিবীর আবহাওয়ার ওপর একটা বিরাট প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। অথচ আবহাওয়ার ওপর দক্ষিণ মেরুর এই বিশাল প্রভাব সম্বন্ধে প্রায় কিছুই আমাদের জানা নেই। তাছাড়াও, আকাশের বহু রহস্য অনুসন্ধান করার ব্যাপারে দক্ষিণ মেরুর

কতকগুলো বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশে প্রাণীদেহের নিঃশ্বাস-নিঃসৃত কার্বন-ডাই-অকসাইড গ্যাস আবহাওয়ার মধ্যে একটা অদৃশ্য জালের সৃষ্টি করে, তার ভেতর দিয়ে বাইরের সব রশ্মি পৃথিবীর ওপর এসে পড়ে না। দক্ষিণ-মেরুতে কোনো প্রাণীর বাস নেই, তাই সেখানকার আবহাওয়া প্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড শূন্য। তার ফলে দক্ষিণ-মেরুর আকাশে এমন কতকগুলো গবেষণা করা সম্ভব যা' পৃথিবীর আর কোথাও সম্ভব নয়।

এবার দক্ষিণ মেরুতে যে গবেষণা চালানো হবে তাতে ১২টি দেশের বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করবেন। আর এর জন্য সেখানে ৬০টি গবেষণ—কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। তাতে কাজ করবে প্রায় ৫০০০ জন লোক, ৫০টি জাহাজ এবং ৫০টি বিমান।

মাধ্যাকর্ষ ও মেরুজ্যোতি

দক্ষিণ-মেরুর গবেষণা থেকে মাধ্যাকর্ষ এবং পৃথিবীর চুম্বক-ক্ষেত্রের রহস্যও উদ্ধার করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মাধ্যাকর্ষের শক্তি বিভিন্ন। এ থেকে বোঝা যায় পৃথিবী একটি আদর্শ বর্তুলাকার নয়। কিন্তু যথেষ্ট তথ্যের অভাবে পৃথিবীর সত্যিকার আকার কী, এ প্রশ্নের এখনও কোনো সন্তোষজনক মীমাংসা হয়নি।

জানা গিয়েছে যে, পৃথিবীর ব্যবহার বিশাল একটি চুম্বকের মতো। সাধারণ যে কোনো চুম্বকদণ্ডের মতোই তার উত্তর ও দক্ষিণ দুটি চুম্বকপ্রান্ত রয়েছে। পৃথিবীর এই চুম্বকশক্তির জন্যেই দিকদর্শন শলাকা সব সময় উত্তর-দক্ষিণে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কিন্তু পৃথিবীর এই চুম্বকত্বের কিভাবে যে উৎপত্তি হয়েছে তা বিজ্ঞানীদের এখনও নির্দিষ্ট করে জানা নেই। কখনো কখনো পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রে আকস্মিক ব্যতিক্রম দেখা দেয়, তারও সঠিক কারণ এখনও অজ্ঞাত। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ চুম্বক-মেরু এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই, ক্রমাগত ধীরে ধীরে স্থান পরিবর্তন করে চলেছে। গত কয়েক হাজার বছরে চুম্বক-মেরু যে যথেষ্ট স্থান পরিবর্তন করেছে এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মনে কোনো সংশয় নেই। মেরুর এই স্থান পরিবর্তনের কারণ কী, তা-ও এখনও জানা যায়নি।

মেরুর আকাশ মাঝে মাঝে হঠাৎ উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। উত্তর মেরুতে একে 'অরোরা বোরিয়ালিস' এবং দক্ষিণ মেরুতে 'অরোরা অস্ট্রালিস' বলা হয়। কখনো এই মেরুজ্যোতির আবির্ভাবের ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বেতার যোগাযোগের বিঘ্ন ঘটে। মেরুজ্যোতি ছাড়াও সারা পৃথিবীতে রাত্রির আবহাওয়ায় এক রকম মৃদু বায়ুদীপ্তি (air glow) দেখতে পাওয়া যায়। এই মেরুজ্যোতি বা

banglainternet.com

বায়ুদীপ্তির সঠিক কারণ বিজ্ঞানীদের এখনো জানা নেই। তবে তাঁদের অনুমান, বাইরের শূন্যমণ্ডল থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে শক্তিশালী বিদ্যুৎকণিকার ব্যাপক আবির্ভাব ঘটলে সেগুলো পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের আকর্ষণে দুই মেরুতে সঞ্চিত হয়। বায়ু-কণার ওপর এই সব বিদ্যুৎকণার আঘাতের ফলেই মেরুজ্যোতির উৎপত্তি। ভূতত্ত্ব-বর্ষে উত্তর মেরু-জ্যোতি এবং দক্ষিণ মেরুজ্যোতির আবির্ভাবকালের মধ্যে একটা সমন্বয় নির্ণয়ের চেষ্টা হবে।

সৌররশ্মি ও আবহাওয়ার রহস্য

আন্তর্জাতিক ভূতত্ত্ব বছরে বিজ্ঞানীদের সবচাইতে বেশি নজর পড়বে বোধ হয় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের দিকে। তার কারণ পৃথিবীর সব দেশে আবহাওয়ার রূপান্তর ঘটে এই বায়ুমণ্ডলের মধ্যে। আর বায়ুমণ্ডল হচ্ছে একটি অবিচ্ছিন্ন সত্তা, তাই পৃথিবীর কোনো দেশের আবহাওয়াকেই বিচ্ছিন্ন করে দেখবার উপায় নেই।

এই আবহাওয়ারও বেশির ভাগ পরিবর্তনের মূলে রয়েছে আবার সূর্যের প্রভাব। বিভিন্ন দেশের তাপের তারতম্য, দেশে দেশে ঋতুভেদে আবহাওয়ার পরিবর্তন—এক কথায় পারিপার্শ্বিক যেসব প্রাকৃতিক অবস্থা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে তার বহু কিছুর মূলেই রয়েছে সূর্য। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর চুম্বকশক্তি, মেরুজ্যোতি, দূরপাল্লার যোগাযোগ এ-সবের মধ্যেও রয়েছে সূর্যেরই আধিপত্য।

এগার বছর পর পর সূর্যের ওপর ঝড়ের প্রাচুর্য দেখা দেয়। তখন তার গায়ে ঝড়ের এলাকাগুলোতে কালো কালো দাগ ফুটে ওঠে। এক একটা প্রচণ্ড আক্ষেপে সৌরগ্যাসের স্ফীতি বিপুল বেগে কয়েক লক্ষ মাইল উঁচুতে লাফিয়ে ওঠে। আর তার ফলে পৃথিবীর ওপরেও অদৃশ্য শক্তিশালী রশ্মির আকস্মিক প্রচণ্ড বর্ষণ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগে বিঘ্ন দেখা দেয়, মেরুর আকাশে মেরুজ্যোতি ঝলকে ওঠে, পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটে, পৃথিবীর ওপর কসমিক রশ্মির আক্রমণও বেড়ে যায়।

অথচ এই সব ব্যাপারের সঠিক প্রকৃতি এখনো পুরোপুরি বোঝা যায় না। এ ধরনের ঘটনা ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে সারা পৃথিবীতে অসংখ্য নিরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এইসব কেন্দ্রের গবেষণা থেকে সৌর তৎপরতার সঙ্গে পৃথিবীর ঘটনাবলীর যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক নিরূপণের চেষ্টা চলবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে এক হাজারেরও বেশি আবহবিদ ভূতত্ত্ব-বর্ষের পর্যবেক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন। এতদিন পর্যন্ত আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য যন্ত্রপাতিসহ যেসব বেলুন ওড়ানো হত সেগুলো ১০ মাইল পর্যন্ত ওপরে উঠত—এবার এমন বেলুন তৈরি হয়েছে যা' হাওয়ার ২০ মাইল ওপরে

উঠতে পারে। সাধারণ আবহাওয়া বেলুন এর চেয়ে বেশি ওপরে ওঠানো যায় না। তবে রকেটে চাপিয়ে আর এক ধরনের বেলুন পাঠানো হবে যেগুলো উঠবে ৬০ মাইল পর্যন্ত।

আবহাওয়ার এই সব পরীক্ষার উদ্দেশ্যটা কী?—বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন সারা বছরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বায়ুপ্রবাহের ফলে যে পরিমাণ শক্তির সৃষ্টি হয় তা ৭০ লক্ষ আণবিক বোমার বিস্ফোরণের সমান। আবহবিদ বিজ্ঞানীদের চেষ্টা হবে এই প্রচণ্ড শক্তিধর বায়ুমণ্ডলের নিয়মকানুনকে বুঝবার চেষ্টা করা। তাঁদের এইসব গবেষণার ফলে হয়তো আবহাওয়ার দূরপাল্লার পরিবর্তন সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

মহাশূন্যের খবর

পৃথিবীর ওপরকার বায়ুমণ্ডলকে মোটামুটি চারটে স্তরে ভাগ করা যায়। ১. সমুদ্র সমতল থেকে আট-দশ মাইল উঁচু পর্যন্ত ঘন বায়ুর স্তর বা ট্রপোস্ফিয়ার। ২. তারপর ৫০ মাইল পর্যন্ত হালকা বায়ুর স্তর বা স্ট্রাটোস্ফিয়ার। ৩. ৫০ মাইল থেকে ২৫০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত কয়েকটি বৈদ্যুতিক স্তর যাদের এক সঙ্গে করে বলা হয় আয়োনোস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডল। ৪. তার বাইরে একটি বহু দূর বিস্তৃত বহিঃস্তর বা এক্সোস্ফিয়ার।

এদের মধ্যে নানা কারণে আয়নমণ্ডলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আয়নমণ্ডল যেন পৃথিবীর চারপাশে একটি বৈদ্যুতিক আবেশের পরদা। হ্রস্ব তরঙ্গের ঢেউ-এর গায়ে ধাক্কা খেয়ে পৃথিবীর বুকে আবার ফিরে আসে বলেই পৃথিবীর এ-মাথা থেকে ও-মাথায় বেতার সংবাদ আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, সূর্য থেকে অদৃশ্য শক্তিশালী রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাত করার ফলেই আয়নমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। আর তাই সৌরস্ফীতির সময় যখন সূর্য থেকে আকস্মিক প্রবল রশ্মি বিচ্ছুরণ ঘটে তখন আয়নমণ্ডলেও গুরুতর বিপর্যয় দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ওপর দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগ দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু সত্যি সত্যি কি সূর্যের রশ্মি থেকেই আয়নমণ্ডলের সৃষ্টি? যদি তাই হবে তা' হলে শীতকালে যখন কয়েক মাস ধরে দক্ষিণ মেরুতে মোটেই সূর্যের আলো পড়ে না, তখন সেখানকার আকাশে আয়নমণ্ডলের সৃষ্টি হয় কী করে? তাহলে কী কী কারণে এবং কী কী অবস্থায় আয়নমণ্ডলের সৃষ্টি হয় তা কি এখনো পুরোপুরি জানা যায়নি?

এ-ব্যাপারে অবশ্য একটা গুরুতর রকমের অসুবিধেও আছে। যে সব হ্রস্ব তরঙ্গরশ্মির আঘাতে বায়ুমণ্ডলের ৫০ থেকে ২৫০ মাইলের মধ্যে বিদ্যুতের

banglainternet.com

আবেশ ঘটে তার প্রায় কিছুই বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আমাদের কাছে পর্যন্ত এসে পৌঁছায় না। কাজেই ভূমির ওপর থেকে পরীক্ষা করে এদের প্রকৃতি সম্পর্কে জানবার কোনো নির্ভরযোগ্য উপায় নেই। এদের প্রকৃতি বুঝতে হলে পরীক্ষার যন্ত্রপাতি পাঠাতে হবে আকাশের অনেক ওপরে।

তাই এবার দুনিয়ার নানা জায়গা থেকে রকেটে করে যন্ত্রপাতি পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে অনেক উঁচু আকাশে। শুধু এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই প্রায় ৬০০টি রকেট ছোঁড়া হবে—তার কোনো কোনোটি উঠবে ২০০ মাইল পর্যন্ত। আর এক একটা রকেট যন্ত্রপাতি বইতে পারবে প্রায় এক মণ ওজনের। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র থেকেও এমনি রকেট ছোঁড়া হবে ১২৫টি।

এমনি আরেক রহস্য গত পঞ্চাশ বছর ধরে বিজ্ঞানীদের বিব্রত করে রেখেছে। সে হচ্ছে কসমিক রশ্মির রহস্য। এটা জানা গেছে যে, দিন-রাত পৃথিবীর চতুর্দিকে বর্ষিত হচ্ছে অজস্র শক্তিশালী মহাজাগতিক কণিকা—মানুষের পরমাণু চূর্ণকরা যন্ত্রে তৈরি যে-কোনো কণিকার শক্তিকে হার মানায় এর তেজ। কিন্তু কোথা থেকে এদের উৎপত্তি তার পুরো রহস্য আজো আমাদের অজানা। সৌরস্ফীতির সময় কসমিক রশ্মির বর্ষণ আশ্চর্যরকমভাবে বেড়ে ওঠে, তাতে মনে হয় এদের অন্তত একটা অংশের উৎপত্তি সূর্য থেকে, বাকি অংশের উৎপত্তি মহাশূন্যের আর কোথাও হওয়া বিচিত্র নয়। কাজেই শূন্য আকাশের পরীক্ষা থেকে কসমিক রশ্মির রহস্যের খানিকটা হদিস পাওয়া যেতে পারে।

এই সব গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ভূতত্ত্ব-বর্ষের সবচাইতে রোমাঞ্চকর দিক বোধ হয় পৃথিবীর বাইরে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো। এই বছরের শেষ দিকে বা সামনের বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১২টি এবং সোভিয়েত রাশিয়া থেকে ১২টি গোলক শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া হবে। আশা করা যাচ্ছে, সেগুলো পৃথিবী থেকে এত দূরে ঠেলে দেওয়া যাবে যাতে তারা সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর ওপরে হুমড়ি খেয়ে না পড়ে কয়েকদিন ধরে পৃথিবীর চারপাশে চাঁদের মতো ঘুরপাক খাবে। গোলকে নানা রকম জটিল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বসানো থাকবে। এইসব যন্ত্র তাদের বিভিন্ন অবস্থানে তাপ, বায়ুর ঘনত্ব, পৃথিবীর আকর্ষণ, কসমিক রশ্মির প্রকৃতি, সূর্যরশ্মির প্রকৃতি ইত্যাদি বহু বিষয়ে তথ্য আহরণ করে বেতার যোগে পৃথিবীতে পাঠাবে।

গোলকগুলো আকারে হবে খুবই ছোট—মাত্র ২০ ইঞ্চি ব্যাসের, যন্ত্রপাতিসহ ওজন হবে প্রায় ১১ সের (সোভিয়েত গোলকগুলো ৫০ সের পর্যন্ত হতে পারে)। তিনটে রকেট এক সঙ্গে জুড়ে এদের শূন্যে ছোঁড়া হবে। প্রথম ধাপে উঠবে এরা ৩৬ মাইল, দ্বিতীয় ধাপে ১৪০ মাইল, তৃতীয় ধাপে ২৫০ থেকে ৩০০ মাইল। উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারপাশে ঘোরবার সময় পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এলে

এদের দূরত্ব ১০০ থেকে ৩০০ মাইল, দূরে সরে গেলে, দূরত্ব হবে ৮০০ থেকে ১৫০০ মাইল। এত দূরে থেকে এদের খালি চোখে দেখতে পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবে বাইনোকুলার বা টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে পাওয়া যাবে। এছাড়া তখন এদের বেগ থাকবে ঘণ্টায় প্রায় ১৮০০০ মাইল, অর্থাৎ সেকেন্ডে ৫ মাইল। এই বেগে ৯০ মিনিটে এরা একবার পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে আসতে পারে, অর্থাৎ দিনে ১৬ বার পৃথিবীকে পাক দেওয়া হয়ে যাবে। শূন্যলোকের এ সব ব্যাপক পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা অনেক নতুন রহস্যই হয়তো উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন।

তাই বলে বিজ্ঞানীরা শুধু আকাশের দিকেই তাকিয়ে নেই, স্থল ও সমুদ্রের দিকেও তাঁদের সমান দৃষ্টি রয়েছে।

পৃথিবীর ভেতরকার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে অনেক রহস্যই আজও বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা। তাই হঠাৎ কোথায় নতুন স্তরবিপর্যয় ঘটে ভূমিকম্প দেখা দেবে সে সম্পর্কে তাঁরা প্রায় কিছুই বলতে পারেন না। ভূমিকম্পের ঢেউয়ের চলাচল থেকে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরের প্রকৃতি জানা যায়। ভূতত্ত্ব-বর্ষে বিজ্ঞানীরা শুধু প্রাকৃতিক ভূমিকম্পের জন্য অপেক্ষা করে না থেকে মাটির নিচে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছোট ছোট কৃত্রিম ভূমিকম্প সৃষ্টি করে তাঁদের পরীক্ষার কাজ চালাবেন। এ জন্য প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে ২০টি নতুন ভূকম্প-গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

তেমনি, পৃথিবীর শতকরা ৭১ ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে যে সমুদ্র তার শুধু পরিতল সম্বন্ধেই বিজ্ঞানীদের জানা আছে। গভীর সমুদ্রের বিভিন্ন স্রোতের কথা আজও বিশেষ কিছু জানা নেই। অথচ গভীর সমুদ্রের এইসব জলস্রোতের সঙ্গে পৃথিবীর আবহাওয়ার একটা নিকট-সম্পর্ক রয়েছে। এ সমুদ্রে মাছের পরিমাণও নির্ভর করে অনেকটা গভীর সমুদ্রের প্রকৃতির ওপরে। সেই জন্য এদিকেও বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করেছেন।

এক কথায়, আধুনিক সভ্যতার সকল সম্পদ এবং সকল শাস্ত্র নিয়ে বিজ্ঞানীরা আজ স্থলে জলে শূন্যে আমাদের পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির রহস্য উদ্ধারের এক বিপুল অভিযানে আত্মনিয়োগ করেছেন। সমগ্র মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের এত বড় অভিযান আর কখনো পরিচালিত হয়নি। বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলে এই ১৮ মাসে যে পরিমাণ গবেষণার কাজ চালানো হবে সাধারণ অবস্থায় তা করতে ২০ বছর সময় লাগত। আর এই আয়োজনে খরচ পড়বে অন্তত ২৫০ কোটি টাকা।

কিন্তু এই সব গবেষণার ফলে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষের যে জ্ঞানের ভাণ্ডার সঞ্চিত হবে তার তুলনায় এই ব্যয়ের অঙ্ক অতি তুচ্ছ। এই

banglainternet.com

বিশ্বজনীন অধিকার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হবার মাত্র অল্পদিনের মধ্যেই ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ তারিখে গৃহীত হয় মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা। এই ঘোষণায় মানুষের আরো নানা মৌলিক অধিকারের মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা, নারী-পুরুষ বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে বুনিয়াদি শিক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই ঘোষণার ২৬নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

১. প্রতিটি মানুষের শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। অন্তত প্রাথমিক ও বুনিয়াদি স্তরে শিক্ষা হবে অবৈতনিক। প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক।

২. শিক্ষার লক্ষ্য হবে মানবিক গুণাবলি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করা এবং মানবাধিকার ও মৌল স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সুদৃঢ় করে তোলা।

৩. সন্তানকে কী ধরনের শিক্ষা দেয়া হবে তা বেছে নেবার অধিকার পিতামাতার থাকবে।

এরপর জাতিসংঘ ২০ নভেম্বর ১৯৫৯ সালে গ্রহণ করে শিশু অধিকারের ঘোষণা। এই ঘোষণাতেও সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ২০ নভেম্বর ১৯৮৯ তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত শিশু অধিকারের সনদে। এই সনদ ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে সারা পৃথিবীতে কার্যকর হয়েছে। এই সনদে শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ২৮) :

১. অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ প্রতিটি শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকার স্বীকার করছে এবং সমঅধিকারের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে এই অধিকার কার্যকর করার জন্য তারা (ক) প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং সবার জন্য বিনা বেতনে লভ্য করবে:

২. অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা শিশুদের মানবিক মর্যাদা বজায় রেখে কার্যকর করা হয় ;

৩. অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ সারা পৃথিবী থেকে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূর করার জন্য এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞানের বিস্তার ও উন্নত শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রসারিত করবে। এক্ষেত্রে বিকাশশীল দেশগুলির প্রয়োজনের দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি দেয়া হবে।

বলাই বাহুল্য যে, জাতিসংঘ এবং বিশেষ করে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) বিগত কয়েক দশক ধরে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং সাক্ষরতা বিস্তারের ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কী ও কেন?

শিক্ষা যে প্রতিটি মানুষের একটি জন্মগত অধিকার এ ধারণা আজ সারা বিশ্বে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের একটি পার্থক্য এই যে, অন্য প্রাণীরা তাদের চরিত্রগত গুণাগুণ মূলত জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সহজাতভাবে অর্জন করে কিন্তু মানুষ তার মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে তার চারপাশের পরিবেশ ও সমাজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। এককালে এই শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়া ছিল প্রধানত অনানুষ্ঠানিক, কিন্তু মানবসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় গুণাবলি এবং অর্জনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার জটিলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার ফলে ক্রমে ক্রমে উদ্ভব ঘটেছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার। আজ দেখা যাচ্ছে যেসব দেশে শিক্ষার মান সবচেয়ে নিচে সেসব দেশেই জনগণের জীবনযাত্রার মানও সবচেয়ে নিচে। এ সত্য আজ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, জনগণের দারিদ্র্য দূর করে নিম্নতম জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে হলে সব মানুষকে সাক্ষরতা ও মৌলিক শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ছাড়া এটা সম্ভব নয়।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বলতে স্বভাবতই বোঝায় যে, তা দেশের প্রতিটি ছেলেমেয়ের জন্য প্রযোজ্য হবে। আজকের জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে প্রতিটি মানুষ যদি একটি নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন না করে তাহলে সমগ্র সমাজের অগ্রগতিই ব্যাহত হয়। এই বুনিয়াদি শিক্ষা বলতে সচরাচর ধরা হয় কিছু মৌলিক ভাষাজ্ঞান এবং গণিত সাক্ষরতা। ভাষাজ্ঞানের মধ্যে পড়ে নিজের মাতৃভাষায় পড়তে পারা, লিখতে পারা এবং নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারা। দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবপত্র রাখার দক্ষতা পড়ে গণিত সাক্ষরতার মধ্যে। কিন্তু এসবের সঙ্গে যোগ করতে হবে নিজের পরিবেশকে জানা, বোঝা এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারার দক্ষতা, চিন্তাশক্তির বিকাশ, দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সে সবের সমাধানের কৌশল, নৈতিকতার বোধ এবং মানবিক গুণাবলি অর্জন। এ সবই একজন শিশুকে বাস্তব জীবনের মুখোমুখি হতে অথবা উচ্চতর শিক্ষা বা কারিগরি দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

প্রাথমিক শিক্ষার কালপরিধি নিয়ে নানা দেশে বেশ কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। সাধারণত অধিকাংশ দেশে ছ'বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষার শুরু ধরা হয় এবং

banglainternet.com

ব্যাপক আয়োজন থেকে কী ধরনের ফলাফল আশা করা যেতে পারে? কোনো একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে তাঁর নবতম আবিষ্কারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এ ধরনের প্রশ্ন করা হলে তিনি তার জবাবে বলেছেন, একটি নবজাত শিশুর কাছে লোকে কী প্রত্যাশা করে? সীমাহীন সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে তার ভবিষ্যতের গর্ভে।

সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের মধ্যে আজ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার যে শুভ পদক্ষেপ ঘটলো তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যেতে পারে।

(১৩৬৪/১৯৫৭)

[উৎস : *বিজ্ঞান ও মানুষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫]

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এত জরুরি কেন

জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে আজ প্রায় সাড়ে পাঁচশ কোটি মানুষের মধ্যে পনের বছরের বেশি বয়সীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি, তার মধ্যে প্রায় একশ কোটিই আজও নিরক্ষর। এই নিরক্ষরদের মধ্যে আবার অর্ধেকের বাস বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশে। পৃথিবীতে নিরক্ষরদের সংখ্যায় যেমন তারতম্য রয়েছে দেশে দেশে, তেমনি তারতম্য রয়েছে নারী-পুরুষভেদে। গড়পড়তা হিসেবে পুরুষদের মধ্যে যেখানে প্রতি পাঁচজনে একজন নিরক্ষর, সেখানে মেয়েদের মধ্যে নিরক্ষর তিনজনে একজন।

দুনিয়া জুড়ে এমনি ব্যাপক নিরক্ষরতার মুখে জাতিসংঘ ১৯৯০ সালকে ঘোষণা করেছিল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ বলে। এ বছরই মার্চ মাসে জাতিসংঘের উদ্যোগে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়েছে দু'হাজার সালের মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে সকলের জন্য শিক্ষা প্রবর্তনের সংকল্প।

সমস্যাটা যে অতি জরুরি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ওপর শিক্ষার রয়েছে ব্যাপক প্রভাব। অথচ আজ সারা পৃথিবীতে বিপুল সংখ্যক মানুষ নিরক্ষর আর শিক্ষাবঞ্চিত থাকার ফলে অনেক দেশেই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়ে উঠছে দুঃসাধ্য।

বিশ শতকের শেষে মানুষ আজ সভ্যতা এবং জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে বিপুলভাবে এগিয়েছে। কিন্তু আজকের এই পৃথিবীতেও অন্তত একশ কোটি লোক রয়েছে দারিদ্রসীমার নিচে, দেড়শ কোটি লোক আজও প্রায় কোনো রকম চিকিৎসার সুযোগ পায় না, একশ কোটির বেশি লোক বাস করে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে। তার চেয়েও বড় কথা হল যে-সব লোক নিরক্ষর, শিক্ষাহীন তারাই দেখা যায় সবচেয়ে গরিব, সবচেয়ে বেশি দুর্গতির শিকার। অশিক্ষা যেন হাত-ধরাধরি করে চলে অপুষ্টি, অস্বাস্থ্য আর দুঃখদুর্দশার সঙ্গে।

banglainternet.com

দেশভেদে সচরাচর পাঁচ থেকে আট বছর পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। আমাদের দেশে পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর, তবে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৯৭৪ সালের কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন থেকে ১৯৮৮ সালের মফিজউদ্দীন আহমদ শিক্ষা কমিশন পর্যন্ত এ দেশের সকল বিশেষজ্ঞ দলই পর্যায়ক্রমে আট বছর মেয়াদী সর্বজনীন, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন। জাতিসংঘের উদ্যোগে 'সবার জন্য শিক্ষা' এই মূলমন্ত্র নিয়ে ৫-৯ মার্চ ১৯৯০ থাইল্যান্ডে যে আন্তর্জাতিক উচ্চপর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে সারা পৃথিবীতে ২০০০ সালের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সব ছেলেমেয়ের অন্তত ৮০ শতাংশকে সর্বজনীন বুনিয়াদি শিক্ষার আওতায় আনবার সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব সম্পর্কে আজ যে বিশ্বজনীন চেতনা গড়ে উঠেছে তার প্রতিফলন দেখি ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানেও। এই সংবিধানের ১৭নং ধারায় বলা হয়েছে একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গৃহীত হবে এবং সে শিক্ষাকে 'সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ' করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সংবিধানের প্রণেতাদের নির্দেশ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে দীর্ঘকাল ধরে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের সদিচ্ছা ব্যক্ত হলেও এযাবৎ এক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি লাভ হয়নি।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা আজ আর শুধু একটি স্লোগান মাত্র নয়, এর সঙ্গে জড়িত আমাদের সমগ্র আর্থসামাজিক বিকাশ, এমনকি আমাদের বেঁচে থাকার প্রশ্ন। সকল বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে দেশে দ্রুত এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে এ দেশের দুর্গতি বাড়তেই থাকবে।

[উৎস : *শিক্ষা ও বিজ্ঞান : নতুন দিগন্ত*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯]

জীবাণু ও মানুষ

সবাই জানে, জীবাণু থেকে রোগ হয়। কিন্তু তাই বলে বছরের কোনো বিশেষ সময়ে যদি দেশের নানা জায়গায় কলেরা-বসন্তের মহামারী দেখা দেয়, গাঁয়ের পর গাঁ মড়ক লেগে উজাড় হতে থাকে, তাহলে তার জন্য জীবাণুর ওপর দোষ চাপানোটা কোনো কাজের কথা নয়। দোষ যদি কাউকে দিতে হয়, তবে সে দিতে হবে আমাদের নিজেদেরই; আমাদেরই অজ্ঞতা, মূঢ়তা, শোচনীয় দারিদ্র্য, সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে নির্বিকার ঔদাসীন্য—আর এসবের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা দায়ী, তাদের সবাইকে।

মহামারীকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে মানুষেরই হাতের মুঠোয়—উন্নত, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাত্রা, ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার আর রোগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থার মধ্যে। মানুষ দেখিয়েছে, বিজ্ঞানের হাতিয়ার নিয়ে ব্যাধিকে জয় করা সম্ভব—মহামারীর হাত থেকে বাঁচার জন্য 'ওলা বিবি' আর 'শীতলা দেবী'র পায়ে মাথা কোটা নিতান্ত আহাম্মকি ছাড়া আর কী!

অথচ এই সহজ কথাটা শিখতে মানুষের অনেক সময় লেগেছে।

মানুষের ইতিহাস শুরু হবার পর থেকে দুনিয়াতে মারী আর মড়ক এসেছে কতবার, তার কোনো লেখাজোখা নেই। কালোমৃত্যু আর ধ্বংসের বিভীষিকা পায়ে পায়ে নিয়ে মারী আর মড়কের আবির্ভাব ঘটেছে বারে বারে—অনিবার্য নিয়তির মতো। আর তারপর বছরের পর বছর ধরে চলেছে তার তাণ্ডব নৃত্য—দেশের পর দেশ ছারখার করে দিয়েছে। অসহায় মানুষ নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে তার পায়ে—দেবতার অভিশাপ বলে ধিক্কার দিয়েছে নিজের ভাগ্যকে। কখনো-বা বাঁচার অনিবার্য তাগিদে দল বেঁধে পালিয়েছে দেশ ছেড়ে। কিন্তু তাতে সমস্যার কোনো সুরাহা হয়নি, বরং রোগের বীজ ছড়িয়ে পড়েছে আরো দেশ-দেশান্তরে।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে সভ্যতার সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছে মানুষ—বিকাশ ঘটেছে জ্ঞানবিজ্ঞানের। আর এই জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোক দেখিয়ে দিয়েছে মারী-মড়ক নিতান্ত আকাশচারী দেবতাদের খেয়ালখুশির ব্যাপার নয়; পৃথিবীর বুকে রয়েছে তার বীজ—আর পৃথিবীর বুকেই লুকিয়ে আছে তার

banglainternet.com

উচ্ছেদেরও মন্ত্র। বিজ্ঞানের আলোক হটিয়ে দিয়েছে অজ্ঞানতা আর কুসংস্কারের অন্ধকারকে।

মারী আর মড়ককে মানুষ জয় করেছে।

মহামারীর রাজা হল প্লেগ— এর মতো ভয়াবহ ব্যাধি আর বড় একটা নেই। সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাসে সারা ইউরোপ জুড়ে প্লেগ বিভীষিকা বিস্তার করেছে— যুদ্ধবিগ্রহে যত লোক মারা গিয়েছে, প্লেগের আক্রমণে মারা গিয়েছে তার চাইতে বেশি। এশিয়া থেকে বাণিজ্যপথ ধরে ধরে এই মড়ক গিয়েছে এশিয়া মাইনরে, বলকানে, উত্তর আফ্রিকায়। এর হাত থেকে রেহাই পাবার কোনো উপায় ছিল না। —'কভিনোস' নামে একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন :

> 'প্রচণ্ড গরম বা দুরন্ত শীত এই ভয়ঙ্কর রোগকে কাবু করতে পারে না। এই মড়ক পাহাড়ে লাফিয়ে ওঠে, দ্বীপে, উপত্যকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে— জলা-জংগল-সমুদ্র কিছুই একে ঠেকাতে পারে না। নর-নারী-শিশু-বৃদ্ধ-কুলপতি নির্বিশেষে সবাইকে এই কালো মৃত্যুর পায়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে লোকে হয়তো ভাবছে, দানবটা এবার দূর হয়েছে, এমনি সময় হঠাৎ অতর্কিতে মৃত্যু তার কালো হাত তুলে ধরবে; প্রথমে হয়তো দূরে, তারপর মুহূর্তে ঠিক তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে মৃত্যু হা-হা করে হাসছে তার অপরাজেয় বিকট, বীভৎস হাসি।'

১৬৬৫ সালে লন্ডন শহর প্লেগের আক্রমণে প্রায় জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল— সতেরো শতকের আগে তার প্রকোপ কমেনি। ১৮৫১ সালের পর ইউরোপে আর তেমন বড় রকমের প্লেগের খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু তার পরেও মিশর, আফ্রিকা, মেসোপোটেমিয়া, ভারত ও দক্ষিণ চীনে এর প্রচণ্ড তাণ্ডব অব্যাহত থেকেছে। ১৮৯৪ সালে জাপানি চিকিৎসক কিতাসাতো এবং তার ফরাসি সহযোগী ইয়েরসিন প্রথম প্লেগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। ১৮৯৬-৯৭ সালে ভারত আর চীনে ব্যাপক মহামারী দেখা দেবার পর ভেনিসে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসে। সেখানে আন্তর্জাতিকভাবে প্লেগ প্রতিরোধ করার জন্য কতকগুলো সমষ্টিগত প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্লেগের টিকাসহ অন্যান্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা এবং উন্নত স্বাস্থ্যবিধির সাহায্যে এই রোগের আক্রমণ আজ সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু প্লেগ তো শুধু একটি মাত্র। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে যে-সব আধি-ব্যাধি যুগে যুগে মানুষের ওপর ধ্বংস আর মড়কের বিভীষিকা বয়ে এনেছে,

তাদের মধ্যে রয়েছে কুষ্ঠ, টাইফয়েড, কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, আমাশয়, পীতজ্বর, যক্ষ্মা—তা'ছাড়া আরো যে কত অগুনতি ব্যাধি, তার হিসেব নিয়ে শেষ করা যাবে না।

বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে পরাধীনতার জোয়ালে আবদ্ধ অনগ্রসর, ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক যে সব দেশ, সেখানেই যেন এই সব ব্যাধি দল বেঁধে তাদের মৌরসী আসন গেড়ে বসেছে। যুগ-যুগান্তরের শোষণে, অত্যাচারে, আধিতে-ব্যাধিতে জর্জর এই সব দেশের মানুষের প্রথম ওষুধ হচ্ছে তাদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা—স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলার অধিকার; জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও শিক্ষার মান বাড়ানো, যাতে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি এবং রোগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা যায়।

এই সব রোগের মধ্যে একমাত্র কুষ্ঠ ছাড়া আর সবগুলোর সঠিক চিকিৎসা-পদ্ধতি আজ আবিস্কৃত হয়েছে। দুনিয়ার বুক থেকে চিরদিনের মতো এদের উচ্ছেদ করার বাস্তব সম্ভাবনা আজ দেখা দিয়েছে।

অবশ্য, এক দিনেই মানুষ আজকের এই অবস্থায় এসে পৌঁছতে পারেনি। তার জন্য যুগ যুগ ধরে ব্যাধির বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে হয়েছে, শত শত বিজ্ঞানকর্মী এই সংগ্রামে তাঁদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। অবশেষে অনেক সাধনার ভেতর দিয়ে, অসংখ্য আত্মত্যাগের বিনিময়ে বিজ্ঞান জয়লাভ করতে পেরেছে— মড়ক, মহামারীকে চিরদিনের জন্যে দুনিয়ার বুক থেকে নির্বাসিত করার পথ মানুষ আবিষ্কার করেছে।

আজ থেকে প্রায় তিন শো বছর আগের কথা।

হল্যান্ডের ছোট পরীক্ষাগারে বসে দিনের পর দিন তাঁর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের জন্য কাচ ঘষে ঘষে উন্নত ধরনের লেন্স তৈরি করছেন বিজ্ঞানী লেভনহুক। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বৃষ্টির পানিতে তিনি আবিষ্কার করলেন রোগের জীবাণু। বিজ্ঞান প্রমাণ করল, এই সব ক্ষুদে ক্ষুদে বিশেষ ধরনের জীবগুলোই রয়েছে অধিকাংশ রোগের মূলে। আগুনের তাপ দিয়ে জীবাণুকে ধ্বংস করার কায়দাও লেভনহুক বের করলেন।

এই ঐতিহাসিক আবিষ্কারের মর্যাদা লেভনহুক পেয়েছিলেন। সে সময়ের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী নিউটন এবং রসায়নবিজ্ঞানী রবার্ট বয়েলের মতো তিনি যে শুধু লন্ডনের 'রয়াল সোসাইটি'র সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাই নয়, রাশিয়ার জার পিটার দি গ্রেট এবং ইংলন্ডের রাণী পর্যন্ত এই বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে গিয়েছিলেন হল্যান্ডের ছোট শহর ডেল্‌ফটে।

banglainternet.com

তার পরে মানবতার সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসাবিদদের এক বিরাট বিচিত্র বাহিনী জীবাণুতত্ত্বের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইতালীর স্কালানজিনি, ফরাসি পাস্তুর, জার্মান কখ ও এরলিখ, রাশিয়ার মেশনিকফ, ইংরেজ ব্রুস, রোনাল্ড রস ও ব্যাটিস্টা গ্রাসি, আমেরিকান ওয়াল্টার রিড। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই সব শ্রেষ্ঠ সন্তান সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন—কোনো সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে নয়—মানুষের চিরশত্রু যক্ষ্মা, জলাতংক, কলেরা, সিফিলিস, ডিপথিরিয়া, ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর, ঘুম রোগ, সব রকম আধি-ব্যাধি মড়ক-বিভীষিকার বিরুদ্ধে। তাঁদের এই গৌরবময় সংগ্রামে অবশেষে তাঁরা জয়মাল্য পেয়েছেন।

অবশ্যই, মৃত্যুর বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে নিরবচ্ছিন্ন সাফল্য লাভ তাঁদের ভাগ্যে ঘটেনি; পদে পদে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি তাঁদের পথকে কণ্টকিত করেছে, কখনো হয়তো সাময়িকভাবে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। কিন্তু তাতে তাঁদের কৃতিত্ব নিষ্প্রভ হওয়া দূরে থাক বরং এই ত্যাগ ও পরাজয়ের মধ্য দিয়েই তাঁদের সংগ্রামী মহত্ত্ব আরও উজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

মানুষের মৃত্যু ও রোগযন্ত্রণার ভার লাঘব করার জন্য এই বীর সংগ্রামীদের অনেকে নিজেদের দেহে রোগ-জীবাণু ঢুকিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন—স্বেচ্ছায় তাঁদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই সব আত্মত্যাগী বীর শহীদদের নাম ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় হয়ে থাকবে। ইতিহাস ভুলতে পারবে না ইংরেজ জন হান্টারের কথা, যিনি ১৭৭৬ সালে নিজের শরীরে সিফিলিসের জীবাণু ঢুকিয়ে এই পরীক্ষায় প্রাণ দিয়েছিলেন।—অ্যালান ম্যাকফ্যাডেনের কথা, যিনি ১৯০৭ সালে লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেছিলেন মাল্টা জ্বর নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে।—বোহেমিয়ান অধ্যাপক এডমন্ড উইলের কথা, যিনি পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন টাইফয়েড জ্বর নিয়ে।—ভুলবে না ওবারমেয়ারকে, যিনি মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে প্রাণ দিয়েছিলেন কলেরা প্রতিরোধ করতে গিয়ে।—ফরাসি থুইলেকে যিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন মিশরে কলেরা মহামারীতে। এবং জার্মান কখকে, যিনি এই সব আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষকে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন কলেরার প্রতিষেধক।

কলেরা নিয়ে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে একে একে নিজেদের শরীরে কলেরার জীবাণু প্রবেশ করিয়েছিলেন মিউনিকের অধ্যাপক পেরেনহোফার, এমেরিখ মেশ্‌নিকফ। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই তাঁরা অন্যকারো দেহে জীবাণু প্রয়োগ করেননি।

প্লেগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনেকেই তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন : মার্সেই-এর চিকিৎসক লুই গাঁয়ো, ভিয়েনার ম্যুলার, পর্তুগালের গামারা পেস্তানা, সেজার

জনচেসেল।—আফ্রিকার অরণ্যে ঘুম রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জীবন দিয়েছেন হ্যালাম এবং ম্যানসন।—কিউবায় স্বেচ্ছায় পীতজ্বরের বাহক মশার কামড় খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন জেমস ক্যারল, ইয়ং এবং জাপানি চিকিৎসক নোগুচি।—হাওয়ার্ড টেলর রিকেটস এবং পোল্যান্ডের স্টানিসলাউ প্রাওয়াজেক টাইফাস রোগের জীবাণু আবিষ্কার করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। মানবতার প্রতি তাঁদের অপরিসীম দান স্মরণ করে এই জীবাণুর নামকরণ করা হয়েছে রিকেটসিয়া প্রাওয়াজেকি।

এই সব বীর এবং শহীদদের নামের তালিকা লিখে শেষ করা যাবে না। নতুন যুগের শিশুদের অকালমৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করার জন্য, আগামী দিনের মানুষের সুখী ভবিষ্যতের জন্য এই সব বিজ্ঞানী তাঁদের নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

মারী, মৃত্যু এবং ব্যাধির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস এমনি অসংখ্য আত্মত্যাগ এবং সাহসের কাহিনীতে উজ্জ্বল। সারা জীবন হয়তো আর্থিক বা নৈতিক সাহায্য কিছুই জোটেনি। তবু এই সব বিজ্ঞানী অপরিসীম অধ্যবসায়ের সংগে তাঁদের গবেষণা চালিয়ে গিয়েছেন। মানুষ জাতির প্রতি, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ মানুষের জীবনের প্রতি গভীরতম দায়িত্ববোধ থেকেই তাঁরা তাঁদের আত্মত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

জীবাণু-বিজ্ঞানীদের অগ্রণী লুই পাস্তুরের সেই অমর আশা এবং ভবিষ্যদ্বাণী অনির্বাণ আলোকশিখার মতো তাঁদের প্রেরণা দিয়েছে : 'এমন একদিন আসবে যেদিন সহজ প্রতিষেধক ব্যবস্থার সাহায্যে এই সব মারী-মড়ককে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।—হ্যাঁ, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, দুনিয়ার বুক থেকে সমস্ত রকম জীবাণুবাহী ব্যাধিকে নির্মূল করা সম্ভব।...'

ব্যাধি এবং জীবাণুর বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম আজও চলছে।...

আমাদের চারপাশ ঘিরে সর্বত্র থই থই করছে অসংখ্য জীবাণু। কিন্তু তার সবই তো মানুষের শত্রু নয়। মানুষের, পশু-পাখির, গাছ-পালার ব্যাধি ঘটায় কয়েক জাতের জীবাণু মাত্র। তাছাড়া আরো অজস্র জাতের জীবাণু রয়েছে, যেগুলো আমাদের বন্ধু। এই সব উপকারী জীবাণুর সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আমাদের জীবন বাঁধা রয়েছে যে, এদের ছাড়া দুনিয়ার মানুষের বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ত।

তাই মানুষ জীবাণুতত্ত্বের চর্চা করেছে শুধু রোগ-সৃষ্টিকারী জীবাণুদের পরাজিত করার জন্যই নয়, উপকারী জীবাণুদের আয়ত্ত করে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্যও। কৃষিক্ষেত্রে, মদ চোলাই ও পাউরুটি সেঁকার কাজে, অ্যালকোহল,

banglainternet.com

ভিনিগার, সজীর চাটনি তৈরিতে, ওষুধ এবং রাসায়নিক শিল্পে মানুষ অহরহ উপকারী জীবাণুদের কাজে লাগাচ্ছে। জীবাণু-বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে মারাত্মক রোগ ঘটায় যে জীবাণু, তার সাহায্যেই বিজ্ঞানী-মানুষ রোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার করেছে।

এইভাবে সমস্ত রকম ক্ষতিকর জীবাণুকেই কি মানুষের প্রয়োজন মতো পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন ধরনের জীবাণুতে পরিণত করা এবং তাকে রোগ প্রতিরোধে এবং মানব-কল্যাণের অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় না?

দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের এক অংশ আজ এই পথেই তাঁদের জীবাণু গবেষণার ধারাকে পরিচালিত করছেন। শুধু তাই নয়, এই প্রগতিশীল বিজ্ঞানীরা জীবাণুতত্ত্বকে এক সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপরেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

জীবাণুদের বেশির ভাগই এক-কোষী জীব ছাড়া আর কিছুই নয়। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা জীব-বিজ্ঞানের মিচুরিন-পন্থী গবেষণার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন, জীবজগতের অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের মতোই জীবাণুদের বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়ে কৃত্রিম উপায়ে রূপান্তর সাধন করা যায়। এইভাবে পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলে জীবাণুর যে রূপান্তর ঘটে, তার ফলে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুকে রোগ-নিরাময়কারী জীবাণুতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। আর এই আবিষ্কারের ফলে জীবাণু-বিজ্ঞানের সামনে সংক্রামক ব্যাধি ও মহামারীর আশঙ্কাকে নির্মূল করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জীবাণুর মধ্যে 'অযৌন সংকর' ঘটিয়েও তাদের স্বভাব বদলাবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এমনকি এক জীবাণু থেকে নিঃসৃত প্রোটিন-রসের সাহায্যে অন্য জীবাণু চাষ করেও তার জাতি পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে।

এই সব বিজ্ঞানী রঞ্জনরশ্মি, অতিবেগুনি আলো, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বা বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের অস্বাভাবিক উপায়ে জীবাণুর বিকৃত রূপান্তর ঘটাবার ঘোরতর বিরোধী। কেননা, এ ধরনের অস্বাভাবিক বিকৃতির ফল কল্যাণপ্রসূ না হয়ে ক্ষতিকর হবার সম্ভাবনাই বেশি।

মানুষের কল্যাণের স্বার্থে ক্ষতিকর জীবাণুকে যাতে স্থায়ীভাবে রূপান্তরিত করা যায় এবং এইভাবে জীবাণুজগতের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ব্যাধি, যন্ত্রণা, মারী, মড়ক এবং অকালমৃত্যুকে চিরদিনের জন্যে দুনিয়া থেকে নির্বাসিত করা যায়—সেই লক্ষ্যেই এই সব জীবাণুবিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণাকে নিয়োজিত করেছেন।

দুনিয়ার আরো এক অংশে আজ জীবাণু নিয়ে গবেষণা চলছে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানীরা মারী-মড়ক-ব্যাধির কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য জীবাণুর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালিয়েছেন, আজ যার নতুন বিকাশের সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—জীবাণু-বিজ্ঞানের সে-ধারার সঙ্গে এই গবেষণার কোনো মিল নেই। এই গবেষণার লক্ষ্য জীবাণুকে ধ্বংস করা নয়, মানুষের কল্যাণের কাজে ব্যবহার করাও নয়—তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য জীবাণুকে শক্তিশালী করে তুলে মানুষের ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ করা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই জাপানে, ইংলন্ডে, কানাডায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একদল বিজ্ঞানী সরকারী উদ্যোগে ব্যাপক ধ্বংস-বিস্তার করার জন্য জীবাণুর চাষ করছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাম্প ডেট্রিকের জীবাণু-যুদ্ধ গবেষণা সম্পর্কে ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত সরকারী মার্ক (G.W.Merck) কমিটির রিপোর্টে বলা হয় : 'এই গবেষণায় এ পর্যন্ত ৫ কোটি ডলার খরচ হয়েছে ... একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, জীবাণু-যুদ্ধ অত্যন্ত সুলভ হবে।" এই রিপোর্টে অনেক গোপন তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়ায় এবং তীব্র জনমত সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় মার্ক কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

১৯৪৯ সালে একজন মার্কিন সাংবাদিক এই গবেষণা সম্পর্কে লিখেছিলেন :

> "এখানে আজ আর পাস্তুরের মতো জীবাণুর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয় না। ক্যাম্প ডেট্রিকের এই জীবাণু গবেষণাকেন্দ্রে বিখ্যাত ডাক্তার রোজবেরির তত্ত্বাবধানে চার হাজার নারী-পুরুষ বিজ্ঞানকর্মী—যাঁদের 'আমেরিকার বীর বাহিনী' আখ্যা দেওয়া হয়েছে—পরম যত্নের সঙ্গে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি করেন।—পাস্তুর বা ওয়াল্টার রিড যদি আজ কবরের ভেতর থেকে এই গবেষণার কথা শুনতে পেতেন তা'হলে তাঁরা যে গভীর আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁরা কি কখনো ভাবতে পেরেছিলেন যে, জীবাণু ধ্বংস করার জন্য নয়, রোগ নিরাময়ের জন্য নয়, মানুষ জীবাণুর চাষ করছে অতি শক্তিশালী প্রতিকূল পরিবেশ সহ্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন জীবাণু সৃষ্টি করার জন্য। অথচ সেই পরীক্ষাই মানুষ আজ শুরু করেছে—চেষ্টা করছে রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে দেবার এমন সব সহজ উপায় উদ্ভাবন করার, যাতে নারী-বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে সবচাইতে বেশি সংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঘটে।"

গত মহাযুদ্ধের সময় জাপানিরা মাঞ্চুরিয়ায় চীনা ও সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীদের ওপর জীবাণু-যুদ্ধের পরীক্ষা চালিয়েছিল। খাবারোভস্ক যুদ্ধাপরাধী বিচার মামলায়

banglainternet.com

(১৯৫০) এই সব বীভৎস পরীক্ষার কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এই সময় আরও প্রকাশিত হয় যে, ইশিশিরো প্রভৃতি জাপানি জীবাণু-যুদ্ধ পরিকল্পনার নেতারা মার্কিন সহযোগিতায় অক্ষত দেহে দণ্ডাজ্ঞা থেকে মুক্তি পেয়েছে। জাপানি এবং জার্মান জীবাণুবিশারদদের পরে মার্কিন যুদ্ধ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন মার্কিন পত্রিকাতেই স্বীকার করা হয়েছে যে, ১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে যুদ্ধবন্দীদের জীবাণু যুদ্ধের পরীক্ষায় কাজে লাগানো হচ্ছে।

হিটলার যা কখনো সাহস করেননি, ১৯৫২ সালে ট্রুম্যান এবং রিজওয়ে তা করেছেন। কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে নানা অস্ত্রে নানা পদ্ধতিতে সুপরিকল্পিত উপায়ে নিরীহ বেসামরিক অধিবাসীদের ওপর হত্যার তাণ্ডবলীলা চলেছে; কিন্তু ১৯৫২ সালের গোড়ার দিকে কোরিয়ায় জীবাণুঅস্ত্র প্রয়োগ আগের সমস্ত বর্বরতার ভয়াবহতাকেও ছাপিয়ে উঠেছে।

বোমায় পুরে জীবাণু-মাখানো পোকামাকড়, পশুপক্ষী, খাবার, লতাপাতা ইত্যাদি ফেলে মার্কিন সমরনেতারা কৃত্রিম উপায়ে প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড, পীতজ্বর, টাইফাস, আমাশয়, মেনিনজাইটিস প্রভৃতির ব্যাপক মড়ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন—আবার ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন মধ্যযুগের সেই মহামারীর তাণ্ডব আর বিভীষিকাকে।

১৯৫২ সালের ২৮শে জানুয়ারি উত্তর কোরিয়ার 'ইঞ্চন' শহরের কাছাকাছি দেখা গেল মার্কিন উড়োজাহাজ উড়ে যাবার ঠিক পরপরই মাছি, পোকা এবং মাকড়সা উড়ে বেড়াচ্ছে। বছরের এ সময়টাতে কোরিয়ার প্রচণ্ড শীতে শূন্যের বহু ডিগ্রি নিচে তাপমাত্রা নেমে যায়; এ অবস্থায় এ সব পোকামাকড় কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া, কতকগুলো পোকামাকড় এই অঞ্চলে একেবারেই অপরিচিত। পরীক্ষা করে দেখা গেল, এসব সন্দেহজনক পোকামাকড়ের গায়ে লাগানো আছে মারাত্মক সব রোগের বীজাণু। যে টাইফাসকে প্রতিরোধ করার জন্য রিকেট্‌স এবং প্রাওয়াজেক তাঁদের জীবন দিয়েছিলেন, তার জীবাণুও এদের মধ্যে ছিল।

তারপরে গত দেড় বছরের মধ্যে উত্তর কোরিয়ার ওপর আরও অসংখ্যবার জীবাণু বোমা ফেলা হয়েছে। শুধু উত্তর কোরিয়ায় জীবাণু ছড়িয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি, উত্তর চীনের বিভিন্ন অংশেও বারে বারে জীবাণবিক আক্রমণ চালিয়েছে। উত্তর কোরিয়ায় গত পাঁচশো বছরের মধ্যে কোনো দিন প্লেগ দেখা দেয়নি—সেখানে তারা প্লেগের বীজ ছড়িয়েছে। যে প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড, পীতজ্বরের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য অগণিত বিজ্ঞানী তাঁদের অমূল্য

জীবন দান করেছেন, সেই সব ব্যাধিকেই ব্যাপকভাবে বিস্তার করার এই বীভৎস প্রচেষ্টার মধ্যে ফুটে উঠেছে ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস!

মার্কিন সমরনেতারা তাঁদের এই জঘন্য অপরাধ ঢাকবার জন্য জীবাণু অস্ত্র প্রয়োগ করার অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করতে চেয়েছেন। জীবাণু গবেষণার প্রসঙ্গে তাঁরা বার বার ঘোষণা করেছেন, এ নিছক আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু অসতর্ক মুহূর্তে সরকারী কর্তাদের মুখ থেকেই মাঝে মাঝে অনেক সত্য কথা বেরিয়ে এসেছে। এই সব সরকারী তথ্য বিশ্লেষণ করে সম্প্রতি দু'জন ইংরেজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী মার্কিন জীবাণু-যুদ্ধ গবেষণার আসল রহস্য ফাঁস করে দিয়েছেন (মডার্ন কোয়াটারলি : ১৯৫২-৫৩ শীতকালীন সংখ্যা)।

১৯২৫ সালে দুনিয়ার সমস্ত দেশের মধ্যে জীবাণবিক, বিষাক্ত গ্যাস বা রাসায়নিক যুদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণা করে যে আন্তর্জাতিক জেনেভা সনদ স্বাক্ষরিত হয়, একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাকে এখনো স্বীকার করে নেননি। তাই 'মার্ক'-রিপোর্ট প্রকাশিত হবার অল্পদিন পরে মার্কিন রাসায়নিক যুদ্ধবিভাগের প্রধান কর্মকর্তা জেনারেল অ্যালডেন ওয়েট জীবাণু-যুদ্ধ সম্পর্কে বলতে পারেন :

> "বাস্তবতার দিক থেকে এই ধরনের যুদ্ধবিদ্যার সামনে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। আণবিক যুদ্ধকে স্বীকার করে নেওয়া অথচ সেই সঙ্গে জীবাণু ও গ্যাস-যুদ্ধের বীভৎসতার কথা বলা শুধু অর্থহীন নয়, রীতিমত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কোনো যুদ্ধাস্ত্র মানবিক কি অমানবিক এ প্রশ্ন যারা তোলে তাদের প্রতি আমার কণামাত্র সহানুভূতি নেই।"—('কোলিয়ার্স', ১৫ জুন, ১৯৪৬)।
>
> আর তাই যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে নৈতিকতার প্রশ্ন যে অবান্তর, সেটা প্রমাণ করার জন্য একজন অধ্যাপক বলতে পারেন, "নৈতিকতার প্রশ্নের এক কথায় মীমাংসা করা যায়। যখন স্থির করা হয়েছে যে, মানুষকে হত্যা করতে হবে, তখন তার সঙ্গে সঙ্গেই নৈতিকতার প্রশ্নেরও অবসান ঘটেছে। মানবতা বা নৈতিকতার চিন্তা মারণাস্ত্রের ওপর বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।"- ('সায়েন্টিফিক আমেরিকান', মার্চ, ১৯৫০)।

উত্তর কোরীয় এবং চীনাদের হাতে বন্দী উচ্চপদস্থ মার্কিন সামরিক অফিসার এবং বৈমানিকদের মধ্যে যাঁরা জীবাণু-যুদ্ধ পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় জীবাণু-যুদ্ধের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁরা প্রকাশ করেছেন, বেসামরিক জনসাধারণের ওপর ব্যাপক জীবাণু আক্রমণের প্রস্তুতি

banglainternet.com

হিসেবে ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাস থেকেই উত্তর কোরিয়ার ওপরে অল্পস্বল্প পরিমাণে জীবাণু ছড়ানো হতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তা বৃদ্ধি পায়। তাঁরা এ-ও বলেছেন যে, উচ্চ সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নিজেদের বিবেকের বিরুদ্ধেই তাঁরা এইসব মানবতা-বিরোধী ভয়াবহ জীবাণু-অস্ত্র প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পিকিং-এ অসংখ্য প্রামাণ্য নজির সংগ্রহ করে জীবাণু-যুদ্ধ সম্পর্কে প্রদর্শনী খোলা হয়েছে—দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার দায়িত্বশীল নরনারী এই প্রদর্শনী পরীক্ষা করে জীবাণু-যুদ্ধের সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। চতুর্দিক থেকে ক্রমেই অসংখ্য যুক্তি-প্রমাণ জড়ো হচ্ছে—মার্কিন শাসকদের পক্ষে জীবাণু-যুদ্ধের অভিযোগকে উড়িয়ে দেবার আজ আর কোনো উপায় নেই।

কতখানি নৈতিক অধঃপতন ঘটলে মানুষ এমনি আত্মঘাতী বর্বরতা এবং বেসামরিক জনসাধারণের বিরুদ্ধে নিয়োজিত এই সর্বাত্মক যুদ্ধ পরিকল্পনার আশ্রয় নিতে পারে, সেকথা ভেবে সারা দুনিয়ার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সৎ এবং শান্তিকামী মানুষ আজ শিউরে উঠছেন। সমগ্র মানবসভ্যতার সামনে আজ এক মারাত্মক বিপদসংকেত দেখা দিয়েছে। মানুষের জীবনে সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা শুধু নয়—সমস্ত বিজ্ঞানের উজ্জ্বল ঐতিহ্য, সভ্যতার ভবিষ্যৎ, এবং মানুষের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন হয়ে উঠেছে। একদল যুদ্ধলিপ্সু, নরঘাতকের হিসেব আজ শুধু হত্যার সংখ্যা আর ডলার ব্যয়ের অঙ্ক নিয়ে। "সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার করার ফল হবে আণবিক বোমার চেয়েও উল্লেখযোগ্য—অন্তত হত্যার সংখ্যার দিক দিয়ে।"—(থর্ন টন পেজের রিপোর্ট, মে, ১৯৪৮)।

দীর্ঘদিন ধরে জীবাণু-যুদ্ধের গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার পর ডাক্তার থিওডোর রোজবেরি এই নৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি হন। বিবেকের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত তিনি জীবাণু গবেষণার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছেন। এই বিভীষিকার হাত থেকে মুক্তির পথ সন্ধান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি শুরু হয়, তাহলে জীববিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিজ্ঞানী, পদার্থ-বিজ্ঞানী—সমস্ত শ্রেণীর বিজ্ঞানীকে মানবতার অকল্পনীয় ধ্বংস সাধনের কাজে নিয়োজিত করা হবে। তাঁদের পক্ষে এই কাজে সহযোগিতা করা এবং একই সঙ্গে বিজ্ঞানী হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব কিনা, আমি জানি না—হয়তো এই প্রশ্নের কোনো বিচ্ছিন্ন উত্তর নেই—এর একটাই মাত্র সামগ্রিক উত্তর হতে পারে, তা হল : শান্তি রক্ষিত হোক।"
(পীস আর পেস্টিলেন্স : ম্যাকগ্র হিল : ১৯৪৮)।

কোরিয়া এবং চীনে জীবাণু-যুদ্ধের সত্যতা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি এবং ব্রাজিলের শ্রেষ্ঠতম জীবাণু-বিজ্ঞানীদের নিয়ে যে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কমিশন গঠন করা হয়েছিল, তাঁরা বিজ্ঞানীর নিরাসক্ত মন নিয়ে দীর্ঘদিন পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালাবার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন :

> "কোরিয়া এবং চীনের জনসাধারণের ওপর মার্কিন সামরিক বিভাগ জীবাণু-অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।... অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের সামনে কমিশনের সদস্যরা নিতান্ত অনিচ্ছা এবং দুঃখের সঙ্গেই এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হয়েছেন; কেননা, এই অমানুষিক বর্বরতার বিরুদ্ধে দুনিয়ার সর্বজনীন জনমত সত্ত্বেও যে এই অপরাধ অনুষ্ঠিত হতে পারে, এ কথা তাঁরা সহজে বিশ্বাস করতে পারেননি।.."

এই বলে তাঁরা তাঁদের রিপোর্ট শেষ করেছেন : "...যুদ্ধকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে মানুষের ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত করার জন্য দুনিয়ার জনসাধারণের শান্তিরক্ষার উদ্যমকে আজ দ্বিগুণিত করা প্রয়োজন।"

শান্তি রক্ষিত হোক। এ কামনা শুধু আজ ডাক্তার রোজবেরি বা আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কমিশনের নয়, এ দাবি আজ দুনিয়ার মানুষ-সাধারণের। দুনিয়া-জোড়া মানুষের আজ ঐকান্তিক কামনা : যুদ্ধবাজদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাক, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক।

দুনিয়ার জনসাধারণ যদি তাঁদের নিজেদের কাঁধে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব নেন, তা'হলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। কেননা, হাজার হাজার বছরের অক্লান্ত সাধনায় অপরিসীম ত্যাগ আর বীরত্বের বিনিময়ে মানুষের যে সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তার ধ্বংস নেই, মানুষের সেবার আদর্শে কখ, পাস্তুর, ওয়াল্টার রিডের মতো বিজ্ঞানীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত যে বিজ্ঞানের ঐতিহ্য, তারও মৃত্যু নেই।

(১৩৬০/১৯৫৩)

[উৎস : *বিজ্ঞান ও মানুষ*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৭৫]

banglainternet.com

বিজ্ঞান ও শিশু-সাহিত্য

আমাদের শিশু-সাহিত্যের ইতিহাস তেমন দীর্ঘ নয়। 'বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জনক' যাঁকে বলা হয় সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) থেকে শুরু করলে সে ইতিহাস মাত্র শ'দেড়েক বছরের হবে। অবশ্য আজকের শিশু-মনস্তত্ত্বের বিচারে বিদ্যাসাগরের 'কথামালা' (১৮৫৬), 'আখ্যানমঞ্জরী' (১৮৬৩) ইত্যাদি রচনাকে শিশু-সাহিত্যের আদর্শ বলে গণ্য করা যাবে কিনা বলা শক্ত। তার পরের স্তরে শিশু-সাহিত্যের অঙ্গনে দক্ষিণারঞ্জন, উপেন্দ্রকিশোর, অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, নজরুল প্রমুখ দেখা দেন বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে। তখন থেকে ধরলে আমাদের শিশু-সাহিত্যের বয়স হয়ে দাঁড়ায় ওপরের হিসেবের অর্ধেক—মাত্র সাত-আট দশকের মতো। কিন্তু তবু এই অল্পকালের মধ্যে শিশু-সাহিত্যের মোটামুটি একটি স্পষ্ট রূপ আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে।

সে হিসেবে এই ভূখণ্ডে বিজ্ঞানের আবির্ভাব যেমন ঘটেছে অনেক দেরিতে, তেমনি তার অবয়ব বা চরিত্রও এদেশে আজো তেমন স্পষ্ট নয়। আধুনিক পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের উদ্ভাবিত নানা যান্ত্রিক উপকরণ এদেশে প্রচলিত হতে আরম্ভ করেছিল উনিশ শতকেই। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষীণ উদ্যোগ আরম্ভ হয় বিশ শতকের প্রথম ভাগে, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে মূলত এই শতকের ষাটের দশকের শুরুতে। শিশু-সাহিত্য এ দেশের শিশুকিশোরদের বিদ্যালয়-বহির্ভূত সাংস্কৃতিক কর্মের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল ইংরেজ আমলের শেষ ভাগেই, সেভাবে বিজ্ঞান-চর্চার সূত্রপাত প্রধানত বাংলাদেশের উদ্ভবের পর—সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে। এই সময়েই প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে উন্মুখ তরুণ বিজ্ঞানকর্মীরা দেশের নানা প্রান্তে বিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়ের বাইরে অসংখ্য বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তুলতে আরম্ভ করে।

বিদ্যাসাগরের সময় থেকে গত দেড়শ বছরে শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অনেক দূর এগিয়েছে। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে যেমন, তেমনি এ ক্ষেত্রেও আমরা পশ্চিমের পণ্ডিতদের কাছে প্রচুর পরিমাণে ঋণী। শিশুর জগৎকে যুক্তি দিয়ে বোঝার এবং তার জীবনকে হৃদয় দিয়ে গড়ে তোলার যে আন্দোলন আঠার শতকের শেষে ইউরোপে শুরু হয়েছিল, ফ্রান্সের বিপ্লবী শিক্ষাবিদ জাঁ জাক রুশো

(১৭১২-৭৮)-কে তার অগ্রপথিক বলা যেতে পারে। তারপর সুইজারল্যান্ডে পেস্তালৎসি (১৭৪৬-১৮২৭), জার্মানিতে ফ্রোয়বেল (১৭৮২-১৮৫২), ইতালিতে মন্তেসরি (১৮৭০-১৯৫২) প্রমুখ শিক্ষাবিদ এ বিষয়ে আমাদের ধারণাকে অনেকখানি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। শিশু যে শুধু বড়দের ছোট সংস্করণ নয়, তারও রয়েছে পৃথক একটি মনোজগৎ, পৃথক ব্যক্তিসত্তা, তার বৃদ্ধি আর বিকাশের রয়েছে নিজস্ব প্রকৃতি ও চাহিদা এবং তার শিক্ষার পদ্ধতিতে এই পৃথক সত্তার চরিত্রটি বিশেষভাবে মনে রেখে এগোনো একান্ত জরুরি—এসব কথা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে এঁরা তুলে ধরেছেন।

আমাদের শিশু-সাহিত্যের অঙ্গনে বিদ্যাসাগরের নীতিমূলক রচনার প্রায় একচ্ছত্র প্রভাব চলেছে বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত। আধুনিক মনস্তত্ত্ব-নির্ভর শিশুশিক্ষার কথা জোরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথই প্রথম বললেন। শিশুকে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে হবে আগামী দিনের জন্য। সেজন্য একই সঙ্গে তার চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি এই দুইয়েরই পুষ্টির প্রয়োজন; আর সে পুষ্টির এক আবশ্যকীয় উপাদান হল শিশুর জন্য চিন্তার স্বাধীনতা, ভাবের স্বাধীনতা এবং ইচ্ছার স্বাধীনতা। এসব ধারণাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন এবং নিজে শিশুদের জন্য বই লিখতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল এসব ধারণা শিশু-সাহিত্যের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিশ শতকের শুরুতে দেখা দিল বাংলা শিশু-সাহিত্যের এক আশ্চর্য সতেজ রূপ।

শিশুদের প্রাণ-কেড়ে-নেয়া অতি সহজ ভাষায় কল্পনার পাখা মেলবার আর অপরূপ ছন্দের দোলায় নেচে ওঠার মতো উপাদেয় রচনা নিয়ে এলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (ঠাকুর মা'র ঝুলি, ১৯০৬; ঠাকুরদাদার ঝুলি, ১৯০৮) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (টুনটুনির বই, ১৯১০), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (শিশু, ১৯০৩; শিশু ভোলানাথ, ১৯২২), সুকুমার রায় (আবোল তাবোল, ১৯২৩) আর কাজী নজরুল ইসলাম (ঝিঙেফুল, ১৯২৬)। তারও কিছু পরে এল বিচিত্র কত সব অ্যাডভেঞ্চার আর গল্পের বই। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গায়ে-কাঁটা-দেয়া রোমাঞ্চকাহিনী থেকে আজকের সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত যে ধারা তা বিষয়বৈচিত্র্যে তেমন সমৃদ্ধ না হলেও ছোটদের মন জয় করার মতো শক্তিমান সৃষ্টিকর্মে উজ্জ্বল। আমাদের দেশে বন্দে আলী মিয়া, জসিম উদ্‌দীন, আহসান হাবীব, হাবীবুর রহমান, মোহাম্মদ নাসির আলী, শামসুর রাহমান, রোকনুজ্জামান খান, আতোয়ার রহমান, ফয়েজ আহমদ, এখলাসউদ্দীন আহমদ, সাজেদুল করিম—এমনি সব উজ্জ্বল নাম আলোকিত করে আছে শিশু-সাহিত্যের অঙ্গনকে।

দেশে সারা বছরে ছোটদের উপযোগী বই কতগুলি বেরোয়, তার মধ্যে কটি সত্যিকারভাবে ছোটদের পাতে দেবার যোগ্য, সে সবের ছাপা ও চিত্রসজ্জা যথেষ্ট

banglainternet.com

আকর্ষণীয় বা আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে তুলনাযোগ্য কিনা, দেশব্যাপী বই-এর বিতরণ বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কোন পর্যায়ে এ সব প্রশ্ন এখানে না-ই বা তোলা গেল। সাধারণভাবে বলা যায় আমাদের শিশু-সাহিত্যের অঙ্গনে প্রধান স্থান জুড়ে আছে গল্প, ছড়া, রূপকথা, রহস্য-রোমাঞ্চ, জীবনী প্রভৃতি বই। এসব বই ছাপা যেমন বেশি হয়, তেমনি বিক্রিও বেশি হয়। ১৯৭৫ সালে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পক্ষ থেকে ঢাকা শহরের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাঠপ্রবণতা নিয়ে একটি জরিপ চালানো হয়েছিল, তাতে দেখা যায় ছেলেদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় হল ছোটগল্প ও উপন্যাস, তারপর যথাক্রমে রূপকথা-উপকথা এবং গোয়েন্দা কাহিনী। মেয়েদেরও সবচেয়ে প্রিয় ছোটগল্প ও উপন্যাস, তারপর যথাক্রমে গোয়েন্দা কাহিনী এবং রূপকথা-উপকথা। মেয়েদের বেলায় তারপরই আসে বিজ্ঞান-বিষয়ক বই এবং কবিতা ও ছড়া। ছেলেরাও বিজ্ঞান-বিষয়ক বই পড়ে, তবে তার চেয়ে বেশি পড়ে ভূতের গল্প ও হাসির গল্প, কবিতা, ছড়া আর জীবনীগ্রন্থ। (বই, জুলাই-আগস্ট ১৯৭৬)।

আগেই বলা হয়েছে, এ দেশে বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটেছে দেরিতে, শিশু-কিশোরদের জীবনে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দেখা দিয়েছে আরো সাম্প্রতিককালে; সে পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের জরিপে পাওয়া এই তথ্য মোটেই অপ্রত্যাশিত মনে হয় না। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে আধুনিক বিজ্ঞানের নানা উপচার মানুষের জীবনে ব্যাপক ছাপ ফেলতে থাকে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই। আশপাশের সব লোককে দারুণ চমকে দিয়ে বিলেতে ঝকঝক করে প্রথম রেলগাড়ি চলতে শুরু করে ১৮২৫ সালে। উৎপাদনের প্রাচুর্য সৃষ্টি করে বাষ্পচালিত নানা রকম কল-কারখানা। উনিশ শতকের শেষে বিজলি-বাতি আলোকিত করে তুলতে থাকে শহর-গ্রামকে; বিদ্যুতের সাথে সাথে টেলিগ্রাম আর টেলিফোনের আবিষ্কার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আনে যুগান্তর। এই সময়েই মোটরগাড়ি ছুটতে শুরু করে দূর-দূরান্তের পথে। বেতার আর বিমান জীবনযাত্রার বেগকে বাড়িয়ে তোলে বহুগুণে। মানুষের জীবনে বিজ্ঞানের এই সুদূরপ্রসারী প্রভাবের ছাপ পড়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমেও। ভাষা, ধর্মতত্ত্ব, গণিত আর ইতিহাসের পাশাপাশি বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি স্থান করে নিতে থাকে বিদ্যালয়ের অবশ্যপাঠ্য বিষয় হিসাবে। আর তাতে জ্ঞানসাধনার ফল হিসেবে পাওয়া বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির নতুন শক্তিকে দৈনন্দিন জীবনের কাজে লাগানো যেমন সহজ হয়ে উঠে তেমনি সহজ হয় নতুন জ্ঞানের উদ্ভবও।

পশ্চিমে বিজ্ঞানের জগতে এই যে আলোড়ন তার ঢেউ উনিশ শতকেই এসে পৌঁছেছিল আমাদের দেশেও। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিজ্ঞান ছাড়া গতি নেই এ কথা বুঝতে এদেশের পুরোগামী সংস্কৃতিনায়কদের বেগ পেতে হয়নি। আর তাই দেখি সেকালের সেরা সাময়িকপত্র 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদক

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) ১৮৫১ ও ১৮৫৩ সালে দুখণ্ডে প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞান-বিষয়ক বই 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'; তাঁর তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'চারুপাঠ' গ্রন্থেও (১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৯) রয়েছে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রাচুর্য। বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেই তাতে লিখতে শুরু করেছেন বিজ্ঞান-বিষয়ক নানা প্রবন্ধ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৭১), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) প্রমুখ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা সঞ্চারের জন্য কলম তুলে নিয়েছেন হাতে। জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩) বিশেষ করে ছোটদের জন্য লিখেছেন গ্রহ-নক্ষত্র (১৯১৫), পোকা-মাকড় (১৯১৯), বিজ্ঞানের গল্প (১৯২০), গাছপালা (১৯২১), বাংলার পাখী (১৯২৪), নক্ষত্র-চেনা (১৯৩১) ইত্যাদি অসংখ্য বিজ্ঞান-বিষয়ক বই।

উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের শুরুতে এদেশে অন্তত অগ্রসর শিক্ষিত সমাজে বিজ্ঞান সম্পর্কে যে সচেতনতার প্রকাশ দেখা দেয়, বাংলাদেশে তার কতখানি আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি তা বলা শক্ত। সম্ভবত খুব সামান্যই। আজ থেকে একশ বছরেরও বেশি আগে বঙ্কিমচন্দ্র জোরের সঙ্গে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার কথা বলেছিলেন। ১৮৮২ সালে তিনি বঙ্গদর্শনে লিখেছিলেন :

> 'যদি দেশটিকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে ফলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাঙালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। দুই চারিজন ইংরেজীতে বিজ্ঞান শিখিয়া কি করিবেন?
>
> ...তাহাতে সমাজের ধাত ফিরিবে কেন? সামাজিক আবহাওয়া কেমন করিয়া বদলাইবে? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে।'...

এই লক্ষ্য বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব সত্ত্বেও আজো এদেশে কার্যক্ষেত্রে অতি আংশিকভাবে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এই শতকের শুরুতে প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিজ্ঞানী বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে যে নিষ্ঠা, সৃজনশীলতা ও স্বদেশ-হিতৈষণার পরিচয় দিয়েছিলেন তা আমাদের সমাজে আজও তেমন ব্যাপ্তি লাভ করেছে বলা যায় না।

বিজ্ঞানের উপকরণ এদেশে আসা অবশ্য থেমে থাকেনি। এসেছে স্বাচ্ছন্দ্যের, আনন্দের, বিলাসের নানা উপাদান চালু রাখার প্রযুক্তি। কিন্তু বিজ্ঞান-চর্চা যে শুধু বিদেশী কৌশল নয়, আসলে তা মূলত অনুসন্ধান ও উদ্ভাবনার বস্তু—এই বোধটি মোটেই বিস্তার লাভ করেনি। তাই আমরা সেই যে ভিক্ষার পাত্র মেলে রেখেছি বিদেশীদের কাছে জ্ঞানের জন্য আর স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণের জন্য, অথচ তার বিনিময়ে বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে দিতে পেরেছি সামান্যই, আর সেই সাথে এ

banglainternet.com

দেশের সাধারণ মানুষের জীবনেও দিতে পারিনি তেমন কোনো পরিবর্তনের ছোঁয়া—এই অগৌরবের গ্লানি আমাদের সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

বলা বাহুল্য এই দারিদ্র্য আর পশ্চাৎপদতার ছাপ আমাদের শিশু-সাহিত্যেরও সর্বাঙ্গে ছড়ানো। উপেন্দ্রকিশোর (১৮৬৩-১৯১৫) নিজে বিজ্ঞানী না হয়েও উনিশ শতকের শেষে ছোটদের জন্য অজস্র লিখেছেন বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে। মুকুল পত্রিকায় প্রকাশিত 'সেকালের কথা' নামে তাঁর অনেকগুলি রচনা একত্র করে বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে, এই বইতে তাঁরই আঁকা এবং ব্লক তৈরি করা প্রাচীনকালের জীবজন্তুর ১৭টি অতি চমৎকার ছবি ছিল। 'সখা' ও 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'আকাশের কথা' শিরোনামে তাঁর বেশ ক'টি রচনা, 'বান ডাকা', 'দূরবীন' প্রভৃতি সুন্দর প্রবন্ধ।

উপেন্দ্রকিশোরের যোগ্য সন্তান সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) এই শতকের দ্বিতীয় দশকে 'সন্দেশ'-এর পাতায় 'সূক্ষ্ম হিসাব', 'শিকারী গাছ', 'কাগজ', 'রেলগাড়ির কথা', 'নীহারিকা', 'ক্লোরোফরম', 'মরুর দেশে', 'আশ্চর্য আলো' (রঞ্জন রশ্মি সম্পর্কে), 'প্রলয়ের ভয়', 'শেষ দশা', 'জল-স্তম্ভ', 'সূর্যের রাজ্য' ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেগুলো আজকের অনেক পত্রিকা সম্পাদককে লজ্জা দিতে পারে। সন্দেশ-এ প্রকাশিত তাঁর ৩৭টি রচনা একত্রিত করে 'জীবজন্তুর কথা' নামে যে বই প্রকাশিত হয় সেটিকে আজকের কোনো লেখকের রচনা বলে চালিয়ে দিলে তিনি অনায়াসে খ্যাতিমান হয়ে উঠতে পারতেন।

এমন তো নয় যে, উপেন্দ্রকিশোর বা সুকুমার রায় কেবল বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই ছোটদের জন্য লিখেছেন। উপেন্দ্রকিশোর লিখেছেন রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, পুরাণের কাহিনী, ছড়া-কবিতা-গান, গল্প ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে; বের করেছেন 'সন্দেশ' নামে অতি আকর্ষণীয় ছোটদের পত্রিকা। সুকুমার রায় শুধু যে আশ্চর্য রসের খনি 'আবোল তাবোল', 'হযবরল' আর 'অবাক জলপান' লিখেছিলেন তা নয়, লেখেন আরও অসংখ্য গল্প, কবিতা, নাটক; নিজে এঁকেছেন তাঁর রচনার জন্য বহু হাস্যরসাত্মক ছবি; অকালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 'সন্দেশ' সম্পাদনা করেছেন। বাংলা শিশু-সাহিত্যের এই স্বর্ণযুগের লেখকরা শিশু-কিশোরদের প্রতি এক গভীর মমত্ববোধ থেকে যেন তাদের ভাব, ভাষা আর জ্ঞানের অপরূপ আনন্দলোকে নিয়ে যাবার জন্যই কলম ধরেছিলেন। তাঁদের কাছে সেদিন শিশুর সামগ্রিক বিকাশের জন্য বিজ্ঞানের বিষয়গুলো একান্ত জরুরি মনে হয়েছিল; আর এসব বিষয়কে তাঁরা শুধু জ্ঞানের উপাদান হিসেবে দেখেননি, দেখেছেন শিশুদের আনন্দেরও উপকরণ হিসেবে।

১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোরের উদ্যোগে ও সম্পাদনায় 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রকাশ বাংলা শিশু-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তার অল্পকাল

পরই প্রকাশিত হয় আরো ক'টি উল্লেখযোগ্য শিশু-পত্রিকা : মৌচাক (১৯২০), রংমশাল (১৯২০), শিশুসাথী (১৯২২), শিশু-সওগাত (১৯৪৩) প্রভৃতি। 'সন্দেশ' প্রকাশের সময় থেকে আজ এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার অন্তত শতগুণে বেড়েছে। পেশাজীবী বিজ্ঞানীর সংখ্যা হয়েছে কয়েকশ গুণ বেশি। চল্লিশের দশকের শেষেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব বিষয় মিলিয়ে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র দু'হাজারের মতো। আজ প্রতি বছর বাংলাদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুধু বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদই পাশ করে বেরিয়ে আসছে তার চেয়ে অনেক বেশি। গত সাত-আট দশকে দুনিয়াজোড়া বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অগ্রগতি ঘটেছে বিপুল বেগে, তার ছোঁয়া নানাভাবে লেগেছে আমাদের জীবনেও। কিন্তু এদেশের শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেদিনের চেয়ে বিজ্ঞানের ভূমিকা আদৌ বেড়েছে কিনা এ প্রশ্ন আজ সঙ্গতভাবে করা যেতে পারে।

সন্দেহ নেই যে, শিশু-সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে শিশুকে আনন্দ দেয়া, তাকে তার সহজাত কল্পনার পাখা মেলতে সহায়তা করা। মনস্তত্ত্ববিদরা বিভিন্ন বয়সের শিশুর বিভিন্ন চাহিদার কথা উল্লেখ করে থাকেন। অতি ছোট শিশুও তার পরিবেশ সম্বন্ধে জানতে কৌতূহলী; অজস্র 'কি' আর 'কেন'-র প্রশ্নবাণে সে বিদ্ধ করে আশেপাশের পরিচিত জনকে। আগ বাড়িয়ে শিশু যে সবকিছু নেড়ে-চেড়ে দেখতে চায় বা মুখে পুরতে চায়—এ তার প্রশ্নশীলতার, অজানাকে জানবার আকাঙ্ক্ষার, পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবণতারই লক্ষণ। মানবশিশু পৃথিবীতে আসে এক জন্মগত সীমাহীন কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা সাথে করে—বলা চলে প্রতিটি শিশু জন্মায় কম-বেশি পরিমাণে বিজ্ঞানীর চরিত্র নিয়ে। নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর জিজ্ঞাসার নিবৃত্তিতেই পায় সে তৃপ্তি। চারপাশের বড়দের সমাজ এই কৌতূহলের নিবৃত্তিতে সহায়তা দিয়ে শিশুকে যুক্তিশীলতা আর বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পথে এগিয়ে দিতে পারে; আবার কখনো তার চতুর্দিকে অজস্র বাধানিষেধের দেয়াল তুলে তাকে অর্থহীন আবেগ আর অন্ধবিশ্বাসের পথেও ঠেলে দিতে পারে।

শিশুমাত্রই কল্পনার পাখা মেলতে চায়। সে তার আপন মনে কত কিছুর স্বপ্ন দেখে। বাস্তব জীবনের গণ্ডি অতিক্রম করে তার মন অতি সহজেই চলে যায় অবাস্তবের জগতে। শিশুর এই কল্পনাপ্রবণতাকে অবলম্বন করে সৎ শিশু-সাহিত্য তাকে এগিয়ে দিতে পারে সুস্থ পরিণতির দিকে, তাকে প্রস্তুত করতে পারে আগামী দিনের বিচিত্র, কঠোর বাস্তবতার জন্য। রূপকথার কাহিনীর মধ্য দিয়েও শিশু পরিচিত হতে পারে ভালো আর মন্দের সাথে, প্রকৃতিতে এবং মানুষের সমাজে যে নিরন্তর চলেছে নানা দ্বন্দ্ব—তার সাথে। শিশুর কল্পনার পাখা মেলবার জন্য বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কাহিনী হতে পারে এক শক্তিশালী উপকরণ।

banglainternet.com

আজকের দিনে বিজ্ঞানের দুঃসাহসিক অভিযাত্রার বিবরণ অনেক ক্ষেত্রেই রূপকথার কাহিনীকে হার মানাতে পারে।

পৃথিবীর নানা দেশে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী আজ এক শক্তিশালী সাহিত্যরূপের মর্যাদা পেতে আরম্ভ করেছে। জুল ভের্ন ও এইচ. জি. ওয়েল্‌স্-এর উত্তরসূরী আর্থার ক্লার্ক, আইজাক অ্যাসিমভ, রে ব্র্যাডবেরি, ইভান ইয়েফ্রেমভ, আলেকজান্ডার কাজান্তসেভ প্রমুখ লেখক বিজ্ঞানের অগ্রগতি আর বিশ্বের নতুন বাস্তবতার ছবি তুলে ধরেছেন তাঁদের গল্পে আর উপন্যাসে। এসব বিপুল জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। একই পথের পথিক সত্যজিৎ রায়ও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানের তথ্য ও বিশ্বদৃষ্টি শুধু যে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতেই স্থান পেতে পারে তা নয়, সাহিত্যের সকল শাখায় তার স্থান হওয়া সম্ভব—রবীন্দ্রনাথ তা দেখিয়েছেন।

আমাদের সমগ্র সাহিত্যে যেমন, তেমনি শিশু-সাহিত্যেও অন্ধ হৃদয়াবেগ, উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, অবাস্তব কল্পনা আর পলায়নপরতার প্রভাব যত বেশি, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, যুক্তিনিষ্ঠতা, প্রকৃতি ও সমাজের বাস্তবতার ছাপ সে পরিমাণে মোটেই সবল নয়। অথচ বিজ্ঞান যে শুধু বিদেশ থেকে আমদানীযোগ্য বিলাসের উপকরণ নয়, মানুষের চিত্ত বিকাশের এবং সংস্কৃতির অতি আবশ্যকীয় এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—এ বোধ সারা দেশময় ছড়িয়ে দেবার শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে শিশু-সাহিত্য।

শিশু-সাহিত্যের সীমানা কোন্ বয়স পর্যন্ত হবে এ প্রশ্ন উঠতে পারে। শিশু যখন থেকে পড়তে শুরু করে সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে মাধ্যমিক স্তরের অর্থাৎ ষোল বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের উপযোগী রচনাকেই শিশু-সাহিত্যের গণ্ডিতে ফেলা যেতে পারে। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা আবশ্যক।" ('বিশ্বপরিচয়', ভূমিকা)। এ প্রয়োজন যে শুধু বিজ্ঞানের জ্ঞানের জন্য তা নয়, তাদের মনন, হৃদয়ানুভূতি এবং কর্মকুশলতার ব্যাপ্তির জন্যও। শিশু-সাহিত্যে বিজ্ঞানের অংশ থাকা চাই শুধু তথ্য বিতরণের জন্য নয়; বিজ্ঞানের যে মর্মবাণী—অর্থাৎ অনুসন্ধানের ভেতর দিয়ে প্রকৃতির রহস্য ভেদ করা সম্ভব, এই রহস্য ভেদের জন্য এগোতে হবে নিরাবেগ বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে, আর সাদা-কালো নির্বিশেষে সকল মানুষ বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য দিয়ে নিজের জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে—তার উপলব্ধিও তুলে ধরা প্রয়োজন শিশুদের সামনে।

সব বয়সের শিশুর চাহিদা, বলা বাহুল্য, হুবহু এক নয়। চিত্তবিকাশেরও রয়েছে নানা পর্যায়। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রি: পূ:) সত্যসন্ধানের চারটি স্তরের কথা বলেছিলেন—এগুলো হল যথাক্রমে কল্পনা, বিশ্বাস, অনুসন্ধান ও সমাধান। ইংরেজ দার্শনিক

হোয়াইটহেড (১৮৬১-১৯৪৭) বুদ্ধিবিকাশের পর্যায়গুলোকে দেখেছেন রোমান্স, যথার্থতা এবং সাধারণীকরণের স্তর হিসেবে।—এমনি মনোগত স্তরবিভেদের সঙ্গে বিভিন্ন বয়সের শিশুর ভাষাগত পুঁজি এবং অভিজ্ঞতার তারতম্যের কথাটাও বিবেচনায় আনতে হবে। বিদেশে আজকাল অনেক ক্ষেত্রে কোন্ বই কোন বয়সের শিশুর উপযোগী তা বইয়ের গায়েই লেখা থাকে—সেটা অভিভাবকদের নিজ নিজ শিশুর উপযোগী বই বেছে নিতে সাহায্য করে। আমাদের দেশেও অন্তত মোটামুটি একটা বয়সের ধারণা বইয়ের সঙ্গে দেবার রেওয়াজ চালু করতে পারলে ভালো হত।

বিশ শতকের শেষে আজ আমরা বাস করছি পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবত সব চাইতে উদ্বেল, সবচাইতে রোমাঞ্চকর সময়ে। জ্ঞানের জগতেই শুধু যে বিপুল আলোড়ন ঘটছে তা নয়, সারা পৃথিবীতে মানুষের জীবনেও দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। আমাদের দেশের শিশু-কিশোররাও এই পরিবর্তনের প্রবাহের বাইরে নয়।

আজ প্রতিদিন বিপুল বিচিত্র জ্ঞানের উদ্ভব ঘটছে সারা পৃথিবী জুড়ে। এদেশেও বিজ্ঞানের নানা গবেষণাগারে নতুন জ্ঞানের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে আছেন শত শত বিজ্ঞানী আর গবেষক। সাম্প্রতিককালেই ভাষার জন্য আর স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন এদেশের তরুণরা। অপরূপ মাধুর্যময় ভাষায় আমাদের লেখক-কবিরা তৈরি করেছেন অজস্র গল্প, কবিতা, ছড়া। সমাজের নানা সমস্যার কথা আসছে সে সব রচনায়। আমাদের শিল্পীরা আঁকছেন আশ্চর্য সুন্দর সব ছবি। মুদ্রণ প্রযুক্তিতে বিপ্লব সাময়িক পত্রিকার পাতাতেও অতি মনোহর বহুবর্ণ ছবি ছাপা সম্ভব করে তুলেছে। কিন্তু আজকের দিনে পৃথিবীর বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রধান চালিকাশক্তি যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তা আমাদের শিশু-সাহিত্যের আসরে এখনো রয়েছে যেন দুয়োরানীর আসনে। বিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং পদ্ধতির সঙ্গে যদি আজই আমরা আমাদের আগামী দিনের নাগরিকদের পরিচিত করে না তুলি তাহলে পৃথিবীজোড়া মানুষের বিপুল বেগবান অগ্রযাত্রার ধারায় আমাদের কোথায় স্থান হবে তা ভাবা কষ্টকর।

বাংলাদেশের শিশুকিশোরদের মধ্যে মেধা বা সৃজনশীলতার কমতি রয়েছে এমন কথা কেউ বলবেন না। কাব্যে, শিল্পে, কারুকলায় আর ছন্দোময় নৃত্যে তাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু আমাদের সৃষ্টির উদ্যোগ এ যাবৎ প্রধানতই নিবদ্ধ থেকেছে পরিবেশ আর প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্যের অন্বেষায়; পরিবেশের চরিত্র-রহস্য উদ্‌ঘাটনে, তাকে বশ করার আয়োজনে আমাদের মেধা, শক্তি আর সম্পদকে আমরা কতখানি নিয়োজিত করতে পেরেছি? প্রকৃতির পায়ে নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণ বা তার রূপমুগ্ধ উপাসনা নয়—প্রকৃতির শক্তিকে জয় করে মানুষের বিজয়-কেতন তুলে ধরার যে

banglainternet.com

সাধনা আজকের মানবসভ্যতার মূল ধারা থেকে আমরা আজো রয়েছি অনেক পেছনে। এই সাধনার বীজ আজ ছড়াতে হবে সারা দেশের মানুষের মধ্যে; বিশেষ করে তার শক্ত শিকড় প্রোথিত করতে হবে আমাদের শিশু-সাহিত্যের সকল স্তরে; আর তার মাধ্যমেই সৃষ্টি করা সম্ভব হবে আগামী দিনের নতুন মানুষ এবং আমাদের কাঙ্ক্ষিত নতুন সমাজ।

সাহিত্যের লক্ষ্য যদি হয় মানুষের কল্যাণ, তাহলে শিশুদের কল্যাণই শিশু-সাহিত্যের প্রধান অভীষ্ট। এ যুগের মানবপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তি বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানচেতনা এই অভীষ্টকে আরো উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য আজ এ প্রয়োজন আরও বেশি করে জরুরি হয়ে উঠেছে এজন্য যে, এদেশে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মোটামুটি অর্ধেক; পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে এই হার সাধারণত এক চতুর্থাংশের বেশি নয়। তাছাড়া এদেশ আজ শুধু অর্থনৈতিক বা বস্তুগত সমৃদ্ধির দিক দিয়ে নয়, জনসমাজের সাধারণ শিক্ষা এবং বিজ্ঞানচেতনার দিক দিয়েও সমগ্র পৃথিবীতে একেবারে নিচের সারিতে দাঁড়িয়ে। এই পরিস্থিতিতে এদেশের আগামী দিনের প্রত্যাশিত রূপান্তরে আজকের শিশু-কিশোরদের ভূমিকা হবে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশের জন্য যে শিশু-সাহিত্য তাতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানচেতনা একটি বড় স্থান জুড়ে থাকবে তা বলাই বাহুল্য।

জুন, ১৯৮৬

[উৎস : *বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭]

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচিন্তা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নান্দনিক সৃষ্টিকর্মের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পর জীবনসায়াহ্নে এসে 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) বইতে বিজ্ঞানের নানা জটিল তত্ত্বে অবগাহন করেছিলেন। তাঁর এই 'দুঃসাহস' আপাতদৃষ্টিতে অনেকের কাছেই বিস্ময়কর মনে হতে পারে। আর এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই বইটির একটি দীর্ঘ ভূমিকায় দেশের কল্যাণের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সহজলভ্য করার অতি জরুরি প্রয়োজনের প্রতি তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; আর জানিয়েছেন, এ পথে কেউ তেমন এগিয়ে আসছেন না বলেই এক প্রবল দায়িত্ববোধ থেকে তাঁকে এ-কাজে হাত দিতে হয়েছে। তাঁর ভাষায় "আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি কোন মনীষী, যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে নামেন, তাহলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।" (বিশ্বপরিচয়, ভূমিকা)

রবীন্দ্রনাথের জীবনকাল (১৮৬১-১৯৪১) বিস্তৃত ছিল আট দশকের ওপরে। এই দীর্ঘ জীবনের প্রায় সবটা জুড়েই তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন বহুবিচিত্র বিপুল সৃষ্টির সম্ভার। তাঁর জীবনের মোটামুটি অর্ধেক কেটেছে উনিশ শতকে, বাকি অর্ধেক বিশ শতকে। কিন্তু তাঁর চিন্তাচেতনায় বিশ শতকের আধুনিক মানুষের রূপ অতি স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। এর প্রধান কারণ হয়তো এই যে, শৈশবের শিক্ষার অঙ্গ হিসেবেই বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর একটি নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। এজন্য তাঁর কাব্যে, গল্প-উপন্যাসে বা অন্যান্য রচনায়, প্রকৃতির বর্ণনায় ও মানবচরিত্র বিশ্লেষণে একজন সুস্থ প্রকৃতি-প্রেমিকের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় একটি যুক্তিবাদী বিজ্ঞান-ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ।

বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের কাহিনী তিনি নিজেই নানা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। ছেলেবেলায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁর জন্য নর্মাল স্কুলের শিক্ষা ছাড়াও গৃহশিক্ষকের কাছে যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তার বিস্তার ছিল ব্যাপক। গণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যার সাথে চারুপাঠ আর মেঘনাদবধকাব্য সেখানে সহাবস্থান করত। কুস্তি, জিমনাস্টিক্স, ড্রইং, গান শেখা আর ইংরেজিও বাদ যেত না। তাঁর যখন ন'দশ বছর বয়স তখন রবিবারে:

banglainternet.com

"মাঝে মাঝে সীতারাম দত্ত (ঘোষ) মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃত-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল। জ্বাল দিবার সময় তাপসংযোগে পাত্রের নিচের জল পাতলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারী জল নিচে নামিতে থাকে এবং এই জন্যই জল টগবগ করে, ইহাই যেদিন তিনি কাচপাত্রে জলে কাঠের গুঁড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন, সেদিন মনের মধ্যে যে কিরূপ বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে। ...যে রবিবারে সকালে তিনি না আসিতেন, সে রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।"

(জীবনস্মৃতি, পৃ: ৪১)

মানবদেহের অঙ্গসংস্থান ও অস্থিবিদ্যা শেখার জন্য সেই শৈশবেই তাঁকে মেডিক্যাল কলেজের শববিচ্ছেদ কক্ষেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শৈশবে আমের আঁটি ও আতা-বীচি দিয়ে তিনি যে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন তার পরিণতি বৃদ্ধ বয়সে কৃষি সম্পর্কে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষভাগে দুনিয়াজোড়া বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। ইউরোপে বিজ্ঞানের যে বিপুল বিকাশ আর শিল্প-বিপ্লব ঘটছিল তার ঢেউ এসে লেগেছিল পরাধীন ভারতেও। উনিশ শতকের শুরুতেই স্টিম এঞ্জিনের ব্যাপক ব্যবহার যন্ত্রসভ্যতার দ্রুত বিকাশ ঘটাতে শুরু করেছে, মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রেও এনেছে বিপুল আলোড়ন। এই শতকের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথের জন্মের ঠিক আগে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ জীববিদ্যার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। প্রায় একই সময়ে রসায়নবিদ্যার ব্যাপক বিকাশ, বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার, জীবাণুতত্ত্ব প্রভৃতি মানুষের জীবনযাত্রায় রূপান্তর ঘটাতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানের এই অগ্রযাত্রার সাথে এদেশে শৈশবের শিক্ষায় তাঁর যেমন পরিচয় ঘটেছিল, তেমনি আরো গভীর পরিচয় ঘটে মাত্র সতের বছর বয়সে ইউরোপবাসের সুযোগ হওয়ায়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনাও কিছুটা আরম্ভ হয়েছে। নব্য ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমেই বিজ্ঞানমুখী হয়ে উঠছে। অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ লেখক-লেখিকা সহজ বাংলায় সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা লিখতে আরম্ভ করেছেন। এসব রচনা রবীন্দ্রনাথকে শৈশবকালেই বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিজ্ঞানপ্রীতি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার পরিশীলিত প্রভাবও এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। এভাবে শৈশবকালে তাঁর মন বিজ্ঞানের বিজ্ঞানের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল বলেই মূলত কবি হিসেবে কল্পলোকের ভাব-

তরঙ্গে আন্দোলিত হয়েও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পাওয়া যুক্তিবাদ ও বাস্তবোধ তাঁকে বস্তুজগতের কাছাকাছি থাকতে সহায়তা করেছে।

জ্যোতির্বিদ্যা রবীন্দ্রনাথের কাছে একটা চিরকালের আকর্ষণের বস্তু ছিল। সম্ভবত এই অনুরাগ তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। মাত্র বার বছর বয়সে হিমালয়ের ড্যালহৌসি পাহাড়ে অবস্থানকালে সন্ধ্যাবেলা দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন—জ্যোতির্বিদ্যার নানা বিষয় বর্ণনা করতেন। তাঁর কাছে বিজ্ঞানের নানা কাহিনী শুনে কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে বিজ্ঞানানুরাগ গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কে তিনি পরে লিখেছেন : "তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড় প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম—জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।" 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' নামে তাঁর এই রচনা ১৮৭৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

যখন ইংরেজি মোটামুটি বোঝার মতো বুদ্ধি খুলল তখন তাঁর ভাষায়, "সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই যেখানে যত পেয়েছি পড়তে ছাড়িনি।" পরবর্তী পর্যায়ে এর সাথে তাঁর আগ্রহ গিয়ে পড়ে প্রাণতত্ত্বে। এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ আর চর্চার পরিণতির কথাও লিখেছেন তিনি :

"জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলই এই দু'টি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না, অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃংখলা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায়, কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করি নে।"

(বিশ্বপরিচয়, ভূমিকা)

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে (১৮৮৫) তাঁদের পরিবারে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় ছোটদের উপযোগী করে নিয়মিত জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, প্রভৃতি বিষয়ে সুখপাঠ্য রচনা লেখার ভার পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের ওপরে। আর সে পত্রিকায় প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই তিনি এসব নিয়ে লিখে যেতেন। পরবর্তীকালে ১৮৯১ সালে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সাধনা' নামে যে পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাতেও রবীন্দ্রনাথ প্রাণিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

সম্ভবত প্রথম জীবনে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাহচর্য ও সখ্য বিজ্ঞানের প্রতি কবির অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। বঙ্গদর্শনে তিনি 'জড় কি সজীব?' নামে

banglainternet.com

জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন (১৯০১) তা পড়ে জগদীশচন্দ্র নিজেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গভীর বিজ্ঞানানুরাগ দেখে বলতেন—'তুমি যদি কবি না হইতে তো শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইতে পারিতে।'

১৯২৬ সালে ইউরোপ সফরকালে রবীন্দ্রনাথ জার্মানিতে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সেখানে তাঁর কাছে তরুণ বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পর্কে জানতে পারেন। দেশে ফিরে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ বিজ্ঞানীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এর পর ১৯৩০ সালে জার্মানিতে তাঁর আরো একবার আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল।

এ সময়ে, অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথম ভাগে, বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বিপুল আলোড়ন চলছে। আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রচার করে সনাতন বিজ্ঞানের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছেন। বেতারযন্ত্র, আকাশ বিজয়, তেজস্ক্রিয় পরমাণুর গড়ন, ইলেকট্রন-প্রোটন দু'ধরনের তড়িৎকণা, কোয়ান্টামবাদ, জ্যোতিষ্কলোকের রহস্য, জীবাণুতত্ত্ব, বংশগতিবিদ্যা, প্যাভলভের গ্রন্থিক্ষরণতত্ত্ব এমনি সব নানা বৈজ্ঞানিক ধারণা চারদিকে প্রচণ্ড তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। এ সবই রবীন্দ্রনাথের মনেও বিরাটভাবে দোলা দিয়েছিল। বৃদ্ধ বয়সেও এসব বিষয় নিয়ে আশ্চর্য কৌতূহলবশে তিনি পড়াশোনা করেছেন প্রচুর। যেখানে বুঝতে অসুবিধে হয়েছে সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের কাছে বুঝে নিতে চেষ্টা করেছেন।

বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই সহজাত অনুরাগের একটি ফল হয়েছে এই যে, তাঁর বিভিন্ন কাব্যে, উপন্যাসে, গল্পে ও নাটকে বৈজ্ঞানিক ভাব ও তত্ত্বের প্রবেশ ঘটেছে। তাঁর সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে একটি বৈজ্ঞানিক মেজাজ যা তাঁর সাহিত্যরচনাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। যৌবনের একটি পর্যায়ে তাঁর মধ্যে কিছুটা অধ্যাত্মবাদের ছাপ পাওয়া যায় (খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য প্রভৃতি যার ফসল), কিন্তু বিস্ময়করভাবে, পরিণত বয়সে তাঁর মধ্যে যেন আরো বেশি প্রকৃতিঘনিষ্ঠতা ও বাস্তবনিষ্ঠার পরিচয় ফুটে উঠেছে। তাঁর কাব্যেও এক সজাগ বিজ্ঞানচেতনা এবং দর্শনের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। এককথায় বিজ্ঞানের চেতনাকে কল্পনার রসে জারিত করে তাকে তিনি তাঁর সমগ্র রচনাসম্ভারে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের একেবারে প্রথম দিকের রচনা 'প্রভাত-সঙ্গীত'-এ (১৮৮১) সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় প্রসঙ্গে তিনি বিজ্ঞানের তত্ত্বকে যেমন কাব্যরূপ দিয়েছেন, তেমনি 'সোনার তরী'র (১৯২৩) নানা কবিতায় (বসুন্ধরা, সমুদ্রের প্রতি প্রভৃতি) ফুটে উঠেছে সমকালীন বিজ্ঞানের গতিময়তার সুর। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে যে

জীবনদেবতার কথা বলেছেন তা নিছক কল্পলোকের বা অধ্যাত্মজগতের দেবতা নয়, তাকে অভিব্যক্তিবাদের আলোক-ধারায় স্নাত প্রাণ-পরম্পরারই প্রতিভূ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

অভিব্যক্তিবাদের ধারণা যে রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল তার চিহ্ন তাঁর কাব্যসাধনার সর্বাঙ্গে ছড়ানো। আজকের জীবলোকের জন্ম হয়েছে আদি জীবরূপ থেকে, তখন আমাদের জীবনসত্তা হয়তো লুকানো ছিল বৃক্ষরাজির মর্মরধ্বনির রূপ নিয়ে—এই ধারণা রূপ পেয়েছে তাঁর 'বসুন্ধরা' কবিতায় :

'মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মনে যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লবনিলয়ে
আকাশের নীলিমায়।'

আবার 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় আদি প্রাণসত্তার উদ্ভবের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি এভাবে :

"মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজ্ঞাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে।..."

আজকের বিজ্ঞানীরা বলেন, "এক অর্থে আমরা প্রত্যেকেই একদিন একটি তারার মধ্যে ছিলাম। ...আমাদের দেহের প্রতি অণুর বস্তু একদা তারকার কেন্দ্রস্থলের বিপুল তাপ ও চাপের অধীন ছিল। সেখানেই আমাদের রক্তিম রক্তকণিকার লৌহ সৃষ্টি হয়েছে। ... তাই বলা যায় মানবতা এক এবং অবিভাজ্য এটাই বিজ্ঞানের মর্মবাণী।"[১] রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে বারবার এই নিখিল চরাচরে ব্যপ্ত বিশ্বমানবতার জয়গান গেয়েছেন। সমুদ্রের অবিরাম কলধ্বনির মধ্যেও সেই একই ঐকতানের সুর তাঁর কানে বেজেছে। বিশ্বচরাচরের প্রতিটি কণিকার সাথে তিনি বোধ করেছেন আত্মীয়তার বন্ধন। 'পত্রপুট' (১৯৩৬) কাব্যে তিনি তাই বলেছেন :

"বলি—হে সবিতা
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে আমার দেহের অণু-পরমাণু।"

'নৈবেদ্য' (১৯০১) গ্রন্থের 'স্তব্ধতা' কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সেই একই বিশ্বানুভূতি :

"শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে

banglainternet.com

অণু-পরমাণুদের নৃত্য-কলরোল
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।"

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ শতকের শুরুতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা মানুষের জীবনে এবং চিন্তার জগতে বিরাট বিপ্লব শুরু করে। পাশ্চাত্যে রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ দার্শনিক লেখক এই আলোড়নের ফসল। বস্তুজগতে পরমাণুর নিরন্তর গতি, অবিরাম প্রবাহ আর স্পন্দন যেন চিন্তার জগতেও সৃষ্টি করল এক প্রবল ছন্দোময়তা। এরই প্রতিফলন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের 'বলাকা' (১৯১৫) প্রভৃতি কাব্যে।

যেখানে কবি নিতান্ত প্রকৃতিপ্রেমিক, সেখানেও প্রকৃতির মধ্যে তিনি দেখেছেন বিশ্ব সৃষ্টির নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। 'বনবাণী' (১৯২৭) গ্রন্থে 'বৃক্ষ-বন্দনা' কবিতায় তিনি উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগতের উদ্ভব আর ঐক্যের তত্ত্ব এবং এ দুয়েরই শক্তির উৎসরূপে সূর্যকিরণের ভূমিকা আশ্চর্য নিপুণতায় তুলে ধরেন কাব্যরূপ দিয়ে :

"... জেনেছি—সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে সেই হোম তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যামস্নিগ্ধরূপ। ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎজয়ী, দিলে তারে পরম সম্মান,
হয়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্ধী—সে অগ্নিচ্ছটায়
প্রদীপ্ত তাহার শক্তি বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায়
ভেদিয়া দুঃসাধ্য বিঘ্ন বাধা।..."

রবীন্দ্রনাথের মনের চিরসজীবতার একটা পরিচয় বোধ হয় এই যে, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও তিনি বিজ্ঞানের নানা জটিল তত্ত্ব উদঘাটনে নিবৃত্ত হননি। ক্রমাগত নতুন নতুন জ্ঞান আহরণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছেন:

"...এইসব বই-ই আমার ভালো লাগে—সায়েন্সের বই। ... কী আশ্চর্য
রহস্যময় এই জগৎ, আরো আশ্চর্য তার এতটুকু উদঘাটন! কে মনে
করতে পারে, এই যে হাতখানা, এ খালি নৃত্যশীল অণুপরমাণুর সমষ্টি।
এইসব বই আমার আরো ভালো লাগে এজন্য যে মনকে একটা ইম্পার্সনাল
অস্তিত্বে, একটা যুক্তির মধ্যে নিয়ে যেতে খুব সাহায্য করে। তুমি
আমি কিছু নয়, শুধু আছে নিয়ম আর সংখ্যা।..." [২]

পরিণত বয়সে এসে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানানুরাগ বিজ্ঞান বিষয়ে নিবিষ্ট চর্চার রূপ নেয়। এরই পরিণামে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় 'বিশ্বপরিচয়' নামে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। সমকালীন বিজ্ঞানের প্রধান কয়েকটি দিক নিয়ে পাঁচটি প্রবন্ধের সংকলন এই বইটি—পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক ও ভূলোক,

এছাড়া আছে উপসংহার। এতে তিনি যে শুধু তৎকালীন বিজ্ঞানের সর্বশেষ অগ্রগতির বিবরণ তুলে ধরেছেন তা নয়, সেই সাথে এই বর্ণনাকে আশ্চর্য সাহিত্যরসের সুষমায় মণ্ডিত করে তুলেছেন।

'বিশ্বপরিচয়' জাতীয় একটি বই লেখার চিন্তা কবির মাথায় হয়তো বহুকাল থেকে ছিল। বইটি লেখার ভার দেন তিনি শান্তিনিকেতনের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক প্রমথনাথ সেনগুপ্তের ওপর। ইনি ছিলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ছাত্র। কিন্তু অবশেষে বইটি নতুন করে লিখতে হয় রবীন্দ্রনাথকে। ১৩৪৪ সালে আলমোড়ার নিভৃত গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের সময় তিনি এটি রচনা করেন। বইটি সে বছরই আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়।

'বিশ্বপরিচয়' বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। তাতে বিজ্ঞানক্ষেত্রে আচার্য বসুর অবদানের প্রতি কবির শ্রদ্ধাবোধেরই প্রকাশ ঘটেছে। উৎসর্গ উপলক্ষে কৈফিয়তের আকারে রবীন্দ্রনাথ বইটির যে ভূমিকা লিখেছেন সেটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এতে করে সর্বমানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান বিস্তার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার গুরুত্ব এবং বাংলায় বিজ্ঞান আলোচনার আদর্শ সম্বন্ধে তিনি তাঁর মতামত সংক্ষেপে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর মনে যে একটা দর্শন সারা জীবনব্যাপী বিজ্ঞান পাঠের ও বিজ্ঞানচিন্তার ভেতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে তাও এতে প্রকাশ পেয়েছে সুন্দরভাবে। আমাদের পশ্চাদপদতার পেছনে বিজ্ঞানচর্চার অভাব যে অনেক পরিমাণে দায়ী এই বোধ তিনি প্রকাশ করেছেন এভাবে :

"বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলো কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এ দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।"

এই বই লিখতে গিয়ে পরিণত বয়সে তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি সম্বন্ধে বইপত্র যোগাড় করে পড়েছেন, যেখানে বুঝতে অসুবিধে হয়েছে সেখানে প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, বশী সেন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সহায়তা নিয়েছেন ব্যাখ্যার জন্য। বৃদ্ধ বয়সে অপটু দেহে এই বই লেখায় হাত দেবার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন : "তার একমাত্র কারণ সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার ছাঁচ গড়ে দেবার ইচ্ছা আমার মনে ছিল।" (ভূমিকা, তৃতীয় সংস্করণ)

বিশ্বপরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান আলোচনায় সহজ পরিভাষাবর্জিত রচনাভঙ্গির একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন; কিন্তু অতিসহজ করার চেষ্টায় মাল খুব বেশি

banglainternet.com

কমিয়ে ভাষার তরীকে হালকা করা কর্তব্য বোধ করেননি—কেননা তাঁর ভাষায় "দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না" তাঁর মত হল,

> "যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই বলে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজশূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়। যে বিষয়টা শেখবার সামগ্রী, নিছক ভোগ করবার নয়, তার উপর দিয়ে অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বলা যায় না। মন দেওয়া এবং চেষ্টা করে বোঝাটাই শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর।"

একটি বইতে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, ভূ-বিদ্যা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রের অতি আধুনিক তত্ত্বের সমাহার ঘটানো যে মোটেই সহজ কাজ ছিল না তা বলা বাহুল্য—বিশেষ করে বিজ্ঞানের আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভ যাঁর আদৌ ঘটেনি এমন ব্যক্তির পক্ষে। আর তিনি যে এ কাজটি অতি দক্ষতার সাথে করেছেন তাতে এযাবৎ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেননি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজে বিনয় প্রকাশ করে বলেছেন, "অনধিকার-প্রবেশে ভুলের আশঙ্কা করে লজ্জিত বোধ করছি...।"

রবীন্দ্রনাথ সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞান আলোচনার ভাষা সম্পর্কে যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন তা হল : "ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষা বর্জিত হবে ...অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না।" এই দুই শর্ত একই সঙ্গে পালন করা যে অতি দুঃসাধ্য তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজে কিভাবে তাঁর ভাষা ব্যবহার করেছেন 'বিশ্বপরিচয়' থেকে তার কয়েকটি নমুনা এখানে দেয়া যেতে পারে :

> "অতিপরমাণুদের দুরন্ত চাঞ্চল্য পজিটিভ-নেগেটিভে সন্ধি করে সংযত হয়ে আছে তাই বিশ্বে আছে শান্তি। ভালুকওয়ালা বাজায় ডুগডুগি, তারই তালে ভালুক নাচে। আর নানা খেলা দেখায়। ডুগডুগিওয়ালা না যদি থাকে, পোষমানা ভালুক যদি শিকলি কেটে স্বধর্ম পায় তাহলে কামড়িয়ে আঁচড়িয়ে চারদিকে অনর্থপাত করতে থাকে। আমাদের সর্বাঙ্গে এবং দেহের বাইরে এই পোষমানা বিভীষিকা নিয়ে অদৃশ্য ডুগডুগির ছন্দে চলেছে সৃষ্টির নাচ ও খেলা। সৃষ্টির আখড়ায় দুই খেলোয়াড় তাদের ভীষণ দ্বন্দ্ব মিলিয়ে বিশ্বচরাচরের রঙ্গভূমি সরগরম করে রেখেছে।"
>
> (বিশ্বপরিচয়, পরমাণুলোক)

> "একটা আশ্চর্যের কথা উঠেছে এই যে, কাছের দুটো-তিনটে ছাড়া বাকি নক্ষত্র জগৎগুলো আমাদের জগতের কাছ থেকে কেবলই সরে চলেছে। যেগুলি যত বেশি দূরে তাদের দৌড়-বেগও তত বেশি। এই সব নক্ষত্র জগতের সমষ্টি নিয়ে বিশ্বকে আমরা জানি, কোনো কোনো পণ্ডিত স্থির করেছেন সে ক্রমশই ফুলে উঠছে। সুতরাং যতই ফুলছে ততই নক্ষত্রপুঞ্জের পরস্পরের দূরত্ব যাচ্ছে বেড়ে। যে বেগে তারা সরছে তাতে আর একশো ত্রিশ কোটি বছর পরে তাদের পরস্পরের দূরত্ব এখনকার চেয়ে দ্বিগুণ হবে।" (—, নক্ষত্রলোক)

> "সূর্যের দেহ থেকে যে প্রচুর আলো বেরিয়ে চলেছে তার অতি সামান্য ভাগ গ্রহগুলিতে ঠেকে। অনেকখানিই চলে যায় শূন্যে, সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে, কোনো নক্ষত্রে পৌঁছায় চার বছরে, কোনো নক্ষত্রে ত্রিশ হাজার বছরে, কোনো নক্ষত্রে ন'লক্ষ বছরে। আমরা মনে ভাবি সূর্য আমাদেরই, আর তার আলোর দানে আমাদেরই বেশি দাবি। কিন্তু এত আলোর একটুখানি মাত্র আমাদের ছুঁয়ে যায়। তারপরে এই সূর্যের আলোকের দূত সূর্যে আর ফেরে না, কোথায় যায়, বিশ্বের কোন কাজে লাগে কে জানে।" (—, সৌরজগৎ)

> "সম্ভবত শুক্রগ্রহের অবস্থা সেই আদিকালের পৃথিবীর মতো। একদিন হয়তো কোনো ফাঁকে উদ্ভিদ দেখা দেবে, আর আঙ্গারিক গ্যাস থেকে অক্সিজেনকে ছাড়া দিতে থাকবে। তার পরে বহু দীর্ঘকালে ক্রমশ জীবজন্তুর পালা হবে শুরু। চাঁদ আর বুধগ্রহের অবস্থা ঠিক এর উল্টো। সেখানে জীবপালনযোগ্য হাওয়া টানের দুর্বলতাবশত দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গিয়েছিল।" (—, গ্রহলোক)

> "বাতাসকে মৌলিক পদার্থ বলা চলে না, ওটা মিশাল জিনিস। তাতে মিশেছে নানা গ্যাস, কিন্তু মেলেনি, একত্রে আছে, এক হয় নি। বাতাসে যে পরিমাণ অক্সিজেন তার প্রায় চার গুণ আছে নাইট্রোজেন। কেবলমাত্র নাইট্রোজেন থাকলে দম আটকিয়ে মরে যেতুম। কেবলমাত্র অক্সিজেনে আমাদের প্রাণবস্তু পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যেত। এই প্রাণবস্তু কিছু পরিমাণ জ্বলে, আবার জ্বলতে কিছু পরিমাণ বাধা পায়, তবেই আমরা দুই বাড়াবাড়ির মাঝখানে থেকে বাঁচতে পারি।" (—ভূলোক)

> "একদা জগতের সকলের চেয়ে মহাশ্চর্য বার্তা বহন করে বহুকোটি বৎসর পূর্বে তরুণ পৃথিবীতে দেখা দিল আমাদের চক্ষুর অদৃশ্য একটি জীবকোষের কণা। কী মহিমার ইতিহাস সে এনেছিল কত গোপনে। দেহে দেহে অপরূপ শিল্পসম্পদশালী তার সৃষ্টিকার্য নব নব পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অনবরত চলে আসছে। যোজনা করবার, শোধন করবার, অতিজটিল কর্মতন্ত্র উদ্ভাবন ও চালনা করবার বুদ্ধি প্রচ্ছন্নভাবে তাদের মধ্যে কোথায় আছে, কেমন করে তাদের ভিতর দিয়ে নিজেকে সক্রিয় করছে, উত্তরোত্তর অভিজ্ঞতা জমিয়ে তুলছে, ভেবে তার কিনারা পাওয়া যায় না।" (—, উপসংহার)

স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ নিজে বিজ্ঞানের ভাষা ব্যবহারের যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন তা তিনি অর্জন করেছেন অতি সহজ সার্থকতায়। বিজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা বজায় রেখেও সরস ও স্বচ্ছন্দ গতিময় ভাষা তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যত্র তিনি বলেছেন, "মানুষের বুদ্ধিসাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে, বিজ্ঞানে। ...জ্ঞানের ভাষা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই, তাতে ঠিক কথাটার মানে ঠিক থাকা দরকার, সাজসজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়।" ('বাংলাভাষা-পরিচয়', ১৯৩৮)

যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত ভাষার আদর্শ গ্রহণ করলেও বিজ্ঞানবিষয়ক রচনায় পরিভাষাকে একবারে বাদ তিনি দিতে পারেননি। তবে বলেছেন, "পারিভাষিক চর্ব্যজাতের জিনিস। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে করে যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।" সহজ ভাষায় লিখতে

banglainternet.com

গিয়ে অনেক সহজ পরিভাষা তাঁকে সৃষ্টি করতে হয়েছে, যেমন—লাল-উজানি আলো (infra-red light), বেগুনি-পারের আলো (ultra-violet light) কিরীটিকা, (corona), যন্ত্রপেষণী (grinding mill), কণাকার (granular), গ্রহিকা (asteroid), কেন্দ্রাতিগ (centrifugal), কেন্দ্রানুগ (centripetal), সম্মোহন (mesmerism) ইত্যাদি। তাঁর তৈরি কোনো কোনো প্রতিশব্দ আজ আর প্রচলিত নয়, যেমন আঙ্গারিক গ্যাস (কার্বন ডাই-অক্সাইড), কুটিল রেখা (বক্ররেখা), বিপ্রকর্ষ (বিকর্ষণ) বা প্রলীন (দ্রবীভূত)। কিন্তু অনেক বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দকে তিনি সেকালেই সাহসের সঙ্গে বাংলায় গ্রহণ করেছেন, যেমন হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, প্রোটন, নিউট্রন, পজেটিভ, নেগেটিভ ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-রচনায় শুধু যে তথ্যনিষ্ঠা বজায় থেকেছে এবং যথাযথ শব্দ প্রয়োগ ঘটেছে তা নয়, এক নিরাভরণ অথচ রসমণ্ডিত ভাষার ব্যবহারে তাঁর লেখা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। মূলত বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন লক্ষ্য হলেও তাঁর রচনা উন্নত সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। আবার অন্যদিকে তাঁর গল্প-উপন্যাসের কাঠামোতেও অতি সহজে নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে শেষ বয়সের রচনা 'সে' (১৯৩৭), 'তিনসঙ্গী' (১৯৪০), 'গল্পসল্প' (১৯৪১) এসব গ্রন্থে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের প্রসঙ্গ নানাভাবে আকর্ষণীয় রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে। যেমন, 'গল্পস্বল্প' বইয়ের প্রথম গল্পটির নাম 'বিজ্ঞানী'। বিজ্ঞানী নীলমণি চটি হারায় কেন তার জবাব খুঁজে পান না, অথচ চাঁদের গ্রহণ লাগায় সিকি সেকেন্ড দেরী হয় কেন তা তাঁর অঙ্কে ধরা পড়বেই। এ থেকে মনে হতে পারে এই লক্ষ্মীছাড়াকে নিয়ে তাঁর গিন্নী রেগে থাকবেন। কিন্তু না, তা নয়। কবি বলেছেন, "গোপনে তোমাকে জানাচ্ছি—একেবারে তার উল্টো। ওর এই এলোমেলো আলুথালু ভাব দেখেই তিনি মুগ্ধ। আমারও সেই দশা।"

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যেমন পুলকিত হতেন তেমনি তার অপপ্রয়োগ এবং যন্ত্রের পীড়ন নিয়ে ছিলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, আতঙ্কিত। বিজ্ঞানকে শোষণের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখে তিনি পীড়িত বোধ করেছেন। 'কালান্তর' (১৯১৮)-এ তিনি বলেছেন :

> "বিজ্ঞান যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ এবং অভাবমোচনের কাজে লাগে, যেখানে তার দান দশজনের কাছে গিয়ে পৌঁছায় সেইখানেই বিজ্ঞানের মহত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু যেখানে সে বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিকে ধনী বা প্রবল করিয়া তুলিবার কাজে বিশেষ করিয়া নিযুক্ত হয়, সেখানেই তার ভয়ঙ্কর পতন।"...

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' (১৯২৬) নাটকেও ধ্বনিত হয়েছে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই বই লেখার আগে তিনি সাত মাস আমেরিকায়

কাটিয়েছিলেন। আমেরিকা অবস্থানের বিষয় উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, "অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকার ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলাম। ...সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না।" (পশ্চিমযাত্রীর ডায়রি, ১৯২৬) অনেক ক্ষেত্রেই তিনি আধুনিক সভ্যতায় যন্ত্রের ব্যবহারকে দেখেছেন অভিশাপ হিসেবে। আমেরিকা থেকে ফিরে লেখা 'রক্তকরবী'তে এই যন্ত্রসভ্যতার হৃদয়হীনতার ছবিই ফুটে উঠেছে। তা বলে কবি যে একেবারেই যন্ত্রের বিপক্ষে তা বলা যাবে না। কয়েক বছর পর সোভিয়েত দেশ ঘুরে এসে তিনিই আবার লিখলেন,

> "এ কথা মানি, যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাসুরে সমুদ্র মন্থনের মত সে বিষও উদ্গার করে। পশ্চিম মহাদেশের কলতলাতেও দুর্ভিক্ষ আজ গুঁড়ি মেরে আসচে। ... কিন্তু এজন্য প্রকৃতিদত্ত শক্তিসম্পদকে দোষ দেব না, দোষ দেব মানুষের রিপুকে ...যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে।"

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন, এদেশে বিজ্ঞানমনস্ক চেতনার উদ্বোধন ঘটাবার আহ্বান জানিয়েছেন তা নয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার আয়োজনটা তিনি বেশ পাকাপোক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন। বাগান তৈরি, বনায়ন এবং কৃষিতে তাঁর ছিল গভীর উৎসাহ। শ্রীনিকেতনে তিনি স্থাপন করেছিলেন পরীক্ষামূলক কৃষিখামার; একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কৃষিবিদ্যা শিখতে পাঠিয়েছিলেন সুদূর আমেরিকায়। এদেশের অগ্রগতিতে গ্রামের সাধারণ মানুষদের উন্নতির ভূমিকা যে কত গভীর এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশ পেয়েছে ১৯৪০ সালে শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে দেয়া ভাষণে :

> "অশিক্ষিত পল্লীবাসীর সঙ্গে শিক্ষিত শহরবাসীর ভেদ দূর না করতে পারলে দেশ কখনো বড়ো হতে পারবে না। আজ বিজ্ঞানের শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। সব শিক্ষার পথকে সহজ করে গ্রামে সর্বজনের সুগম করে দিতে পারাটাই সকলের চেয়ে বড়ো সেবা। যে শিক্ষা য়ুরোপ থেকে এসেছে আমাদের দেশে তাকে গ্রহণ করে, সকলের মাঝে ঢেলে দিতে হবে, কারণ শিক্ষার মধ্যে দেশ-বিদেশের ভেদ নেই।"
>
> (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৬)

বয়সের পরিণতির সময়েও রবীন্দ্রনাথ চিন্তার ক্ষেত্রে, রচনাশৈলীর দিক থেকে নানা নতুন পথের সন্ধান করেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের শুধু 'রক্তকরবী' (১৯২৬) আর 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) দেয়নি, তাঁর সচেতন কৌতূহলদীপ্ত বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনেরও পরিচয় তুলে ধরেছে। এখানেই তাঁর আধুনিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এই আধুনিকতার জন্যই উনিশ শতকে জন্মগ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ আজ বিশ শতকের শেষেও সমকালীন। আজ থেকে পঞ্চাশ বা ষাট বছর আগে দেশে বিজ্ঞানচর্চার প্রসার,

banglainternet.com

বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশ বা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে সব কথা বলেছিলেন আমাদের আজকের পরিস্থিতিতেও মনে হয় তা যেন হুবহু প্রযোজ্য। পশ্চিমের কালজয়ী সাহিত্যরথী বা মহাকবিদের রচনায় সমকালীন বিজ্ঞানচেতনার প্রকাশ কী পরিমাণে ঘটেছিল তার সাথে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করব এমন বিদ্যে আমার নেই। কিন্তু বাংলা ভাষার এই সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার বিজ্ঞানচিন্তার ক্ষেত্রে যে অগ্রসর চেতনার পরিচয় দিয়েছেন তা সকল বাংলা ভাষাভাষীর জন্য গৌরবের সামগ্রী, বাংলা সাহিত্যে তা দীর্ঘকাল ধরে এক দিগ্‌দর্শনের কাজ করবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

জানুয়ারি ১৯৮৫

|উৎস : *বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭|

---

১. এ. এম. হারুন অর রশীদ, *বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ পৃ: ১৩-১৪

২. মৈত্রেয়ী দেবী, *মংপুতে রবীন্দ্রনাথ*, বাংলাদেশ সংস্করণ। ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৫, পৃ: ৫৯-৬০

প্রযুক্তি ও তৃতীয় বিশ্ব

আজ থেকে চার দশকের বেশি আগে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপুল ধ্বংসস্তূপের ওপর যখন জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর মানুষ আর-এক নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে। সে স্বপ্ন ক্ষুধা আর ধ্বংসের বিভীষিকা থেকে মুক্তির, শান্তি আর নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার, পৃথিবী জুড়ে সকল মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের স্বপ্ন।

এই স্বপ্ন আজও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। অবশ্য সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে অগ্রগতি ঘটেছে—তা অস্বীকার করার উপায় নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা পৃথিবীতে উপনিবেশবাদের বজ্রমুঠি শিথিল হয়ে এসেছে। অসংখ্য নব্যস্বাধীন দেশের উদ্ভব ঘটার ফলে জাতিসংঘের সদস্যসংখ্যা গত চার দশকে তিন গুণের বেশি হয়েছে। এসব নব্যস্বাধীন দেশগুলিতে গত চার দশকে শিশু-মৃত্যুর হার কমেছে; গড়পড়তা আয়ু, সাক্ষরতা, মাথাপিছু আয়, শিল্প উৎপাদন প্রভৃতি সূচক বেড়েছে।

এই অগ্রগতি তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বা 'তৃতীয় বিশ্বে' সমাজের কোনো কোনো অংশে স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হলেও এসব দেশের সব মানুষ অনাহার, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাৎপদতা থেকে আজও মুক্তি পায়নি। বরং উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে জীবনমানের পার্থক্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বিশ্বব্যাংকের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, আশির দশকে যদি ব্যাপক অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভব হয় তাহলেও এই দশকের শেষে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গড় মাথাপিছু আয় দাঁড়াবে শিল্পোন্নত দেশগুলির মাত্র বারো ভাগের এক ভাগ; সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে এই হার দাঁড়াবে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। এখানে উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের মাপকাঠিতে সবচেয়ে কম উন্নত ছত্রিশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশও পড়ে।

জাতিসংঘের জনকরা এক ঐক্যবদ্ধ বিশ্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে ব্যবধান আজও দুস্তর হয়ে রয়েছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত দেশগুলির মধ্যেই রয়েছে দু'টি বিশ্ব : উন্নত ধনবাদী দেশগুলি রয়েছে এক বিশ্বে, সমাজতন্ত্রী দেশগুলি অন্য বিশ্বে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে

banglainternet.com

পশ্চাৎপদ দেশগুলিকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আর এক তৃতীয় বিশ্ব। উন্নত দেশগুলির জনসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র ২০ শতাংশ, অথচ তারা নিয়ন্ত্রণ করে সমগ্র পৃথিবীর প্রায় ৮০ শতাংশ সম্পদ। তৃতীয় বিশ্বে বাস করে পৃথিবীর ৮০ শতাংশ মানুষ, কিন্তু তাদের আয়ত্ত পৃথিবীর মাত্র ২০ শতাংশ সম্পদ।

উন্নত বিশ্ব ও তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের (এবং তার অন্তর্ভুক্ত উপরোক্ত সবচেয়ে কম-উন্নত দেশগুলির) মধ্যে এই পার্থক্য অতি সাম্প্রতিক। মাত্র গত দু'তিন শতকের ব্যবধানে এই বিপুল পার্থক্য কী করে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার নানা ব্যাখ্যা দেয়া যায়। বিভিন্ন দেশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ, অতীত ইতিহাস, উপনিবেশবাদের প্রভাব প্রভৃতি নানা কারণ এর পেছনে দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু আজকের দিনে এই বৈষম্য সৃষ্টির একটি কারণের কথা ক্রমাগতই বেশি করে উল্লেখ করা হচ্ছে—সে হল প্রযুক্তি। এই কারণটি আগামী দিনে মনে হয় ক্রমেই আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। পাশ্চাত্যের দেশগুলি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে প্রধানত উৎপাদন-পদ্ধতিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে। উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও অনেকাংশে প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মধ্য দিয়েই আসতে পারে।

মানুষের সভ্যতার বিকাশে প্রযুক্তি চিরকালই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সে প্রযুক্তি অতি প্রাচীন সমাজে শিকার বা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আগুনের প্রয়োগ হোক, কৃষি ও পশুপালনের প্রযুক্তি হোক, যাতায়াতের জন্য চাকা বা পালের উদ্ভাবন হোক অথবা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে বাষ্পীয় ইঞ্জিন বা কমপিউটার প্রযুক্তির উদ্ভাবন হোক। এই প্রযুক্তি বিকাশের ধারা সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রমেই দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়েছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁর মাধ্যমে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে উদ্ভাবন ও অন্বেষার বিকাশ ঘটে তার ফল হিসেবে সতের-আঠার শতকের দিকে তত্ত্বীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে এক মেলবন্ধন সৃষ্টি হতে থাকে। তার মাধ্যমে প্রযুক্তির বিকাশের ধারা আরো ত্বরান্বিত হয়েছে—দেখা দিয়েছে শিল্প-বিপ্লব। উন্নত দেশগুলি নিজেদের দেশের এবং অনেক ক্ষেত্রে উপনিবেশ থেকে সংগৃহীত প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে এই প্রযুক্তির যোগ ঘটিয়েছে। আর সেজন্যই তাদের উৎপাদন-শক্তি দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ঔপনিবেশিক শাসনের কালে সরাসরিভাবে এবং পরবর্তীকালে পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ হারিয়েছে; তার চেয়েও বড় লোকসান তাদের ঘটেছে বিশ্বের প্রযুক্তি বিকাশের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায়। এ কারণে তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত পিছিয়ে পড়েছে এবং আজ

উন্নত দেশগুলির সঙ্গে সমকক্ষতা অর্জন তাদের পক্ষে ক্রমাগতই কঠিন হয়ে উঠেছে।

আজ এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, প্রযুক্তি আমাদের সমগ্র জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে। ঘরের সুনিপুণ রন্ধনশৈলী, কলের বা টিউবওয়েলের পানি যেমন প্রযুক্তির অবদান, তেমনি নতুন জাতের ধান ও গম, টেলিভিশনের ছবি, ডিজিটাল ঘড়ি বা অতি আধুনিক শল্যচিকিৎসাও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফল। প্রযুক্তি আমাদের জীবনে এমন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করার ফলে প্রযুক্তিকে বিভিন্ন জনে বিভিন্নভাবে দেখে থাকেন।

সচরাচর প্রযুক্তি বলতে আমাদের সামনে কিছু যন্ত্রপাতি, জটিল কলকারখানার ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু প্রযুক্তি যেমন যন্ত্রপাতি, তেমনি উৎপাদনের পদ্ধতি ও কলাকৌশল; অর্থাৎ প্রযুক্তি যেমন হতে পারে বস্তুগত, তেমনি হতে পারে বুদ্ধিগত—ব্যক্তির জ্ঞান ও কুশলতায় নিবদ্ধ।

প্রযুক্তির ধরন যাই হোক, তা সর্বত্রই মানুষের মেধা ও শ্রমের ফসল। এই সৃষ্টির লক্ষ্য হল মানুষের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি। সে কর্মকুশলতা প্রযুক্ত হতে পারে কোনো প্রাকৃতিক বস্তুকে প্রয়োজনীয় পণ্যে রূপান্তরিত করতে, পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায়, অধিক সম্পদ সৃষ্টিতে অথবা সামাজিক রূপান্তর সাধনে। যেহেতু প্রযুক্তি মাত্রেরই উপযোগ-মূল্য রয়েছে, অর্থাৎ তাকে কোনো কাজে প্রয়োগ করা যায়, তাই সচরাচর সব প্রযুক্তিরই কম-বেশি পরিমাণে বস্তুগত ও অবস্তুগত দু'টি দিকই রয়েছে। বস্তুপ্রধান প্রযুক্তির মধ্যে যেমন পড়ে পণ্যদ্রব্য (যথা হাঁড়ি-পাতিল বা হাতঘড়ি), তেমনি পড়ে এসবের উৎপাদন-যন্ত্র (যথা কুমারের চাক বা ঘড়িনির্মাতাদের যন্ত্রপাতি)।

উৎপাদনের সঙ্গে প্রযুক্তির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী বলেই প্রযুক্তির অগ্রগতি ছাড়া কোনো দেশের বা জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অগ্রগতির কথা চিন্তা করা যায় না। এমনকি মানুষের সমগ্র সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসকে প্রযুক্তি বিকাশের প্রত্যক্ষ ফল বললেও অত্যুক্তি হয় না। আগেই বলা হয়েছে, প্রযুক্তি শুধু যন্ত্রপাতি নয়, সে সব যন্ত্রপাতি প্রয়োগের কলাকৌশলও, আর প্রয়োগের কলাকৌশল ছাড়া যন্ত্রপাতি অকর্মণ্য। শুধু তাই নয়, প্রযুক্তি গড়ে ওঠে একটি সামাজিক পরিমণ্ডলে— সমাজেরই প্রয়োজনে। এই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে মানুষ যেমন তার উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ ঘটায়, তেমনি সেই উৎপাদন-পদ্ধতিও মানুষকে, সমাজকে কিছুটা পরিমাণে বদলে দেয়।

প্রাচীনকালে মানুষ ক্রমে ক্রমে তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছিল। পাথরের হাতিয়ার থেকে মানুষের উত্তরণ ঘটে ধাতব হাতিয়ারে, কিন্তু এই পরিবর্তন ঘটতে লেগেছে বহু হাজার বছর। তার প্রধান

banglainternet.com

কারণ সে সময়ে মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ; চারপাশের প্রকৃতির নিয়মকানুন সম্বন্ধে মানুষ জানত সামান্য। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ প্রযুক্তি আয়ত্ত করত তার পেছনের বৈজ্ঞানিক নিয়ম-কানুন না জেনেই—শুধু যুগ যুগব্যাপী অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। মানুষের জ্ঞানের বিকাশের ফলে বস্তুর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সহজ হয়ে ওঠে। ১৬-১৭ শতকে ইউরোপে যে বিজ্ঞান-বিপ্লব ঘটেছিল তার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে দেখা দেয় ১৮-১৯ শতকের শিল্প-বিপ্লব। নানা নতুন নতুন বস্তু ও নতুন নতুন শক্তির উৎস মানুষ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করতে শুরু করে। তার ফলে উৎপাদন-পদ্ধতির বিপুল বিকাশ ঘটে। আবার এই উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশ নতুন নতুন যন্ত্রপাতি নির্মাণে সহায়তা করে প্রযুক্তির বিকাশেও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।

এসব পরিবর্তনের একটি ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ্মবিকাশের ব্যাপক প্রভাব পড়তে আরম্ভ করেছে সমগ্র সমাজের ওপর। বরং বলা চলে উন্নত বা অনুন্নত কোনো দেশই এবং কোনো দেশের জনসমাজই আর আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বিপুল প্রভাবের বাইরে থাকতে পারছে না। বলাবাহুল্য এই প্রভাবের যেমন ভালো দিক আছে তেমনি মন্দ দিকও আছে। সবুজ-বিপ্লব নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল বীজ সৃষ্টি করে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িয়েছে; কিন্তু সেই সঙ্গে অনেক প্রান্তিক ক্ষুদ্র চাষীকে ভূমিহীনে পরিণত করেছে। নতুন নতুন কীটনাশক যেমন ফসলের অনেক অনিষ্টকর কীট ধ্বংস করেছে, তেমনি আবার নতুন জাতের অনিষ্টকর কীটের উদ্ভবও ঘটিয়েছে।

কিন্তু এসব ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়ে অবহিত থেকেও আজকের দিনে কোনো দেশের পক্ষে প্রযুক্তিবিমুখ হয়ে উন্নয়নের কথা চিন্তা করা যায় না। উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বর্ধিত বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক সম্পদ। সব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সমান নয়, নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি না হলেও কোনো কোনো দেশ উন্নত উৎপাদন-পদ্ধতির মাধ্যমে সে দুর্বলতা পুষিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ক্রমাগত পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আজ বোঝা যাচ্ছে আসলে সমগ্র পৃথিবীরই বস্তুসম্পদ সীমাবদ্ধ। আর তাই আগামী দিনে সমগ্র পৃথিবীর জন্যই প্রযুক্তির উন্নয়ন হবে একান্ত জরুরি। উন্নয়নশীল দেশগুলি যদি আজই উন্নত প্রযুক্তি আয়ত্ত করার উদ্যোগ না নেয় তাহলে তাদের পক্ষে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি হবে দুঃসাধ্য।

সাম্প্রতিককালে যেসব দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে, তারা প্রধানত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমেই এই সাফল্য অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারতের দৃষ্টান্ত সচরাচর উল্লেখ করা হয়ে থাকে। অনেকের ধারণা এসব দেশ শুধু উন্নত পাশ্চাত্য দেশ থেকে প্রযুক্তি ধার করে তাদের দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে সাধারণভাবে প্রযুক্তি হস্তান্তরের পদ্ধতি মোটেই এমন সরল নয়, রীতিমতো জটিল। বর্তমানকালে কোনো দেশই নিজেদের লভ্য আধুনিক প্রযুক্তি সহজে হস্তান্তর করতে আগ্রহী নয়। তাছাড়া কোনো দেশ সাধারণ শিক্ষা, বিশেষ করে বর্তমান বিজ্ঞাননির্ভর প্রযুক্তির যুগে বিজ্ঞানশিক্ষার যথোপযুক্ত পটভূমি ছাড়া সহজে নতুন প্রযুক্তি আত্মস্থ করতে পারে না। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত এসব দেশও সাধারণ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং সুগঠিত গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যবস্থার ভিতের ওপরই প্রযুক্তিক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করেছে।

তাছাড়া কোনো-এক দেশের পরিমণ্ডলে উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি প্রায়শই অন্য দেশে হুবহু প্রয়োগ করা শক্ত হয়, তাকে গ্রহণকারী দেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। এজন্য আজকাল 'প্রযুক্তি হস্তান্তর' ও 'যথোপযুক্ত প্রযুক্তি'র সমস্যা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার সাহায্যে সনাতন ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' থেকে মুক্তি লাভ আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের জন্য দীর্ঘকাল ধরে উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা চলছে, ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে 'নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা' সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, ১৯৮১ সালে গৃহীত হয়েছে 'সবচেয়ে কম-উন্নত দেশগুলির বাস্তব নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচি।' কিন্তু এসব সত্ত্বেও পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি ঘটেছে বলে মনে হয় না।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপুল বিকাশের ফল এযাবৎ প্রধানত উন্নত দেশগুলোই ভোগ করেছে। ইউরোপে বিজ্ঞান-বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লব, ঔপনিবেশিক শোষণ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলাফলকে পেটেন্ট প্রভৃতি পদ্ধতিতে গোপনীয়তার আড়ালে কুক্ষিগত করে রাখা প্রভৃতি এ ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রভাব করেছে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি—যারা দীর্ঘকালের ঔপনিবেশিকতার শোষণের ফলে নানা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছে—রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করার পরও চিরকালের জন্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ এবং উন্নত দেশগুলির ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে একথা মেনে নেওয়া যায় না।

উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে একটি মূল ভূমিকা পালন করেছে বড় শিল্পকারখানায় বড় আকারের উৎপাদন এবং সেজন্য আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ। বড় শিল্পকারখানা স্থাপন করতে বিপুল মূলধনের প্রয়োজন। তাছাড়া এসব দেশকে নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করার জন্যও যথেষ্ট গবেষণা ও

banglainternet.com

উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হচ্ছে। কিন্তু উন্নয়নের এই মডেল উন্নত দেশগুলোর জন্য কার্যকর হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে সকল ক্ষেত্রে এই একই পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া অবাস্তব হবে।

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী ১৯৮০ সালে উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলির মাথাপিছু গড় আয় ছিল ৯,৬৭৫ ডলার, পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ৪,৫০৩ ডলার, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ৯৮২ ডলার এবং সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলিতে ২২২ ডলার। এই হিসেব অনুযায়ী উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলির গড় মাথাপিছু আয় ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলির গড় আয়ের প্রায় ১০ গুণ, এবং সবচেয়ে কম-উন্নত দেশগুলির গড় আয়ের প্রায় ৪৪ গুণ। কিন্তু এরচেয়েও হতাশাব্যঞ্জক তথ্য দেয়া হয়েছে বিশ্বব্যাংকের 'বার্ষিক উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৮৫'তে। এতে বলা হয়েছে আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে আজও মাথাপিছু প্রকৃত আয় রয়েছে ১৯৭০ সালের মানে, ১৯৭০ আর ১৯৮৪ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ চারগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮,৬০০ কোটি ডলার (বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক হিসেব অনুযায়ী ১৯৮৬ সালের শেষে এই অঙ্ক দাঁড়াবে অন্তত একলক্ষ কোটি ডলার)। এসব দেশের ঋণের পরিমাণ মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৩৪ শতাংশ এবং ১৯৮২ সালে এসব দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ২০ শতাংশ ব্যয় হয়েছে শুধু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে।

এই ব্যাপক দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র পথ হল আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিকে আত্মস্থ করে নিজস্ব উন্নয়ন পথ তৈরি করা। বলা বাহুল্য এ কাজটি মোটেই সহজ নয়। এ বিষয়ে নানা আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে নানা প্রস্তাব প্রণীত হচ্ছে। এসব প্রস্তাব ও সুপারিশ যে তৃতীয় বিশ্বের সব দেশের জন্য হুবহু একইভাবে প্রযোজ্য বা কার্যকর হবে তাও বাস্তবসম্মত বলে মনে হয় না।

এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকায় উন্নয়নশীল দেশের সংখ্যা আজ একশ'র ওপরে। এই দেশগুলির প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও জীবনপদ্ধতি। প্রত্যেক দেশের শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তির চরিত্রও বিভিন্ন। তবে সব দেশের ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তার সাথে রয়েছে মূলধন ও প্রযুক্তির দুর্বলতা, সনাতন কৃষিব্যবস্থা, সেকেলে উৎপাদন-পদ্ধতি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার।

এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উচ্চমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অস্তিত্বই শুধু এসব দেশের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞান ও

প্রযুক্তিকে কাজে লাগাবার উপযোগী সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলাও এসব দেশের জন্য জরুরি। তাছাড়া উন্নত দেশগুলি যে সকল ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় নিঃস্বার্থভাবে তাদের প্রযুক্তি দিয়ে সহায়তার হাত প্রসারিত করবে এমন মনে করাও হবে নির্বুদ্ধিতা।

তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাথে এসব দেশের যে স্বল্পকালের সংযোগ ঘটেছে তার মধ্যে তারা এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা গড়ে তুলতে পারেনি। আজকের দিনে প্রযুক্তিগত মান অর্জন করতে পাশ্চাত্য দেশগুলির ক্ষেত্রে লেগেছে তিনশ' বছরের ওপরে এবং জাপানের ক্ষেত্রে মেইজি পুনর্জাগরণের পর একশ' বছরের ওপরে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা চর্চার বিশিষ্ট ঐতিহ্য গড়ে না-ওঠা উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে আজ একটি প্রধান বাধা বলে গণ্য হতে পারে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির অভাবও মূলত ঐতিহ্যের অভাবের ফল বলা যায়। বিদেশে যাদের উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয় দেশে যথেষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে না-ওঠায় তাদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগ করে। দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং সে জনশক্তিকে দেশে ধরে রাখার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় নেতৃবৃন্দ নানা সমস্যা নিয়ে এমন বিব্রত থাকেন যে, দেশের অগ্রগতির জন্য সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করা তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। বিনিয়োগের উপযোগী পুঁজির ঘাটতি থাকায় উন্নয়নক্ষেত্রে বরং স্বল্পকালে ফল পাওয়া যাবে এ ধরনের প্রকল্পগুলোই প্রাধান্য পেতে থাকে। তাই শিল্পোন্নত দেশে যেখানে সচরাচর মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৩ ভাগ বা তার বেশি গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়, উন্নয়নশীল দেশে সেখানে এক্ষেত্রে ব্যয় হয় জাতীয় আয়ের ০.৫ ভাগ বা তারও কম।

এই দুর্বলতা যে শুধু গবেষণা ব্যবস্থায় অর্থবিনিয়োগে তা নয়; এই ধরনের দুর্বলতা দেখা যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থায়, জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংক্রান্ত জ্ঞান বিস্তারে, গবেষণা ও শিল্পের মধ্যে সংযোগে এবং শিল্পের ব্যবস্থাপনাতেও। সনাতন আমলাতান্ত্রিক স্থবিরতা ঝেড়ে ফেলে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ না ঘটালে শুধু অর্থ বিনিয়োগের হার বাড়িয়ে এক্ষেত্রে উপযুক্ত ফল লাভ করা কঠিন।

আসলে আধুনিকতার প্রবর্তন প্রয়োজন শুধু গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যবস্থায় নয়, সামগ্রিক সমাজেও। উন্নত দেশগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সাথে

banglainternet.com

দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এগিয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে সামাজিক অগ্রগতির এই ধাপগুলিকে বাদ দিয়ে শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অর্জন করা সহজসাধ্য নয়। কাজেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যেমন সামাজিক উন্নয়নের ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, তেমনি সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলও আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা চর্চার অনুকূল করে তোলা প্রয়োজন।

আজকের উন্নত দেশগুলিতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন দেশের সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত; আবার এই প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে বেগ সঞ্চারিত হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে। কাজেই দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গবেষণা ও উন্নয়নের প্রভাব অতি স্পষ্ট। অথচ আজকের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সনাতন উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়নের প্রায় কোনো স্থান নেই; যদি-বা কিছু নতুন প্রযুক্তি দেশে আমদানি করা হয়, তা প্রায়শই আসে বিদেশ থেকে 'টার্ন-কী' পদ্ধতিতে। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমেই সে প্রযুক্তি স্থাপিত হয়; কাজেই দেশে প্রযুক্তি উদ্ভাবন বা গবেষণার প্রশ্নটি আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত গৌণ বলে মনে হয়। এভাবে উন্নত দেশের সঙ্গে সংযোগ অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় প্রযুক্তি বিকাশের পক্ষে সহায়ক না হয়ে বরং বাধা হয়ে দেখা দেয়।

এ কারণেই গত কয়েক দশকের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অগ্রগতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযোগ্য প্রয়োগের জন্য একটি সামগ্রিক জাতীয় নীতি নির্ধারণের ভিত্তিতে এগোনো প্রয়োজন। এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নীতি শুধু নিরাবলম্ব নীতি নয়, তাকে হতে হবে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে বেসরকারী খাত একটা বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশে সাধারণত জাতীয় সরকারকেই এক্ষেত্রে প্রধান উদ্যোগ নিতে হয়। সাম্প্রতিককালে জাপান, ভারত, চীন, কোরিয়া প্রভৃতি যেসব দেশ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছে তারা সকলেই এমনি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়েছে।

এই পরিকল্পিত অগ্রগতির একটি দিক অবশ্যই হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ব্যবস্থা। এই কাজটি সময়সাপেক্ষ, এবং সে কারণেই এদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন সবার আগে। সেই সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপনের লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আধুনিক ও সুসংহত করা প্রয়োজন। এসব প্রতিষ্ঠানের যেমন সুসংগত গবেষণা কর্মসূচি নির্ধারণ করতে হবে, তেমনি সে সব গবেষণার উপযোগী সুযোগ-সুবিধে

এবং উপযুক্ত জনশক্তি সৃষ্টিরও আয়োজন চাই; সেই সঙ্গে চাই গবেষণার ফলাফল শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সকল প্রযুক্তি যে নিজেদেরই উদ্ভাবন করতে হবে এমন নয়। বিদেশ থেকে উন্নত প্রযুক্তি আহরণের নিশ্চয়ই সুযোগ ও প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এসব প্রযুক্তি নির্বাচন ও আত্মীকরণ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করা প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে প্রযুক্তি অনেকাংশেই একটি সামাজিক-আর্থনীতিক পরিমণ্ডলের ফল। বিদেশ থেকে প্রযুক্তি গ্রহণের সময় যদি তার সামাজিক-আর্থনীতিক দিকগুলো সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা না হয় তাহলে তা শেষ পর্যন্ত যে আর্থিক, পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে তা নয়, বিদেশের ওপর প্রযুক্তিগত নির্ভরতারও জন্ম দেয়।

বিদেশ থেকে প্রযুক্তি গ্রহণের পাশাপাশি নিজস্ব প্রযুক্তিগত ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। বিশ্বের সকল প্রযুক্তি মূলত সমগ্র মানবজাতির সাধারণ উত্তরাধিকার; আর এক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতি বা জনগোষ্ঠীরই কিছু-না-কিছু অবদান রয়েছে। অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে আজ মানুষের প্রযুক্তিসম্পদ অল্পকিছু দেশের ও প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত। নতুন প্রযুক্তি আহরণের ডামাডোলে দেশের নিজস্ব নানা সনাতন প্রযুক্তিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে সনাতন প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ করা হলে তা জনগণের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী হতে পারে। কৃষি, চিকিৎসা, ক্ষুদ্র শিল্প প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রেই সনাতন প্রযুক্তির আধুনিকীকরণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বিদেশী প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রেও প্রধান লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন সে প্রযুক্তি নিজস্ব প্রয়োজনে আত্মস্থ করা এবং স্বদেশের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে অন্য দেশের সমকক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করা। চিরকালের জন্য পরনির্ভরতা কোনো দেশেরই কাম্য হতে পারে না।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আধুনিকতা আনতে গেলে আর্থনীতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও আধুনিকতার প্রবর্তন চাই। সমাজে পশ্চাৎপদ ভাবধারা, অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার অব্যাহত থাকলে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন পদে পদে বাধাগ্রস্ত হবে। এজন্য সমগ্র সমাজে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি, অনুসন্ধিৎসার প্রবৃত্তি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্য নির্ধারণের পদ্ধতি এবং স্বাধীন চিন্তার বিকাশ দেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির স্বার্থেই প্রয়োজন।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতার একটি সূচক এই যে, এসব দেশে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অতি আধুনিক প্রযুক্তি এবং অতি প্রাচীন প্রযুক্তিকে পাশাপাশি অবস্থান করতে দেখা যায়। এই উৎকট বৈপরীত্যকে অনেক সময় 'জেট বিমান ও গরুর গাড়ির সহাবস্থান' বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। জেট

banglainternet.com

বিমান দৃষ্টিসুখকর হলেও তার সুবিধা লভ্য শুধু দেশের আণুবীক্ষণিক এক জনগোষ্ঠীর কাছে, অসংখ্য মানুষের দূর গন্তব্যে পৌছবার পন্থা এখনও গরুর গাড়ি বা প্রাগৈতিহাসিক কালের পালের নৌকা। একই ধরনের বৈপরীত্য চোখে পড়বে আধুনিক শল্যচিকিৎসা এবং হাতুড়ে বৈদ্যের ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসায়, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থায় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে।

এই পরিস্থিতিতে এসব দেশে উন্নয়নের একটি আবশ্যকীয় শর্ত হল উৎপাদন ও সেবাক্ষেত্র উপকরণ ও পদ্ধতির এই বিপুল বৈষম্যের মধ্যে সমন্বয় বিধান। সেজন্য একদিকে যেমন সনাতন প্রযুক্তির আধুনিকায়ন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন অতি আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের সময় দেশের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে তার উপযোগিতার মূল্যায়ন।

তৃতীয় বিশ্বে গত কয়েক দশকের শিল্পায়নের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে গ্রহণকারীদের অনভিজ্ঞতার কারণে প্রায়শ এমন প্রযুক্তি গছিয়ে দেয়া হয় যা ব্যয়বহুল ও অলাভজনক প্রমাণিত হওয়ায় উন্নত দেশে ইতিমধ্যে বর্জিত; কিংবা যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি জটিল ও অনাবশ্যকভাবে বৃহদাকার এবং যার যন্ত্রাংশের জন্য সরবরাহকারী দেশের ওপর দীর্ঘকাল নির্ভর করে থাকতে হবে। কখনো কখনো উন্নত দেশের সরবরাহকারীরা মুনাফার স্বার্থে এমন প্রযুক্তি অন্য দেশে রপ্তানি করে যা পরিবেশে বিপর্যয় ঘটায় এবং মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে। বিপজ্জনক কীটনাশক, বিষাক্ত রাসায়নিক বস্তু ও ক্ষতিকর ওষুধ রপ্তানি এর দৃষ্টান্ত।

এ থেকে একটি শিক্ষা গ্রহণ করা যায় যে, কোনো প্রযুক্তি আপাতদৃষ্টিতে যতই আকর্ষণীয় হোক তাকে যথাযথ মূল্যায়ন না করে গ্রহণ করা নিরাপদ নয়। মূল্যায়ন হতে হবে অবশ্যই গ্রহণকারী দেশের বাস্তব প্রয়োজনের নিরিখে। এজন্য গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে সে প্রযুক্তির পরিবর্তন ও অভিযোজন অনেক ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। এ ধরনের মূল্যায়ন, অভিযোজন ও আত্মীকরণের জন্য দক্ষ দেশজ জনশক্তি এবং দেশজ গবেষণা ও উন্নয়ন অবকাঠামো গড়ে তোলা একান্ত জরুরি।

আজকাল অনেক সময় 'যথাযথ প্রযুক্তি' বা 'লাগসই প্রযুক্তি'র কথা বলা হয়ে থাকে। কারো কারো মতে তা মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলিকে আধুনিক প্রযুক্তির অবদান থেকে বঞ্চিত রাখার জন্য উন্নত দেশগুলোর একটি কৌশল মাত্র। প্রকৃত অর্থে লাগসই প্রযুক্তি মাত্রই পুরনো বা অনাধুনিক প্রযুক্তি নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনে অতি আধুনিক প্রযুক্তিও অনুন্নত দেশের জন্য যথোপযুক্ত হতে পারে—যেমন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবাণী দেবার জন্য আধুনিক রেডার বা আবহাওয়া উপগ্রহের সংকেত বিশ্লেষণ ব্যবস্থা। তবে

লাগসই প্রযুক্তির মূল কথা হল বৃহৎ পুঁজিনির্ভর এমন প্রযুক্তি বর্জন করা যা দেশে বেকারত্ব সৃষ্টি করবে এবং বিদেশী প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়াবে; তার জায়গায় এমন প্রযুক্তির প্রবর্তন উৎসাহিত করা প্রয়োজন যা দেশের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং দেশের আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন মেটায়।

এমনি যথোপযুক্ত প্রযুক্তি অনেক সময় দেশের প্রচলিত প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে বা অন্য উন্নয়নশীল দেশ থেকেও পাওয়া যেতে পারে। এখানে বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে যে রান্নার চুলা বা আলো দেয়ার কুপি ব্যবহার করা হয় তার কথা তোলা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এমন নতুন চুলা এবং কুপি উদ্ভাবন করেছেন যার জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা আগের চেয়ে দুই বা তিনগুণ বেশি। সারা দেশে এই নতুন ধরনের চুলা ও কুপি ব্যবহৃত হলে জ্বালানি কাঠ ও কেরোসিনের ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য সাশ্রয় ঘটতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রধানত পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত। এই দেশগুলোর একটি বিশেষ সম্পদ হল তাদের উদ্ভিদরাজি ও প্রাণিকুল। অনুমান করা হয় যে, পৃথিবীতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে; তার মধ্যে প্রায় ত্রিশ লক্ষই রয়েছে নিরক্ষীয় অঞ্চলে অর্থাৎ পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এসব প্রজাতির মধ্যে অধিকাংশেরই গুণাগুণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও বাকি রয়েছে। তবে প্রধান কারণ এসব দেশে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের সংখ্যাল্পতা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় সম্পদ বিনিয়োগের অপ্রতুলতা। সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণাক্ষেত্রে জনসম্পদের মাত্র ছ' শতাংশ রয়েছে উন্নয়নশীল দেশে এবং সম্পদ বিনিয়োগের মাত্র তিন শতাংশ ঘটছে এই দেশগুলোতে। অথচ মাত্র দু'একটি অর্থকরী উদ্ভিদেরও যে কী বিপুল বাণিজ্যিক মূল্য হতে পারে তা রবার, সিঙ্কোনা, কফি, চা, পাট প্রভৃতি উদ্ভিদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব থেকে বোঝা যায়।

বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নানা ফসল ও ফুলের চাষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। নানা ধরনের ফল, ভেষজ উদ্ভিদ, অর্থকরী ফসল প্রভৃতি চাষের প্রযুক্তি এসব দেশ পরস্পরের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারে। ফিলিপাইনের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণাগার দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে ধান চাষের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তেমনিভাবে ঢাকার আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণাগার উদরাময় রোগ নিয়ন্ত্রণে একটি সফল ধারার প্রবর্তন করেছে। এগুলিকে সার্থক লাগসই প্রযুক্তির দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি অনেক সময় নতুন সমস্যার ও জন্ম দেয়। নতুন নতুন উচ্চফলনশীল প্রজাতির চাষের ফলে প্রচলিত অসংখ্য জাতের শস্য আজ নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়েছে। কাজেই উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের বংশগতির সম্পদ

banglainternet.com

সংরক্ষণও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র হতে পারে।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, জ্বালানি এবং যোগাযোগের প্রয়োজন নিঃসন্দেহে অগ্রাধিকারের দাবি করতে পারে। খাদ্য সমস্যার মতোই জ্বালানি সমস্যাও সারা পৃথিবী জুড়ে আজ এক ব্যাপক রূপ নিয়েছে। এক্ষেত্রে চীন, ভারত, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশ জৈবগ্যাস বা 'বায়োগ্যাস' ব্যবহারে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে। জৈবগ্যাস ব্যবহারে শুধু যে রান্না বা আলোর জন্য জ্বালানি পাওয়া যায় তা নয়, এই ব্যবস্থা পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং এ থেকে উপজাত বস্তু সার ও পশুখাদ্য হিসেবেও ব্যবহারযোগ্য।

সাম্প্রতিককালে খাদ্য ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য জৈববস্তু উৎপাদনের আরো নানা নতুন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে; সেগুলো দেশের প্রচলিত প্রযুক্তি ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হলে উৎপাদনের ব্যাপক অগ্রগতি হতে পারে। এর মধ্যে কোষকলা চাষ বা 'টিসু কালচার' প্রভৃতি পদ্ধতির উল্লেখ করা যায়। এ সকল পদ্ধতিকে সামগ্রিকভাবে জৈব-প্রযুক্তি বা 'বায়োটেকনলজি' বলা হয়ে থাকে। কৃষি ও শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধিতে জৈব-প্রযুক্তির নতুন নতুন ব্যবহার ক্রমাগতই আবিষ্কৃত হচ্ছে। জিন-প্রকৌশল জৈব-প্রযুক্তিরই একটি উন্নত শাখা।

এমনি আরো নানা ক্ষেত্রে সনাতন প্রযুক্তির সাথে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যোগসূত্রের ফলে নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে সৌরশক্তি, অ্যাজোলা জাতীয় শেওলা-সার ও অন্যান্য জৈবসারের ব্যবহার, কীটপতঙ্গের জৈব নিয়ন্ত্রণ, ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, পানীয় ও সেচের জন্য জল সরবরাহ, খাদ্য ও শস্য প্রক্রিয়াকরণ, স্বল্পব্যয়ে গৃহনির্মাণ, ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার, হাঁসমুরগির চাষ প্রভৃতি গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রাকার যান্ত্রিকায়ন প্রযুক্তি আজ অনেক উন্নয়নশীল দেশে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতি-আধুনিক প্রযুক্তি উন্নয়নশীল দেশের জন্য একই সঙ্গে বিপুল সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ ধরনের প্রযুক্তির মধ্যে জিন-প্রকৌশল, ক্ষুদ্র-ইলেকট্রনিক্স, কমপিউটার, সৌর বিদ্যুৎকোষ, নতুন নতুন গুণাগুণযুক্ত বস্তু উদ্ভাবন এবং কৃত্রিম উপগ্রহভিত্তিক দূর-অনুধাবনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব নতুন প্রযুক্তির আত্মীকরণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনা খুলে দিতে পারে; আর তা সম্ভব না হলে উন্নত দেশের সঙ্গে এসব অর্থনৈতিক বৈষম্য হয়তো আরো দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

এই আলোচনার গোড়ার দিকে একটি প্রশ্ন প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছিল। এখানে প্রশ্নটিকে সামনে আনা যেতে পারে। সে প্রশ্নটি হল নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানী বা আত্মীকরণ কি শেষ পর্যন্ত সমগ্র জনগণের কল্যাণ সাধন করবে, না দেশের বা সমাজের শুধু সংকীর্ণ এক অংশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে। এ যাবৎকালের অভিজ্ঞতা এই যে, উন্নত দেশগুলি থেকে যখন উন্নয়নশীল দেশে প্রযুক্তি আমদানি করা হয় তখন তা প্রধানত প্রযুক্তি রপ্তানিকারক দেশের এবং আংশিকভাবে আমদানিকারক দেশের এক ক্ষুদ্র অংশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। আর একারণেই উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য ঘোচে না এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে যেমন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে তেমনি উন্নয়নশীল দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়তে থাকে।

এ সমস্যাটি উন্নয়নশীল দেশগুলির অগ্রগতির সামনে আজ এক মৌলিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ এটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, সমগ্র জনগণের মধ্যে উন্নয়নের ফলাফল পৌঁছাতে না পারলে বাংলাদেশে উচ্চফলনশীল ধানের বিস্তারের মতোই অগ্রগতি একটা পর্যায়ে এসে থেমে যায়, দারিদ্র্যের পরিধি বাড়তে থাকে এবং সমগ্র উন্নয়ন প্রক্রিয়াই শেষ পর্যন্ত অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

এ সমস্যার সমাধান নিঃসন্দেহে নিহিত সামগ্রিক উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার পুনর্বিবেচনায়। উন্নয়নের লক্ষ্য যদি হয় সমগ্র জনগণের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ তাহলে যেমন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যেকার বৈষম্য দূরীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে, তেমনি প্রযুক্তি নির্বাচনে এমন কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন যা উৎপাদন বৃদ্ধির ফলাফল সমগ্র জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়—যেন তা শুধু এক ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী অংশের কুক্ষিগত না হয়।

এই কৌশলের একটি প্রধান দিক হল উন্নয়নশীল দেশের উপযোগী প্রযুক্তি নির্বাচন ও উদ্ভাবন। উন্নত দেশে যেসব প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয় সেগুলির মূল লক্ষ্য হল সে সব দেশের আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন মেটানো। কাজেই অনেক ক্ষেত্রেই উন্নত দেশ থেকে পরিপক্ক প্রযুক্তি হুবহু আমদানি করলে তা উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজন সিদ্ধ করে না। এজন্য নতুন প্রযুক্তির পেছনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত প্রাথমিক বা মাঝারি স্তর থেকে শুরু করে উন্নয়নশীল দেশের নিজস্ব সমস্যা সমাধানের উপযোগী প্রযুক্তি সৃষ্টি করতে হবে। জৈব-প্রযুক্তি, ক্ষুদ্র-ইলেকট্রনিক্স, সৌর-শক্তি, দূর-অনুধাবন সকল ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য এজন্য উন্নত দেশের প্রযুক্তির সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী না থেকে উন্নয়নশীল দেশকে নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যবস্থা, যথেষ্টসংখ্যক দক্ষ বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আত্মীকরণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

banglainternet.com

উপরোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হলে তিনটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। প্রথমত যেসব দেশজ সনাতন প্রযুক্তির অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত বা সাংস্কৃতিক মূল্য রয়েছে সেগুলিকে সংরক্ষণ এবং আরো উন্নত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যেসব নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বাস্তব আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানে সহায়তা করতে পারে, সেগুলিকে দেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির স্বার্থে গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয়ত, দেশের সামগ্রিক প্রয়োজন সিদ্ধির স্বার্থে নতুন ও সনাতন প্রযুক্তির সমন্বয়ের উদ্যোগ নিতে হবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে জনগণের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা, কুশলতা ও কৃষ্টির যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে এই সমন্বয় সাধন করা সম্ভব।

সেই সঙ্গে চাই সমগ্র জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিপোষক দক্ষতা ও মনোভঙ্গি গড়ে তোলা। আজকের উন্নত প্রযুক্তি মাত্রই বিজ্ঞান-নির্ভর। কাজেই সমগ্র সমাজে সাধারণ শিক্ষা, বিশেষত বিজ্ঞানশিক্ষার বিস্তার না ঘটলে, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারমুক্ত উদ্ভাবনমূলক মনোভঙ্গি প্রসারিত না হলে, অনুসন্ধান, পরীক্ষণ ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধি না পেলে সে সমাজে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হবে দুঃসাধ্য। আজকের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো পাশ্চাত্য দেশ থেকে 'তৈরি প্রযুক্তি' গ্রহণ করে বিনা শ্রমে অগ্রগতির স্বর্ণ-দ্বারে পৌছে যাবার মোহ থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্তি পায় তত মঙ্গল। নিজেদের ঐতিহ্য, মেধা ও শ্রমের ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চার দুরূহ পথে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণা উদ্ভাবনের পথে এগোনো ছাড়া এসব দেশের প্রকৃত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের কোনো বিকল্প আছে বলে মনে হয় না।

মার্চ, ১৯৮৬

[উৎস : *বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭]

বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান

এই বিশ শতকের শেষ প্রান্তে পৌছে সভ্যতার বড়াই মুখে না করলেও মনে মনে আমাদের বড় কম নয়। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় সত্য আর সুন্দর যেমন মানুষের চিরকালের সাধনার বস্তু, তেমনি আজ বিজ্ঞানকেও আমরা জীবনের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। নিজেকে যুক্তি বা বিজ্ঞানের বিরোধী বলে দাবি করবেন এমন লোক আজকের দিনে খুঁজে পাওয়া রীতিমতো শক্ত।

প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে মানুষ জন্ম দিয়েছে বিজ্ঞানের। এই প্রক্রিয়ায় মানুষ জেনেছে প্রকৃতির অসংখ্য নিয়মকানুন, আর আয়ত্ত করেছে ক্রমাগত আরো নানা নিয়মকানুন উদ্‌ঘাটনের পদ্ধতি। নতুন জ্ঞানের জন্য মানুষ নির্ভর করতে শিখেছে চারপাশের প্রকৃতি থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর; শিখেছে এমনভাবে সেসব পরীক্ষণের বর্ণনা দিতে যাতে অন্য যে কেউ একই পরীক্ষা করে তার সত্যাসত্য যাচাই করে নিতে পারে। শুধু তথ্যের সমাবেশ নয়, গণিতের সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে মানুষ সে-সব তথ্যকে বিশ্লেষণ আর ব্যাখ্যা করেছে। এভাবে ক্রমে ক্রমে সে আয়ত্ত করেছে প্রকৃতির নিয়মের ওপর নির্ভর করে আগামী ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করার কৌশল। আর এই সমগ্র পদ্ধতিকেই আমরা বলছি বিজ্ঞান।—এসব কিছুর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান যে মানুষকে শুধু জীবনের নানা স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ দিয়েছে তা নয়, সেই সঙ্গে তাকে দিয়েছে এক স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টি; আর এই দৃষ্টিকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের শক্তি।

কিন্তু তবু কি আমরা আজও সত্যি এক বিজ্ঞান-নির্ভর মানসিকতার জগতে পৌছেছি বলে দাবি করতে পারি? শিক্ষার আলোকবঞ্চিত মানুষের কথা না হয় আপাতত বাদ রাখা যাক; আমরা যারা নিজেদের শিক্ষিত বলে দাবি করি তাদেরও জীবনের অনেকটাই কি পুরনো চিন্তার বেড়াজাল আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখেনি? এদেশে খনার একটি বচন আছে, "হাঁচি টিকটিকি বাধা—যে মানে না সে গাধা।" এমনি কত বাধা আজও আমাদের চিন্তার পথে, এগিয়ে যাওয়ার পথে সৃষ্টি করে রেখেছে কতশত বেড়ি!

মানুষের সভ্যতা বহু হাজার বছরের পথ পেরিয়ে আজকের অবস্থায় এসে পৌছেছে। আজকের এই অগ্রগতির পেছনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ

banglainternet.com

করেছে যে মূল নীতিটি সে হল : প্রকৃতির রহস্য দুর্জ্ঞেয় হলেও মানুষের বুদ্ধির অগম্য নয়। মানুষ চেষ্টা করলে প্রকৃতির নিয়মকানুনকে উদ্‌ঘাটন করতে পারে আর সে সব নিয়মকানুনকে কাজে লাগিয়ে উন্নত করতে পারে তার জীবনকে।

এই ধারণা যে মানুষের কাছে চিরকাল স্পষ্ট ছিল তা নয়। আদিম মানুষ ছিল মূলত প্রকৃতির হাতে ক্রীড়নক; প্রকৃতির শক্তির কাছে তাকে ক্রমাগত হার মানতে হত। সে সব অজানা, রহস্যময় শক্তিকে তুষ্ট করার জন্য নানা তুক-তাক, আচার-অনুষ্ঠানের আশ্রয় নিত সে। সেকালের মানুষের অনেক আচার-অনুষ্ঠান আজকের দিনের বিচারে মনে হবে রীতিমতো নিষ্ঠুর, বীভৎস ও ক্ষতিকর। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এমনি অনেক ধারণা মানুষ আজ কাটিয়ে উঠেছে, তবু সবই কাটিয়ে উঠতে পেরেছে এমন নয়। আজও আমাদের সমাজে এ-সব ধারণা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে।

আজ থেকে মাত্র কয়েক দশক আগেও আমাদের দেশের অনেক বেশি এলাকা আচ্ছন্ন ছিল বনজঙ্গলে। সূর্য ডোবার সাথে সাথে প্রায় সারা দেশ ঢেকে যেত গাঢ় অন্ধকারে। লোকে ভাবত শ্মশানে, গোরস্তানে, শেওড়া-বট-তেঁতুল গাছে আস্তানা গেড়ে থাকে ভূতের দল, বাঁশঝাড়ে বাস করে পেত্নী, জলা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় শাকচুন্নিরা। রাত নামলেই শুরু হয় তাদের আনাগোনা। বিশেষ করে শনি-মঙ্গলবারে বা অমাবস্যার রাতে তাদের উৎপাত বেশি দেখা দেয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে আজ ক্রমেই বিলীন হয়ে আসছে বনানী, গ্রামে গ্রামে পৌঁছতে আরম্ভ করেছে বিজলির আলো। আর তার ফলে অশরীরী প্রেতাত্মারাও যেন গ্রাম ছেড়ে পালাবার পথ খুঁজছে। শহর থেকে তাদের নির্বাসন ঘটেছিল আগেই, এবার গ্রামাঞ্চলেও তাদের ঠাঁই পাওয়া শক্ত হয়ে উঠেছে। জলা জায়গায় অন্ধকারে-আলো-জ্বলা যে আলেয়া তাকে বিজ্ঞানীরা আজ বলছেন বাতাসের সংস্পর্শে আপনা থেকে জ্বলে-ওঠা জৈবগ্যাস।

তবু ভূত-পেত্নীরা আমাদের মন থেকে একেবারে কি গিয়েছে? আজও অনেক মা-বাপ বা মুরুব্বি ছোট ছেলেমেয়েদের কপালে বা গালে এঁকে দেন একটি কালো দাগ বা টিপ—শিশুকে ভূত-প্রেত্নীর নজর লাগা থেকে রক্ষা করাই তার উদ্দেশ্য। গর্ভবতী নারী, নবজাত শিশু এদের দিকেই নাকি তাদের আকর্ষণ বেশি। তবে কালিমাখা শিশুর দিকে প্রেতাত্মাদের তেমন আগ্রহ না হওয়াই সম্ভব। হানাবাড়ির কাহিনী আজও শোনা যায় অনেক জায়গাতেই। এমনি সব পড়োবাড়িকে প্রেতাত্মার প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য কখনো তন্ত্রমন্ত্র পড়ার আয়োজন করতে হয়। এই শতকের প্রথম দিকে পরশুরাম তাঁর 'গড্ডলিকা' বইতে 'ভুশণ্ডীর মাঠে' নামে একটি অসাধারণ গল্পে ব্রহ্মদৈত্য, যক্ষ, প্রেত,

ডাকিনী, শাকচুন্নি, পেত্নীদের জন্মান্তরের সমস্যা নিয়ে বিপুল হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিলেন।

কালো বেড়ালের রূপ ধরে নাকি ঘুরে বেড়ায় ডাইনিরা। এমনি সব ডাইনি সুবিধেমতো পেলে মানুষ ধরে তার রক্ত চুষে খায় এমন ধারণা বহু পুরনো। ইউরোপের অন্ধকার যুগে বহু মেয়েকে ডাইনি বা ডাকিনী সন্দেহ করে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়। তার মধ্যে একজন বিখ্যাত মেয়ের নাম জোয়ান অব আর্ক (১৪১২-৩১)। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে এই মেয়ে আক্রমণকারী ইংরেজদের হাত থেকে ফ্রান্সকে উদ্ধার করার জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পাঁচ বছরের মধ্যে সে গড়ে তোলে এক দুর্ধর্ষ মুক্তিবাহিনী। অবশেষে ইংরেজদের হাতে বন্দি হলে ডাইনি হিসেবে আগুনে পোড়ানো হয় এই বীরাঙ্গণাকে। সেকালে প্রচলিত প্রথা বা ব্যবস্থার কেউ বিরোধিতা করলে তাকে ডাইনি আখ্যা দেয়া ছিল ধর্মান্ধ মোহান্তদের একটি সাধারণ রীতি। পনের-ষোল-সতের এই তিন শতকে ইউরোপে এমনি অসংখ্য লোককে ডাইনি বলে পোড়ানো হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে জোয়ান অব আর্ককে ডাইনির অপবাদ থেকে মুক্তি দেয়া হয়; এই শতকের শুরুতে তাঁকে 'সেইন্ট' বা স্বাধ্বীর মর্যাদাও দেয়া হয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা পাহাড়ের গুহায় বহুহাজার বছরের পুরনো মানুষের আঁকা ছবির সন্ধান পেয়েছেন। এসব ছবিতে দেখা যায় দল বেঁধে মানুষ পশু শিকার করছে—পশুর গায়ে গেঁথে আছে তীর বা বল্লম। সেকালের মানুষ মনে করত পশুর প্রতীকের ওপর এমনি তীর বিঁধিয়ে দিলে তার প্রভাব পড়বে সত্যিকার শিকারের ওপর। আর তাহলে শিকারের সময় সহজেই কাবু করা যাবে উদ্দিষ্ট পশুকে। এমনি জাদুবিশ্বাসের প্রভাব আজও দেখি আমাদের সমাজে ধুলো পড়া, বাণ মারা ইত্যাদি নানা বিশ্বাসে আর আচারে।

এসব জাদু অবশ্য সবার আয়ত্ত নয়; এর জন্য চাই 'মন্ত্রসিদ্ধ' ওঝা। কোনো প্রতিপক্ষের অনিষ্ট করতে চাইলে এমনি ওঝার আশ্রয় নিতে হবে। ওঝারা একমুঠো ধুলো নিয়ে মন্ত্র পড়ে শিকারের অর্থাৎ প্রতিপক্ষের গায়ে ছুঁড়ে দিলে সে মুখ থুবড়ে পড়বে এবং তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে। একইভাবে প্রতিপক্ষকে বাণ মেরেও কাবু করা যায়। সেজন্য ওঝাকে এনে দিতে হবে প্রতিপক্ষের কাপড়ের একটি কোণা। যদি সংগ্রহ করা যায় তার একটি চুলের গোছা, নখ বা দাঁত তাহলে ফল পাওয়া যাবে আরো ভালো।

হাঁড়ি চালান দেয়া প্রতিপক্ষকে কাবু করার আর একটি মোক্ষম পন্থা। মন্ত্রপড়া লাল ফুল, মিষ্টি, একজোড়া পান, একটা খোলা ছুরি, কয়েকটা সুচ—এসব উপকরণ নতুন হাঁড়িতে ভরে অমাবস্যার গভীর রাতে মন্ত্র পড়ে ভাসিয়ে দিতে

banglainternet.com

হবে পানিতে। ভাসতে ভাসতে সে হাঁড়ি গিয়ে পৌঁছবে শিকারের বাড়িতে; সে ঐ হাড়ি ছোঁয়ামাত্র সুঁই ছুটে গিয়ে বিধবে তার দেহে, আর সে রক্তবমি করে মরে যাবে। প্রতিপক্ষকে হত্যা করাই যে এসব জাদুর একমাত্র উদ্দেশ্য তা নয়—কাউকে কাবু করা বা বশ করা, হৃদয়দানে সম্মত করা বা কৃতকর্মের স্বীকৃতি আদায়ও সিদ্ধ হতে পারে এসব পদ্ধতিতে।

বশীকরণের নানা বিচিত্র পদ্ধতি রয়েছে। তার একটি পদ্ধতির বর্ণনা এ রকম: "অমাবস্যার রাতে একটি ইঁদুর মেরে সেই রাতেই তা তেরাস্তায় পুঁতে রাখতে হবে। এক মাস পর সেই পচা ইঁদুরের ঘিলু দিয়ে তিলক পরলে পছন্দ করা নারী বশীভূত হবে।" এমনি আরেক সমাধান হল এ ধরনের : "জোড়সুপারি, নতুন গাছের নিখুঁত পান আর কার্তিক মাসে অমাবস্যার শেষ হাট থেকে কিনে-আনা চুন-জরদা দিয়ে রাত-দুপুরে পানের খিলি তৈরি করে পরদিন যাকে খাওয়ানো যাবে সেই বশীভূত হবে।" মারণ, উচাটন, বশীকরণ, বাটি চালানের বিজ্ঞাপনে এখনও ছেয়ে থাকে আমাদের অনেক পত্র-পত্রিকার পাতা।

আদিম পৃথিবীর ভয় আজও ছড়ানো আমাদের জীবনের বাঁকে বাঁকে। বিভীষিকা আর আতঙ্ক কালো ছায়া বিস্তার করে আছে সর্বত্র আর সকল সময়ে। ভরদুপুর বেলাটা মোটেই শুভ নয় কারো জন্য; কেননা এ সময়ে অপদেবতাদের নজর লাগার ভয় থাকে; এ সময়েই তারা চারদিকে ঘোরাফেরা করে—সুযোগ পেলেই অনিষ্ট করতে পারে। অমাবস্যার মধ্যরাতে অপদেবতাদের আনাগোনা বাড়ে আরো। মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিবারের বিকেল বেলা হল বারবেলা; এ সময়ে যাত্রানাস্তি, কোনো শুভকাজে হাত দিতে নেই। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় চুলকাটা বা নখকাটাও নিষেধ।

এমনি বিপজ্জনক পৃথিবীতে প্রতি পদে পা ফেলতে হবে অতি সাবধানে-সন্তর্পণে; তা নইলে অপদেবতারা হয় ঘাড় মটকাবে নইলে জীবনকে করে তুলবে অশান্তিময়। এ পৃথিবীতে কে আর চায় অশান্তির জীবন? তাই নিরাপদ হল নিষেধের জালে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখা।—প্রতিবেশীর কাছে কখনো নুন ধার করতে নেই। ধার করলে তা আর ফেরত দেয়া যাবে না, তাতে অমঙ্গল। নুন কখনো হাতে হাতে নিতে নেই, তাহলে নির্ঘাৎ ঝগড়া বাধবে, তাই দেয়া-নেয়া করতে হবে কোনো পাত্রে। বিয়ে-শাদি হওয়া চাই চাঁদের শুক্লপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষে হলে ঘটবে দারুণ বিপর্যয়।

কালো বেড়াল যদি পথে সামনে পড়ে তাহলে বিপদ রয়েছে কপালে; কেননা কালো বেড়াল হল শয়তানের দূত। যদি কুকুর কাঁদে বা রাতে পেঁচা ডাকে তবে তাতেও বোঝা যায় কিছু অমঙ্গল ঘটতে যাচ্ছে। লোকালয়ে শকুন দেখা দিলে বুঝতে হবে একটা মড়ক আসছে সামনে—তাতে বহুলোক মারা যাবে। যদি ঘরে

থাকে রোগী আর শোনা যায় কাকের কর্কশ ডাক তাহলে বুঝতে হবে সে রোগীর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে—মৃত্যু যখন তখন।

মেয়েদের নিয়ে রয়েছে অনেক ধরনের বিশ্বাস আর বাধা-নিষেধ। মেয়েদের রাতে চুল আঁচড়াতে নেই; ভূতপ্রেতের নাম নিতে নেই—তাহলে তারা সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ভর করে বসবে। গর্ভবতী মেয়েদের গায়ে অতি সহজে অপদেবতা এসে ওঠে; তাই এমন মেয়েদের হাতে-পায়ে মেহেদি লাগাতে নেই বা তাদের ভরদুপুরে খোলাচুলে এদিক-সেদিক যেতে নেই। কোথাও যেতে হলে খোলা চুলে একটি গিট দিয়ে নিতে হবে অথবা সঙ্গে রাখতে হবে লোহার তৈরি কোনো জিনিস। তাহলে আর অপদেবতা কাছে ঘেঁষতে পারে না। ভাত রান্নার পর স্ত্রী যদি আগে খেতে বসে তাহলে স্বামী মারা যাবে। কোনো মেয়ে যদি গাছে চড়ে তাহলে বজ্রপাত আসন্ন।

আঁতুড়ঘরে অপদেবতার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সারাক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হবে। নবজাত শিশুকে দুপুরে বা সন্ধ্যাবেলা বের করা যাবে না। নিরাপত্তার জন্য শিশুর গলায়, হাতে বা কোমরে লাগাতে হবে তামার পয়সা আর কড়ি-গাঁথা কালো সুতোর তাগা। যদি এই তাগায় লাগানো যায় বাঘের নখ বা দাঁত আর তামার মাদুলি তাহলে আর তার ওপর কারো নজর লাগতে পারে না।

তা বলে সবই কি অশুভ? শুভ কি কিছুই নেই? ....হ্যাঁ, তা-ও আছে। কারো গায়ে প্রজাপতি বসলে বুঝতে হবে সেটা বিয়ের পূর্বলক্ষণ। মাছ হল শুভ; তাই বিয়েবাড়িতে 'তত্ত্ব' পাঠাতে হলে তাতে অন্তত বড় একটি মাছ থাকা চাই। ব্যাঙ ডাকলে বোঝা যায় বৃষ্টি নামবে। ঝড়ের সময় ঘরের খুঁটিতে কোপালে থেমে যাবে সে ঝড়।

এমনি অনেক বিশ্বাস আমাদের কাছে আজ অর্থহীন বা হাস্যকর মনে হবে। কিন্তু এসব বিশ্বাস আর সংস্কার এদেশের মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে বহুকাল থেকে। আর এমনি বহু বিশ্বাস আজও চালু রয়েছে আমাদের চারপাশেই। শহরের আলোকিত রাজপথে ভূতপেত্নীর আনাগোনা তেমন না ঘটলেও গ্রামের মানুষের মনে অশরীরী প্রেতাত্মার ভয় আজও জেঁকে আছে। আর শহরেও প্রকটভাবে না হোক প্রচ্ছন্নভাবে হাজার হাজার মানুষের মন আজও আচ্ছন্ন অজস্র সংস্কারের বেড়াজালে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' বইতে ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন : "আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের কোণে নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না,

banglainternet.com

কিন্তু মনে মনে বড় একটা আশঙ্কা হইত। ..." এমনি অজস্র অজ না বিপদের আশঙ্কায় আজও পদে পদে আড়ষ্ট আমাদের জীবন।

স্বামীর মৃত্যু ঘটলে সতী নারীর জীবন হয়ে পড়ে অর্থহীন; তাই স্বামীর সাথে এক চিতায় সহমরণেই তার মুক্তি। এই সনাতন বিশ্বাসের মর্মান্তিক পরিণতি থেকে হিন্দু নারীদের রক্ষা করার জন্য এদেশে সতীদাহ আইন প্রবর্তিত হয়েছিল ১৮২৯ সালে। তারপর কেটে গেছে দেড়শ' বছরের ওপর। কিন্তু তবু সহমরণের মাধ্যমে পরকালে সহজ পরিত্রাণের আকর্ষণ এই উপমহাদেশ থেকে পুরোপুরি অন্তর্হিত হয়নি। দেবতাদের তুষ্টির জন্য নরবলির ধারণাও আজও মুছে যায়নি মানুষের মন থেকে। তাই দেখা যায় কখনো স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত বিকারগ্রস্ত বাবা নিজের প্রিয় সন্তানকে কুপিয়ে হত্যা করছে পরকালে পরম নির্বাণের প্রত্যাশায়।

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপক বিকাশ সত্ত্বেও এদেশের মানুষ ওষুধের বদলে আজও প্রধানতই নির্ভর করে মাদুলি আর পানিপড়ার ওপরে। পীরের দরবারে হাজির হয় হাজারে হাজারে। এমনকি ক্ষেতে পোকা লাগলেও সেখানে কীটনাশকের বদলে ছিটানো হয় মৌলভী সাহেবের পড়াপানি।

কথা উঠবে, মানুষ কি নেহাতই প্রাচীন সংস্কারের বশে এমন আচরণ করছে? এর পেছনে কি নেই সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা? শিক্ষাহীন, দারিদ্র্যপীড়িত মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই সচেতন নয় আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে। আধুনিক চিকিৎসা লভ্য নয় তাদের অনেকের কাছে; চিকিৎসক যদি-বা মেলে, দুর্মূল্যের আধুনিক ওষুধ একেবারেই তাদের নাগালের বাইরে। এই গভীর দারিদ্র্যই তাদের বাধ্য করে মাদুলি আর পানিপড়ার চিকিৎসার ওপর নির্ভর করতে। সেই একই দারিদ্র্য আর দুর্মূল্যের কীটনাশক তাদের নিয়ে যায় পানিপড়া দিয়ে ক্ষেতের কীট দমনের ব্যর্থ প্রচেষ্টায়।

এমনি সংস্কারে আবদ্ধ মানুষের কাছে জীবনের নানা সমস্যার সমাধানের চেষ্টা নিয়ে আসে যেমন পীর-দরবেশ, তেমনি গণক আর জ্যোতিষীর দল। জীবনের নানা অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়ে মানুষ জানতে চায় ভবিষ্যতের কথা। আর এ থেকেই ভবিষ্যদ্বক্তার উদ্ভব ঘটে সেই বহু প্রাচীনকালে।

প্রাচীন ব্যাবিলনে আজ থেকে পাঁচ-ছ'হাজার বছর আগে নানা পদ্ধতিতে ভাগ্য গণনা করার রীতি প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। তার মধ্যে একটি পদ্ধতি ছিল ভেড়ার যকৃৎ বা কলজের গায়ের দাগ দেখে ভাগ্য গণনা করা। প্রত্নতাত্ত্বিকরা সে অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পেয়েছেন পোড়ামাটির তৈরি যকৃৎ; এতে বোঝা যায় আজকালকার মডেলের সাহায্যে জীববিদ্যা শেখানোর মতো সেকালেও মডেলের সাহায্যে ভাগ্য গণনা শেখাবার ব্যবস্থা ছিল।

ভাগ্য গণনার জন্য যেসব বিচিত্র পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে তার একটি হল আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা। তেমনি মানুষের হাতের রেখা,

হস্তলিপি, মাথার গড়ন, এমনকি পেটের শব্দ শুনেও ভাগ্য গণনার রীতি রয়েছে। প্রাচীন গ্রিসে নারীর সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে তার ভবিষ্যদ্বাণী করার একটি সহজ পন্থা ছিল। অন্তঃসত্ত্বা মেয়েরা বুকের ভেতর রেখে দিয়ে মুরগির ডিম ফোটাত। ডিম ফুটে মুরগি ছানা বেরোলে বোঝা যেত সন্তান হবে মেয়ে; মোরগ ছানা বেরোলে বোঝা যেত সন্তান হবে ছেলে!

আজও অনেক মানুষ জীবনযুদ্ধে হতাশাগ্রস্ত হয়ে ছুটছে গণক বা জ্যোতিষীর কাছে; খুঁজছে তার সমস্যার অলৌকিক সমাধান। হাতের রেখা, কোষ্ঠিবিচার, গ্রহ-নক্ষত্রের চালচিত্র বিবেচনা করে জ্যোতিষী বিপদ ত্রাণের জন্য বিধান দিচ্ছেন পাথর, মাদুলি বা আর কিছুর। কেউ কেউ হয়তো এই মাদুলি বা রত্নপাথর ধারণ করে স্বস্তিলাভ করছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই যে ভাগ্যব্যবসায়ীদের হাতে প্রতারিত হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জীবনের নানা সমস্যার লৌকিক বাস্তব সমাধান নয়, অলৌকিক সমাধানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ আজো জন্ম দিচ্ছে নানা নতুন নতুন প্রতারণার। এসব প্রবণতার মধ্যে দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের ছলচাতুরি, কোথাও কোথাও বিজ্ঞানেরই নানা কলাকৌশলের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে জনসাধারণকে প্রতারণা করার জন্য।

সত্তরের দশকের শুরুতে প্রচুর চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল মালয়েশিয়ার জোহরা ফনা নামে এক মহিলার গর্ভস্থ সন্তানের কোরান তেলাওয়াত-এর ঘটনা নিয়ে। হাজার হাজার লোক আসতে লাগল সেই মেয়েকে দেখতে; ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে শুনতে লাগল গর্ভের সন্তানের কোরান শরীফ আবৃত্তি। বলা হল সে ছেলে নামাজ পড়ে, কোরানের সূরা আওড়াতে পারে। প্রচুর পয়সা-কড়ি আসতে লাগল জনসাধারণের কাছ থেকে। কৌতূহলী কোনো কোনো দর্শকের বিশ্বাস হয়নি ব্যাপারটা, তারা অনুসন্ধান করতে শুরু করে। অবশেষে একদিন উদ্‌ঘাটিত হল জোহরা ফনার কৌশল। সে তার কাপড়ের নিচে লুকিয়ে রাখত একটি ছোট টেপ-রেকর্ডার; তারপর সুবিধেমতো চালাত আর বন্ধ করত শিশুর কণ্ঠে কোরান তেলাওয়াতের রেকর্ড। তার ফলে প্রতারণার দায়ে কারারুদ্ধ করা হয় তাকে।

সত্তরের দশকে পাশ্চাত্যের জগতে এমনি দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে ইউরি গেলার নামে ইজরায়েলের এক তরুণ সাইকিক। ইউরির জন্ম ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তেল আবিবে। তার শৈশবেই মা-বাবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, দুজনেই আবার বিয়ে করেন। ইউরি নাকি খুব ছোটবেলা থেকেই বুঝে নিতে পারত মা'র মনের কথা। ইচ্ছাশক্তিতে ঘুরিয়ে দিতে পারত ঘড়ির কাঁটা, চামচ বাঁকিয়ে ফেলত সুপ খেতে খেতে।

১৯৬৭ সালে ইজরায়েল-মিসর যুদ্ধ বাধলে ইউরিকে নাম লেখাতে হল সেনাদলে। তার পরের বছর সামরিক বাহিনী ছেড়ে সে জনসমক্ষে তার

banglainternet.com

অলৌকিক শক্তির খেলা দেখাতে শুরু করে। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে তার সাথে পরিচয় হয় আনদ্রিয়া পুহারিখ নামে আরেক অতীন্দ্রিয়ের সাধকের। প্রচার করা হল ইউরি আসলে 'মহাকাশের মানব'দের বংশধর। সে ইচ্ছেমতো বাঁকিয়ে ফেলতে পারে চামচ, চাবি, এমনকি রাস্তার বিজলির থাম; থামিয়ে দিতে পারে শূন্যে ঝোলা 'ইলেকট্রিক কার'; চোখ বেঁধে দিলেও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে ছবি আঁকতে পারে দূরের কোনো জিনিসের। গেলার বিপুল সংখ্যক দর্শকের সামনে দেখাতে লাগল তার এসব অলৌকিক শক্তির প্রদর্শনী—সারা ইউরোপ, আমেরিকায় সৃষ্টি হল আলোড়ন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ইউরির। হঠাৎ একদিন ভেঙ্গে পড়ল তার এই আশ্চর্য অলৌকিক শক্তির মুখোশ। দেখা গেল গেলার যা করছিল তা উঁচুদরের ম্যাজিক ছাড়া আর কিছুই নয়; আর তার সম্বন্ধে অনেক আজগুবি কথা প্রচার করা হয়েছিল লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য।

এমনি সব অলৌকিক শক্তির দাবিকে যে কখনো চ্যালেঞ্জ করা হয়নি তা নয়। আবরাহাম টি কাভুর নামে শ্রীলঙ্কার এক বিজ্ঞানী। জন্ম তাঁর ১৮৯৮ সালে। তিনি বিজ্ঞানের পদ্ধতি আর যুক্তিবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি চ্যালেঞ্জ দেন যদি কেউ কোনো অলৌকিক শক্তির প্রমাণ দেখাতে পারে তাহলে তাকে তিনি এক হাজার রুপি পুরস্কার দেবেন। এই টাকার অঙ্ক বাড়াতে বাড়াতে ১৯৭০ সালে করা হল এক লক্ষ রুপি। সারা পৃথিবীতে তিনি প্রচার করলেন তাঁর চ্যালেঞ্জের কথা। বাইশটি বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক ক্ষমতার যে কোনো একটি দেখাতে পারলেই তিনি এই পুরস্কার দেবেন বলে জানালেন। তার মধ্যে রয়েছে :

১. একটি সিলমোহর করা খামে রাখা নোটের নম্বর বলতে হবে।
২. সিলমোহর করে রাখা নোটের হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করতে হবে।
৩. পানির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে।
৪. জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর অন্তত ত্রিশ সেকেন্ড সময় স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।
৫. দশটি হাতের ছাপ দেখানো হবে; সঙ্গে থাকবে প্রত্যেকের জন্ম-তারিখ, জন্মের সময় আর জন্মস্থানের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ। বলতে হবে জাতক পুরুষ না নারী, জীবিত না মৃত।

ড. কাভুর বেঁচেছিলেন আশি বছরের ওপরে; কিন্তু তাঁর জীবৎকালে এই চ্যালেঞ্জ কেউ ভঙ্গ করতে পারেনি। অলৌকিক শক্তির দাবি যাঁরা করেন তাঁরা কেউই সাহস করে এগিয়ে আসেননি তাঁদের দাবিকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করতে।

অন্ধবিশ্বাস আর অবৈজ্ঞানিক ধারণার অস্তিত্ব বলা বাহুল্য শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে টিকে থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এককালে যখন সাধারণভাবে

বিজ্ঞানের বিকাশ ছিল নিম্নমানের তখন এসব ধারণা হয়তো সমাজে তেমন গুরুতর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করত না। কিন্তু আজকের দিনে যখন বিজ্ঞানের বিপুল বিকাশ ঘটেছে, বিজ্ঞানীরা এগিয়ে চলেছেন নতুন নতুন উদ্ভাবনের পথে তখন এমনি অবৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি দেখা দেয় বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে গুরুতর বৈসাদৃশ্য নিয়ে। এদেশে যে তিন-চতুর্থাংশ মানুষ একেবারে নিরক্ষর তা এই পরিস্থিতিকেই দীর্ঘস্থায়ী হতে সহায়তা করে; আজকের দিনের সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সামনে এক বিপুল পরিহাস হয়ে ওঠে।

তা বলে শিক্ষামাত্রই যে বিজ্ঞানের জ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারে সহায়তা করে তা-ও বলা যায় না। যে সনাতন শিক্ষার প্রভাব আমাদের দেশে আজো প্রবল সে শিক্ষা বরং অনেকাংশেই যুক্তিবর্জিত অন্ধবিশ্বাস, আপ্তবাক্যের প্রতি মোহগ্রস্ততা এবং স্থাণু বিশ্বদৃষ্টিকেই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

অন্ধবিশ্বাসের ঐতিহ্য এমন দীর্ঘকালীন এবং এমন দৃঢ়মূল যে তার প্রভাব কাটানো রীতিমতো কঠিন। আর এসব ধারণা যে শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। আশ্চর্য মনে হলেও সত্য যে, পাশ্চাত্য দেশের বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন অতীন্দ্রিয়ের গবেষণা নিয়ে। কেপলার, বয়েল, ফ্যারাডে, ক্রুক্স্, র‍্যালে, ল্যাজেভাঁ এঁদের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের দেশে আজো দেখা যাবে বহু বিজ্ঞানসাধক নিবিষ্টচিত্তে বিজ্ঞানের গবেষণায় নিয়োজিত থেকেও একই সঙ্গে পীরের মাজার ও মাদুলি-তাগার ওপর গভীর আস্থাশীল।

বলা বাহুল্য আজকের দিনে বিজ্ঞানের যে বিপুল বিকাশ তা এমনি অতীন্দ্রিয়ের গবেষণার মধ্য দিয়ে ঘটেনি; ঘটেছে প্রাকৃতিক জগতের ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। এই ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণই এগিয়ে নিয়ে চলেছে মানুষকে আর মানুষের সভ্যতাকে। মানুষকে দিয়েছে অভূতপূর্ব শক্তি আর প্রত্যয়। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা আর গবেষণার অগ্রগতির মধ্য দিয়েই এই প্রত্যয়ের ভিত দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে পারে। আর দেশব্যাপী বিজ্ঞানচেতনার বিস্তারের মধ্য দিয়েই কেবল এদেশের মানুষকে এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্তি দেয়া সম্ভব হবে।

সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬

[উৎস : *বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭]

banglainternet.com

জ্যোতিষ বনাম জ্যোতির্বিদ্যা

পাঁচ হাজার বছর মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে নেহাত কম সময় নয়। এই দীর্ঘকাল ধরে কোনো শাস্ত্র বা বিশ্বাস সমাজে টিকে থাকা রীতিমতো আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে। কিন্তু তাই ঘটেছে জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্ষেত্রে। জ্যোতিষ শুধু এই যে দীর্ঘ সময় ধরে টিকে আছে তা নয়, আজ বিশ শতকের শেষভাগে পৌঁছে মনে হতে পারে জ্যোতিষের যেন পুনর্জাগরণ ঘটছে।

জ্যোতিষের জয়গান জনপ্রিয় দৈনিক আর সাপ্তাহিকের পাতায় পাতায়। নানা রাশির জাতকের দৈনন্দিন ভাগ্যের ওঠা-নামার খবর পাওয়া যাবে সংবাদপত্র খুললেই। আপনার জন্মরাশি অনুযায়ী কিভাবে চললে আপনি সব বিপদ-আপদ এড়িয়ে সকল কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারবেন তার জন্য নানা সুপরামর্শ বিনামূল্যে পাওয়া যাবে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে। আর যদি আপনি কিছু মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকেন তাহলে কোনো প্রথিতযশা 'অধ্যাপক' জ্যোতিষী আপনার গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে, হস্তরেখার বিশ্লেষণ থেকে, আপনার মুখমণ্ডল পরীক্ষা করে অথবা আর কোনো অলৌকিক বা 'বৈজ্ঞানিক' উপায়ে আপনাকে দিতে পারবেন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু গূঢ় সংবাদ।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের ইতিহাস প্রায় মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের মতোই পুরনো। প্রাচীনকালে সকল শাস্ত্রের চর্চাই সীমাবদ্ধ ছিল পুরোহিতদের মধ্যে; জ্যোতিষের চর্চাও ছিল তাই। মধ্যপ্রাচ্যের যে অঞ্চলকে আজ বলা হয় ইরাক এককালে তার নাম ছিল সুমের, তারপর বিভিন্ন সময়ে এর নাম হয় ব্যাবিলনিয়া, ক্যালডিয়া আর মেসোপটেমিয়া। এই অঞ্চলে প্রথম জ্যোতিষের বিকাশ ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। এই অঞ্চলের পুরোহিতরা আকাশের নানা জ্যোতিষ্কের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন; তাঁদের কাছে মনে হয় এসব জ্যোতিষ্কের নিয়মিত ছন্দোবদ্ধ চলার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে দেবতাদের লীলা আর ওই জ্যোতির্ময় নভোলোকেই রয়েছে দেবতাদের আবাস।

মরু অঞ্চলের স্বচ্ছ আকাশমণ্ডলে দীর্ঘকালীন পর্যবেক্ষণ থেকেই সূত্রপাত জ্যোতিষচর্চার। প্রতিদিন পুবের আকাশে সূর্য ওঠে নির্দিষ্ট সময়ে, আবার পশ্চিমে অস্ত যায় আপন নিয়মে। মধ্যগগনে সূর্যের অবস্থান দিনের পর দিন ক্রমে ক্রমে সরে যায় উত্তরে, এই উত্তরায়ণ শেষে আবার মধ্যগগনের সূর্য সরতে থাকে

দক্ষিণ দিকে—ঘটে তার দক্ষিণায়ন। চাঁদের যে শুধু প্রতিদিন উদয়াস্ত ঘটে তা নয়, ক্রমে ক্রমে কলা বদলায় অমাবস্যা-পূর্ণিমা-অমাবস্যার নিয়মিত ছন্দে। এসব পরিবর্তনের নিয়ম-কানুন অনেকখানি জানতে পেরেছিলেন প্রাচীন ব্যাবিলনিয়ার পুরোহিত জ্যোতিষীরা।

চাঁদ আর সূর্যের চলাচলের ছন্দ নানাভাবে ছাপ ফেলে পৃথিবীর ওপর। সূর্যের ওঠা-নামা পৃথিবীতে আনে দিন-রাতের আবর্তন, ক্রমে ক্রমে আসে নানা ঋতুর পরিক্রমা, তার সাথে সাথে নানা ফুল-ফল-ফসল। রাতের আকাশ আলোকিত করে চাঁদ, চাঁদের কলার সাথে সাথে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে এই আলোর পরিমাণে (নদী আর সাগরের জোয়ার-ভাটার সাথে চাঁদের সম্বন্ধ সতের শতকের আগে ভালো বোঝা যায়নি)।

কিন্তু দিন-রাতের আবির্ভাব আর ঋতুর নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি ছাড়া আকাশের আর কি কিছুই বলার নেই? এ বছর বৃষ্টি বেশি হবে না কম হবে, বন্যা হলে কখন আর কী পরিমাণ আসবে? ফসল কি ভালো হবে, না অজন্মা দেখা দেবে? যুদ্ধ বা মড়ক লাগবে কি? এ বছর রানীর কি পুত্রসন্তান হবে?—এসব বিষয়ে আকাশের দেবতারা কি গ্রহনক্ষত্রের জগতে কিছু চিহ্ন প্রকাশ করেন না? প্রকাশ নিশ্চয়ই করেন, তবে তা সবাই বোঝে না। আর তা বুঝতে হলে জ্যোতিষ্কলোককে আরো গভীরভাবে পরীক্ষা করা দরকার। বিশেষ করে পরীক্ষা করা দরকার রাজার ভাগ্য আর রাজ্যের ভালোমন্দ জানার জন্য। আর সে জানার দায়িত্ব এসে বর্তায় পুরোহিতদেরই ওপর। এমনি করে পুরোহিত আর রাজজ্যোতিষীদের দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ থেকে আকাশ সম্বন্ধে বহু তথ্য উদঘাটিত হয়।

তারার জগতে গুচ্ছ গুচ্ছ তারা নিয়ে জ্যোতিষীরা কল্পনা করলেন কতগুলো মণ্ডল। আকাশে তারার মণ্ডলগুলো ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে, কিন্তু তাতে তাদের পরস্পরের অবস্থান বদলায় না, স্থির থাকে বছরের পর বছর; যুগের পর যুগ। তবে বদলায় চাঁদ আর সূর্যের অবস্থান, কেননা তারাদের রাজ্যে এরা আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলাচল করে। তাই প্রাচীন গ্রিকরা এদের নাম দেন প্লানেট (যাযাবর), ভারতীয়রা বলেন গ্রহ।

চাঁদ আর সূর্যের চলার বেগ পৃথক হলেও এরা তারাদের ভেতর দিয়ে চলে মোটামুটি একই পথে। সূর্য যত দিনে সারা আকাশে এক পাক ঘুরে আসে, ততদিনে চাঁদ ঘোরে মোটামুটি বার পাক। এ থেকেই বছর আর বার মাসের ধারণা গড়ে ওঠে। তারার জগতে সূর্যের ঘোরার পথকে ক্রমে ক্রমে বারটা ভাগে ভাগ করার ব্যবস্থা হয়। এই ভাগের শুরু সম্ভবত প্রাচীন সুমের-এ, তবে একে স্পষ্ট রূপ দেন গ্রিকরা—আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। সূর্যের বাৎসরিক পথ পরিক্রমকে বার ভাগে ভাগ করে প্রতিটি অংশকে বলা হল চিহ্ন বা

banglainternet.com

রাশি। চাঁদ এই রাশিচক্র একবার পুরো ঘুরে আসতে আসতে সূর্য একটি রাশি পেরিয়ে ঢোকে পরের রাশিতে। চেনার সুবিধের জন্য প্রতিটি রাশির তারাগুলোর মধ্যে কল্পনা করা হল কোনো প্রাণীর মূর্তি বা আর কোনো ছবি (যেমন মেষ, বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক বা তুলাদণ্ড)।

রাশিচক্র পরীক্ষা করতে করতে দেখা গেল এদের মধ্যে পাঁচটা জ্যোতিষ্ক অন্য তারাদের মতো স্থির নয়। এরা ঘোরে কিছুটা এলোমেলো পথে। এরা হল আরো পাঁচটি গ্রহ। তাদের নামকরণ হল নানা দেবতার নামে—বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, মঙ্গল আর বুধ; আগের দু'টি গ্রহ সূর্য (রবি) আর চাঁদ (সোম) ধরে সাতটি গ্রহের নামে নামকরণ হল সপ্তাহের সাতটি দিনের। সপ্তাহের সাতদিন দু'বার হলে হয় চাঁদের এক পক্ষ, কাজেই সাতটি গ্রহ থাকা এই হিসেবের জন্য বেশ যুৎসই মনে হল। প্রাচীন ভারতীয়রা অবশ্য আরো দু'টি গ্রহ কল্পনা করেছিলেন– তারা হল রাহু আর কেতু।

এসব গ্রহ রাশিচক্রের মধ্যে নিয়ে এল নানা জটিলতা। চাঁদ যতদিনে আকাশে ৩৬৩ বার ঘুরে আসে ততদিনে শনি ঘোরে মাত্র একবার। সূর্য আর চাঁদ সব সময় আকাশে তারার পটভূমিতে পশ্চিম থেকে পুবে চলে বলে মনে হয়, অথচ অন্য গ্রহগুলো পশ্চিম থেকে পুবে যেতে যেতে কখনো হঠাৎ যেন দিক পাল্টে ছোটে উল্টো দিকে অর্থাৎ পুব থেকে পশ্চিমে—একে বলা হয় গ্রহের বক্রগতি। শনি রাশিচক্রে এক পাক ঘুরে আসতে আসতে তার এমনি বক্রগতি ঘটে ২৯ বার।

জ্যোতিষীরা তাঁদের কল্পনার ছোপ লাগিয়ে আকাশের ঘটনার সাথে পৃথিবীর ঘটনার যোগাযোগ স্থাপন করতে শুরু করলেন। হয়তো ঘটল কোনো অসাধারণ বা বিরল ঘটনা—যেমন একটি গ্রহণ। ক্রমে ক্রমে আকাশ থেকে মুছে গেল চাঁদ, কিংবা ঘটল আরও বিরল দৃশ্য—ধীরে ধীরে অন্ধকারে ঢেকে গেল উজ্জ্বল তেজঢালা সূর্য। এসবের ফল কি কখনো মানুষের জন্য শুভ হতে পারে? নিশ্চয়ই পৃথিবীতে নেমে আসবে কোনো বড় রকমের দুর্যোগ। জ্যোতিষীদের এসব ব্যাখ্যা শুনে গ্রহণ দেখলেই ভীষণ ভয় পেত মানুষ।

কিন্তু লোকে কি জ্যোতিষীদের কথা নেহাত অকারণেই বিশ্বাস করত? গ্রহণের পর কি দুর্যোগ কিছুই ঘটত না? হ্যাঁ, ঘটত নিশ্চয়ই। যে বছর গ্রহণ হত সে বছর অনেক দুর্যোগ ঘটত। আসলে গ্রহণ না লাগলেও প্রতি বছর দুনিয়ার নানা জায়গায় ঘটে চলেছে নানা দুর্যোগ। জ্যোতিষীরা সুবিধেমতো দুর্যোগগুলোকে গ্রহণের ফল বলে চালিয়ে দিতে লাগলেন।

গ্রহণের আসল কারণ বুঝতে জ্যোতিষীদের খুব দেরি হয়েছিল তা মনে হয় না। চাঁদের সব গ্রহণই হয় এমন অবস্থায় যখন চাঁদ আর সূর্য থাকে পৃথিবীর দুই

বিপরীত দিকে—অর্থাৎ চাঁদ পড়ে পৃথিবীর ছায়াতে। সূর্যের গ্রহণ লাগে এমন সময়ে যখন সূর্য আর চাঁদ দুই-ই থাকে আকাশের একই জায়গায়—অর্থাৎ সূর্য ঢাকা পড়ে চাঁদের আড়ালে। চাঁদ আর সূর্যের গতিপথের হিসেব থেকে চাঁদের গ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে শিখেছিল মানুষ অনেক আগেই। সূর্যগ্রহণের হিসেব করা কিছুটা কঠিন, কিন্তু তাও শিখেছিলেন সেই প্রাচীন পুরোহিত জ্যোতিষীরা।

জ্যোতিষীরা তাঁদের এসব হিসেবের পদ্ধতি নিজেদের মধ্যে আগলে রাখতেন। সাধারণ লোককে কি এসব দৈবজ্ঞানের অংশীদার করা যায়?—একে তো সাধারণ লোক বুঝবে না এসব হিসেব, তার ওপর অপাত্রে দৈবজ্ঞান দান করলে শুধু যে বিদ্যারই অসম্মান হবে তা নয়—পুরোহিতদের মর্যাদাও ক্ষুণ্ন হবে। অবশ্য রাজজ্যোতিষী হবার ঝুঁকিও যে না ছিল তা নয়। একটি চীনা কাহিনীতে আছে প্রাচীনকালে চীন দেশে একদিন অকস্মাৎ এক গ্রহণ দেখা দেয়। রাজজ্যোতিষীরা আগে থেকে এ বিষয়ে সম্রাটকে কিছু জানাননি। গ্রহণ যখন ঘটে গেল তখন খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেল দুই রাজজ্যোতিষী সি আর হো অতিরিক্ত মদ্যপান করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। সম্রাট গ্রহণ দেখে প্রথমে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, যখন সম্বিত ফিরে পেলেন তখন কর্তব্যে অবহেলার জন্য জ্যোতিষীদের গর্দান নেবার হুকুম দিলেন। প্রজারা ভাবল অপদার্থ জ্যোতিষীদের উচিত সাজা হয়েছে। ইতিহাসে একটি সূর্যগ্রহণ বিখ্যাত হয়ে আছে। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এশিয়া মাইনরে এক যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর অকস্মাৎ আকাশের সূর্যকে অন্ধকার গ্রাস করতে থাকে। যুদ্ধ চলছিল পশ্চিমে লিডিয়া আর পুবে মিডিয়া রাজ্যের মধ্যে। এই দৈবদুর্যোগ থেকে দু'দলের সেনাপতিরাই বুঝলেন এ যুদ্ধ দেবতাদের মনঃপূত নয়। কাজেই গ্রহণ কেটে যাবার সাথে সাথে দু'দলের মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল। এরপর লিডিয়া-মিডিয়া আর কখনো যুদ্ধ করেনি।

আধুনিক জ্যোতির্বিদরা হিসেব করে বের করেছেন সেকালে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ঘটেছিল ৫৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মে তারিখে। কাজেই এই লিডিয়া-মিডিয়া যুদ্ধকে সবচেয়ে প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা বলা যেতে পারে। সে সময়ে গ্রিক পণ্ডিত থেলিস নাকি এই গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট তারিখ বলতে পারেন নি, বলেছিলেন ঐ বছর গ্রহণ হবে। জানা যায় তিনি যৌবনকালে ব্যাবিলনিয়া সফর করেছিলেন, আর হয়তো সেখানকার পুরোহিতদের কাছেই শিখেছিলেন গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করার আঁকজোখের কৌশল।

banglainternet.com

সেকালে এমনি দারুণ চমক সৃষ্টি করত ধূমকেতুর আবির্ভাব। গ্রহণ দেখা দেয় অল্পক্ষণের জন্য, কিন্তু ধূমকেতু আকাশে ঝুলে থাকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, কখনো মাসের পর মাস। তাছাড়া গ্রহণের ছায়া সুষম বৃত্তের অংশ, কিন্তু ধূমকেতু দেখতে উদ্‌ভট আকারের, গোল মাথা, লম্বা লেজ—যেন একটা বিশাল তলোয়ার ঝোলানো আকাশে।

সবচেয়ে বড় কথা হল সূর্যগ্রহণ কবে হবে তার মোটামুটি হিসেব প্রাচীনকালেও মানুষ করতে শিখেছিল, কিন্তু ধূমকেতু দেখা দিত আচমকা—কেউ তার ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত না (জ্যোতির্বিদরা কোনো কোনো ধূমকেতুর চলাচলের হিসেব করতে পেরেছেন মাত্র ১৮ শতকে)। এসব কারণে গ্রহণের চেয়ে ধূমকেতুকে বড় রকম দুর্যোগের লক্ষণ বলে মনে করা হত।

১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে নরম্যান্ডির উইলিয়ম ইংল্যান্ড আক্রমণের আয়োজন করছিলেন। এমনি সময়ে আকাশে দেখা দিল এক ধূমকেতু (আজ আমরা একে বলি হ্যালির ধূমকেতু : ৭৬ বছর পর পর এটা ঘুরে আসে)। ইংল্যান্ডের স্যাক্সনরা ধূমকেতু দেখে ভাবল তাদের জন্য ঘনিয়ে এসেছে চরম দুর্যোগ। রাজা হ্যারল্ড মুষড়ে পড়লেন, তাঁর ভীতসন্ত্রস্ত সৈন্যরা হেরে গেল হেস্টিংসের যুদ্ধে। নরম্যানরা ইংল্যান্ড অধিকার করল।

এমনি ঘটেছিল ১৫১৭ সালে মেক্সিকোতে এক ধূমকেতুর আবির্ভাবে। আজটেক সম্রাট মকটেজুমা প্রাচীন সংস্কারের বশে ভাবলেন তাঁর রাজ্যের জন্য ঘনিয়ে এসেছে চরম দুর্যোগ। এই হতোদ্যমের সুযোগ নিয়ে স্পেনীয় অভিযাত্রী হারনান কর্টেজ মাত্র চারশ জন সশস্ত্র সেনা নিয়ে ধ্বংস করলেন দশ লক্ষ অধিবাসীর প্রাচীন আজটেক সভ্যতা।

এভাবে জ্যোতিষ ক্রমে ক্রমে মানুষের মনে এই ধারণা গড়ে তোলে যে, আকাশের ঘটনা দিয়ে পৃথিবীতে কী ঘটতে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। শুধু জানতে হবে জ্যোতিষিক সংকেত, গ্রহ-নক্ষত্রের যোগাযোগের জ্ঞান। আর সে জ্ঞান আয়ত্ত করা এমন কিছু অসাধ্য ব্যাপার নয়। সূর্যকে অন্ধকার গ্রাস করার অর্থ হল রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি অদৃশ্য হওয়া, তলোয়ারের মতো লেজওলা ধূমকেতুর আবির্ভাব হল যুদ্ধ-বিগ্রহ আর পতনের পূর্বলক্ষণ। এর আগে যখন মকর রাশিতে শুক্রের উদয় হয়েছিল তখন যদি দেখা দিয়ে থাকে দুর্ভিক্ষ তাহলে এবারও ঘটবে তাই।

প্রাচীন ব্যাবিলনিয়া, ভারত আর চীনে জ্যোতিষচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত পুরোহিত আর রাজ-রাজড়াদের মধ্যে। রাজদরবারে রাখা হত রাজজ্যোতিষী। রাজ্যশাসনের নীতির বিষয়ে তাঁরা রাজাদের পরামর্শ দিতেন, সবরকম গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের জন্য শুভক্ষণ স্থির করে দিতেন (আজও অনেক দেশে এভাবেই

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়)। কিন্তু আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে গ্রিকদের সময় জ্যোতিষের গায়ে লাগল গণতন্ত্রের হাওয়া, জ্যোতিষীদের সাহায্য নিয়ে লোকের ব্যক্তিগত ঠিকুজি রাখার রেওয়াজ চালু হল। গ্রীসে খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকে ক্লডিয়াস টলেমিয়াস (সংক্ষেপে টলেমি) সেকালে প্রচলিত জ্যোতিষের জ্ঞানকে সংহত করেন। তাঁর ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব প্রায় চৌদ্দশ' বছরের অপ্রতিহত প্রতাপের পর ষোল-সতের শতকে কোপের্নিকাস, কেপলার প্রমুখের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদের সামনে ধ্বসে পড়ে। কিন্তু টলেমি যে জ্যোতিষ গণনা পদ্ধতি চালু করেছিলেন তার প্রভাব পাশ্চাত্যে বা আমাদের দেশে আজো অব্যাহত রয়েছে।

গ্রহদের মধ্যে সূর্য হল সবচাইতে উজ্জ্বল, তাই সূর্যকে বলা হয় গ্রহপতি। স্বভাবতই মানুষের ভাগ্যের ওপর সূর্যের প্রভাব হবে সবচাইতে বেশি। কাজেই জাতকের জন্মের মুহূর্তে সূর্যের অবস্থান কোন রাশিতে ছিল সেটাই জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের মুহূর্তে সূর্য যদি থেকে থাকে তুলা রাশিতে তাহলে তার মন-মেজাজ ধীরস্থির যুক্তিবাদী হওয়াই সম্ভব, আর যদি থেকে থাকে সিংহ রাশিতে তাহলে জাতক নিশ্চয়ই হবে সিংহের মতো বীর। এমনিভাবে জানতে হবে জন্মের মুহূর্তে চাঁদ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহের অবস্থান। এসব জানলে নির্দিষ্ট করে বলা যাবে জাতকের ভূত-ভবিষ্যৎ।

প্রাচীনকালে লোকের কাছে মনে হত আকাশের জ্যোতিষ্করা হল দৈব গুণসম্পন্ন ছোটখাট আকারের বস্তু—আর পৃথিবী থেকে তাদের অবস্থান তেমন দূরে নয়। বুলেটের চেয়ে বিশগুণ জোরে ছুটেও 'ভয়েজার' নভোযানের শনিগ্রহে গিয়ে পৌঁছতে চার বছর সময় লাগতে পারে, একথা প্রাচীন জ্যোতিষীরা কল্পনাও করতে পারতেন না। তারামণ্ডলগুলোতে তাঁরা কল্পনা করেছিলেন নানা জীব-জন্তুর আকার, আর প্রতিটি মণ্ডল বা রাশির প্রভাব ধরা হত এইসব কল্পিত মূর্তির গুণাগুণের অনুরূপ। কিন্তু বিভিন্ন রাশির তারাগুলো আপাতদৃষ্টিতে গুচ্ছবদ্ধ বলে মনে হলেও পৃথিবী থেকে প্রতিটি মণ্ডলের বিভিন্ন তারার দূরত্বে রয়েছে আকাশ-পাতাল তারতম্য—একথাও তাঁদের কাছে কখনো ধরা পড়েনি।

তবে সেই প্রাচীনকালের সকলেই যে জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি বলে মেনেছিলেন তা নয়। গ্রীস দেশেই এপিকুরিয়ান নামে একদল পণ্ডিত জ্যোতিষ মানতেন না, তাঁরা বলতেন আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের চলাচল ঘটে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে, তার সাথে দেবতাদের খেয়াল-খুশির মোটেই কোনো সম্পর্ক নেই। এমনি জ্যোতিষের বিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছে ইহুদী ও ইসলাম ধর্মে। আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে আল-বেরুনী (৯৭০-১০৪৮) জ্যোতির্বিদ্যার ওপরে ৭০টি বই লিখেছিলেন, তার মধ্যে একটির নাম ছিল 'জ্যোতিষের মিথ্যা

banglainternet.com

ভবিষ্যদ্বাণীর বিরুদ্ধে সতর্কবাণী।' তাতে তিনি দেখান যে, জ্যোতিষীরা গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের ভিত্তিতে ভাগ্য নির্ণয়ের দাবী করলেও তাদের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী।

কিন্তু এসব বিরোধিতায় তেমন কোনো ফল হয়নি। জ্যোতিষশাস্ত্র বিস্তার লাভ করতে করতে পৌঁছায় ষোল-সতের শতকে। টলেমির ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের প্রবল সম্মোহন কাটিয়ে অবশেষে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। এই জ্যোতির্বিদ্যার যাঁরা প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন জ্যোতিষে বিশ্বাসী—যেমন তাইকো ব্রাহে ও কেপলার। বরং বলা চলে, জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি শাখাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে বিকশিত হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে। কেপলারকে ধরা যেতে পারে এই রূপান্তরের সঙ্গমস্থল হিসেবে।

নিউটনের বিজ্ঞানচর্চারও সূত্রপাত বিশ বছর বয়সে জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি বই থেকে। বইটি তিনি ১৬৬৬ সালে মেলা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন কৌতূহলের বশে। এ বই-এর একটি ছবি বোঝার জন্য দরকার হয় ত্রিকোণমিতির, তাই তিনি একটি ত্রিকোণমিতির বই কেনেন। সেই বইয়ের জ্যামিতির অংশ বোঝার জন্য তিনি পড়তে শুরু করেন ইউক্লিডের জ্যামিতি। এর দু-তিন বছরের মধ্যেই নিউটন বিস্ময়কর নতুন নতুন আবিষ্কার করতে আরম্ভ করেন।

সতের শতকের আগে পর্যন্ত প্রধানত জ্যোতিষীরাই করতেন জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধির হিসেব করাকে বলা হত গণিত-জ্যোতিষ, আর গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান জেনে তার ফলাফলের ভিত্তিতে ভাগ্য গণনাকে বলা হত ফলিত-জ্যোতিষ। কিন্তু সেকালে এই শাস্ত্রের চর্চায় জ্ঞানের এলাকাতে ছিল প্রচুর ফাঁক, তাই সে ফাঁক ভরাট করা হয়েছিল প্রচুর ধোঁয়াটে কল্পনা দিয়ে। সতের শতকের শুরুতে দূরবীনের আবিষ্কার হয়। কোপের্নিকাস, কেপলার, গালিলিও, নিউটন প্রমুখের নানা বিস্ময়কর আবিষ্কার জ্যোতির্বিদ্যার চর্চাকে এক নতুন বৈজ্ঞানিক ভিতের ওপর দাঁড় করায়। এদিকে জ্যোতিষশাস্ত্র সেই যে টলেমির বিশ্বতত্ত্ব আঁকড়ে ধরে ছিল, তার বেশি আর এগোতে পারল না। বিজ্ঞানের অব্যাহত অগ্রগতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জ্যোতিষ ক্রমে পরিণত হল এক অপবিদ্যায়।

খবরের কাগজে যে রাশিফলের বিবরণ বেরোয় তাতে লেখা থাকে মেষ রাশির জাতকের জন্য ২১ মার্চ থেকে ২০ এপ্রিল, তারপর আসে বৃষ রাশি ইত্যাদি। আসলে প্রাচীন গ্রিকদের সময়ে সূর্য আকাশে মেষ রাশিতে প্রবেশ করত ২১ মার্চ তারিখে, কিন্তু আজ আর তা করে না। পৃথিবীর আবর্তন অক্ষের ধীর গতির জন্য সূর্যের বিভিন্ন রাশিতে ঢোকার সময় ক্রমে ক্রমে বদলে যায়।

সূর্যের উত্তরায়ণ ঘটতে ঘটতে এক সময় সূর্য আপাতদৃষ্টিতে খ-বিষুব রেখা অতিক্রম করে; এই দিনে মহাবিষুব, পৃথিবীতে দিন-রাত হয় সমান। সাধারণত আমাদের বর্ষপঞ্জিতে এটা পড়ে ২১ মার্চ তারিখে। তারাদের পটভূমিতে পৃথিবীর আবর্তন-অক্ষ যদি সম্পূর্ণ স্থির থাকত তাহলে প্রত্যেক মহাবিষুবে সূর্যের অবস্থান হত তারার রাজ্যে একই জায়গায়। কিন্তু পৃথিবীর বিষুব অঞ্চলটা সামান্য একটু ফুলে-ওঠা, এর ওপর চাঁদের অসমান আকর্ষণের ফলে পৃথিবীর আবর্তন-অক্ষ ক্রমে ক্রমে অতি সামান্য সরে যায়, আর তার ফলে মনে হয় উত্তরের খ-মেরু যেন দীর্ঘ সময় ধরে একটি বৃত্তাকার পথ তৈরি করছে। খ-মেরুর এমনি বৃত্ত তৈরি সম্পূর্ণ হয় ২৫,৭৮০ বছরে।

পৃথিবীর আবর্তন-অক্ষের এই ধীর পরিবর্তনের ফলে খ-বিষুবের অবস্থান বদলে যেতে থাকে। তার ফলে সূর্য সবচেয়ে উত্তরে আর সবচেয়ে দক্ষিণে যে জায়গায় পৌঁছয় সেই অয়ন-বিন্দুও ধীরে ধীরে সরে যায়। একে বলা হয় 'অয়ন-চলন'। আর এর ফলে মহাবিষুবের সময় আকাশে সূর্যের অবস্থান পশ্চিম দিকে খুব সামান্য একটু করে সরে যাচ্ছে বলে মনে হয়। মহাবিষুবের সময় পৃথিবী থেকে দেখায় সূর্য খ-বিষুবে অতিক্রম করছে রাশিচক্রের বারটা ভাগের এক ভাগ। এই অতিক্রমের স্থান ২৫,৭৮০ বছরে ক্রমে ক্রমে সরতে সরতে বারটা রাশি পার হয়ে আবার আগের জায়গায় পৌঁছয়। অর্থাৎ মহাবিষুবের সময় সূর্যের অবস্থানকাল প্রতিটি রাশিতে গড়পড়তা ২,১৫০ বছর। আকাশে তারার রাজ্যে বিভিন্ন রাশির মধ্যে কোনো স্থির সীমারেখা টানা নেই, কাজেই ঠিক কোন মুহূর্তে সূর্য এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে ঢুকছে সেটা অনেকটাই জ্যোতির্বিদদের মধ্যে বোঝাপড়ার ব্যাপার।

প্রাচীনকালে সুমেরবাসীরা যখন প্রথম জ্যোতিষশাস্ত্র সৃষ্টি করে তখন মহাবিষুবের সময় সূর্য থাকত বৃষ রাশিতে। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে যখন গ্রিকরা ব্যাপকভাবে জ্যোতিষের চর্চা শুরু করে তখন মহাবিষুবের সময় সূর্য দেখা যেত মেষ রাশিতে। তাই গ্রিকরা মেষ রাশি দিয়ে রাশিচক্রের হিসেব শুরু করে। টলেমি-সংকলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে মেষ রাশি ধরা হয় ২১ মার্চ থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত। কিন্তু আজকের জ্যোতিষীরা যখন এই টলেমির হিসেব মেনে চলেন তখন তাঁরা এটা মোটেই হিসেবের মধ্যে আনেন না যে, তারপর আরো দু'হাজার বছর কেটে গিয়েছে, আর আজ মহাবিষুব ঘটছে মেষ রাশিতে নয়, মীন রাশিতে। অর্থাৎ আজ তাঁরা রাশির সাথে মাসের তারিখের যে হিসেব দেখাচ্ছেন, আকাশের তারার জগতের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তার মোটেই কোনো মিল নেই। আরো কয়েক শতাব্দী পরে মহাবিষুব ঘটবে মীন রাশিতেও নয়, কুম্ভ রাশিতে।

banglainternet.com

সমস্যা যে শুধু জন্মতারিখের সাথে যথার্থ রাশির সম্পর্ক স্থির করার তা নয়, সমস্যা জন্মতিথিতে গ্রহ-নক্ষত্র সমাবেশের তাৎপর্য নির্ণয়েও। আজ পৃথিবীর লোকসংখ্যা বাড়তে বাড়তে পাঁচশ' কোটি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। দেশে দেশে প্রতিদিন জন্মাচ্ছে সাড়ে তিন লাখ শিশু, দিন-রাতের প্রতি সেকেন্ডে জন্মাচ্ছে অন্তত চারজন শিশু। তাহলে এই মুহূর্তে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে জন্মানো চারজন জাতকের বিধিলিপিও কি হবে একই? পৃথিবীর নানা জায়গায় জন্মানো শিশুর কথা বাদ দেয়া থাক, একই সময়ে জন্মানো দুই যমজ শিশুর বেলায় কী হবে? জন্ম মুহূর্তে গ্রহ-নক্ষত্রের যোগাযোগে তাদের চরিত্র বা গুণাগুণ, ভাগ্য বা আয়ুষ্কাল একই রকম হবার কথা, কিন্তু আদৌ তা হয় কি? বাস্তবে দেখা যায় একই সময়ে জন্মানো যমজ দুই শিশুর মধ্যে হয়তো একজনের মৃত্যু ঘটছে শৈশবে অথচ অন্যজন বেঁচে থাকছে দীর্ঘকাল ধরে।

কিন্তু এসব সমস্যার সমাধান নিয়ে জ্যোতিষীদের তেমন দুশ্চিন্তা নেই কেননা টলেমির পর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে জ্যোতিষের বিকাশ। এদিকে গত দু'হাজার বছরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে, বিশেষ করে ষোল-সতের শতক থেকে শুরু করে জ্যোতির্বিজ্ঞান এগিয়েছে বিপুল বেগে। অয়ন-চলন, সৌরজগতে অসংখ্য নতুন উপগ্রহ আবিষ্কার, গ্রহাণু ও ধূমকেতুর রহস্যভেদ, বর্ণালিবীক্ষণ ও বেতার-দূরবীনের সাহায্যে নক্ষত্রলোকের চরিত্র উদ্‌ঘাটন, গ্রহলোকে নভোযানের অভিযান, মহাবিশ্বে এক্স-রে উৎস, কোয়াসার, পালসার, বিস্ফারমান গ্যালাক্সি ইত্যাদি বিস্ময়কর নতুন তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্যোতিষীরা নির্বিকার। এসব বিষয়ে তাঁদের কিছুমাত্র বক্তব্য বা ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু তবু জ্যোতিষের জনপ্রিয়তায় যে ঘাটতি ঘটছে তা নয়। এমনকি ধনকুবেরের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আজ জ্যোতির্বিদের সংখ্যা যত তার চেয়ে জ্যোতিষীর সংখ্যা হবে অন্তত দশ গুণ বেশি। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রগাঢ় বিশ্বাস আজো অটুট জ্যোতিষশাস্ত্রে এবং এমনি অজস্র ধরনের কুসংস্কারে।

আসলে এসব মানুষকেও বোধ হয় দোষ দেয়া যায় না। অজ্ঞানতা থেকেই জন্ম কুসংস্কারের। পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব থেকেই দেখা দেয় মানুষের নিজের ওপর অবিশ্বাস আর তার ফলে জন্মায় অতীন্দ্রিয় আর দৈবের ওপর নির্ভরতা। অর্থনৈতিক সংকট জনমনে যে গভীর হতাশার জন্ম দেয় তা-ও এর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। ধনবাদী সমাজে জ্যোতিষীরা শুধু মানুষের এই হতাশা আর বিশ্বাসপ্রবণতারই সুযোগ নিয়ে থাকেন। তাঁদের সহায়তা করেন এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম। সংবাদমাধ্যমে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানের প্রচার যতটা হয়, জ্যোতিষের অপবিদ্যা আর বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় তার চেয়ে অন্তত

একশ গুণ বেশি। এ অবস্থায় সাধারণ মানুষদের মধ্যে একটা বড় অংশের জ্যোতিষের ওপর নির্ভরশীল না হওয়াই বরং আশ্চর্য।

বিজ্ঞানের এই বিপুল অগ্রগতির যুগেও মানুষের মনে অন্ধকারের বাসাকে আলোকিত করে তোলা যে মোটেই সহজসাধ্য নয় জ্যোতিষের জনপ্রিয়তা তার একটি জলজ্যান্ত প্রমাণ।

নভেম্বর, ১৯৮১

[উৎস : *বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭]

banglainternet.com

বিজ্ঞান-বিপ্লব ও বিজ্ঞান-লেখক

বাংলাদেশের একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি একবার ঘোষণা করেছিলেন : বিপ্লব আমাদের দরজার ভেতর এক পা বাড়িয়েছে, ঘরে ঢুকে পড়ল বলে!—তিনি কোন বিপ্লবের কথা ভেবেছিলেন, তার আবির্ভাবের সম্ভাবনায় তাঁর মনে উল্লাস বা আতঙ্কজাতীয় কোনো বিশেষ ভাব দেখা দিয়েছিল কিনা তা আমাদের জানা নেই।

তবে আমাদের জানামতে একটি বিপ্লব সারা পৃথিবীতে তোলপাড় সৃষ্টি করলেও বাংলাদেশে পৌঁছবার জন্য আজো পথ খুঁজে মরছে; সে হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব। সহজেই বোঝা যায় আঠার শতকের ইংলন্ডে বুর্জোয়া বিপ্লবের সাথী হয়ে যে শিল্প-বিপ্লব দেখা দিয়েছিল তারই অনুসরণে এই নামটি। শিল্প-বিপ্লবের ফলে সেদিনের ইংলন্ডে উৎপাদন পদ্ধতির বিপুল বিকাশ ঘটেছিল; ১৭৮৩ সালে জেম্‌স্ ওয়াট-এর স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কারকে সচরাচর এই বিপ্লবের প্রতিভূ হিসেবে ধরা হয়। ক্রমে ক্রমে আঠার আর উনিশ শতক জুড়ে সে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকায়। আজ বিশ শতকে দেখা দিয়েছে এমনি আরেক বিপ্লব—তাকেই বলা হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব।

ষোল আর সতের শতকের ইউরোপে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা আর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানুষের বিশ্বদৃষ্টিতে ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছিল। আইজাক নিউটন ছিলেন এই বিজ্ঞান-বিপ্লবের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি; আজও তাঁকে ধরা হয়ে থাকে সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানী হিসেবে। তেমনি বিশ শতকের প্রথম ভাগে নানা মৌলিক আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানে ঘটেছে আরেক বিপ্লব। পরমাণুর অন্তর্লোকের গঠন, বস্তু আর শক্তির অভিন্ন সত্তা, আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, আলোকের দ্বৈতরূপ—ইত্যাকার নানা আবিষ্কার মানুষের জ্ঞানলোকে যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে আইনস্টাইনকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে ধরা হয়ে থাকে।

আঠার-উনিশ শতকের শিল্প-বিপ্লব আর আজকের দিনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের মধ্যে একটা বিষয়ে বেশ সাদৃশ্য দেখা যাবে। উভয় ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের তত্ত্বের আবিষ্কার রূপান্তরিত হয়েছে উৎপাদন বিকাশের অগ্রগতিতে। এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে প্রধানত বিজ্ঞানের সাথে প্রযুক্তির মেলবন্ধনের ফলে। আর

সেই মেলবন্ধন থেকে উদ্ভব ঘটেছে বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য আরো নতুন, আরো শক্তিশালী নানা উপকরণ।

শিল্প-বিপ্লব থেকে আমরা শুধু যে স্টিম ইঞ্জিন পেয়েছি তা নয়, সাধারণভাবে উদ্ভব ঘটেছে শিল্পে যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি; কয়লা, তেল প্রভৃতি শক্তির নতুন উৎস; শক্তিচালিত যাতায়াত ব্যবস্থা; অসংখ্য নতুন নতুন রাসায়নিক দ্রব্য। যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি সৃষ্টি করেছে পণ্যসামগ্রীর বিপুল প্রাচুর্য, উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ করেছে বিনিময় আর যোগাযোগ, জ্বালানি ও যন্ত্রের শক্তি লাঘব ঘটিয়েছে দুঃসহ কায়িক শ্রমের—মানুষের জীবনে এনেছে স্বাচ্ছন্দ্য।

তবু সে শিল্প-বিপ্লব কাজে লাগিয়েছিল মূলত বস্তুর বাইরের এলাকার শক্তিকে। বস্তুর গভীরে নিহিত যে শক্তি তাকে কাজে লাগাবার জন্য মানুষকে অপেক্ষা করতে হয়েছে বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য। আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব নির্ভরশীল বস্তুর অন্তরতম লোকের রহস্যের ওপর : পরমাণু-কেন্দ্রের সূক্ষ্ম কণিকার বিনাশ থেকে লভ্য শক্তি, অর্ধপরিবাহী বস্তুতে ইলেকট্রন কণিকা স্থানান্তরের নিয়ম কাজে লাগিয়ে তৈরি কমপিউটার, জীবকোষের গভীর কন্দরে লুকানো জিন-কণার পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন গুণাগুণসম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভাবন—বিজ্ঞানের এ ধরনের অসংখ্য কীর্তির ফলাফল আজ প্রসারিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবনেও।

এসব বৈশিষ্ট্যের একটা মোট ফল এই যে, শিল্প-বিপ্লব মানুষের জীবনে যে বিপুল রূপান্তরের সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব তার চেয়েও বড় রকম উত্তরণের সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই উত্তরণ শুধু ইতিমধ্যে মানুষের অধিকারের এলাকা গভীর সাগরতল থেকে মহাকাশের সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত করেনি, সবার জন্য এক প্রাচুর্য ও আনন্দময় পৃথিবী সৃষ্টির যে স্বপ্ন মানুষ দেখেছে চিরকাল, তাকেও আজ অবশেষে এর মাধ্যমে বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব হয়ে উঠেছে।

এখানে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই সকলের মনে দেখা দেবে। বাংলাদেশের মতো একটি পিছিয়ে-পড়া উন্নয়নশীল দেশে এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের তাৎপর্য কী? যে দেশে অধিকাংশ অধিবাসী এখনো সামন্তযুগীয় পরিবেশে বাস করে, শিল্প-বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকাংশ উপকরণ যাদের জীবনে আজো লভ্য নয়, অনাহার-অস্বাস্থ্য-অশিক্ষা যাদের নিত্যসঙ্গী তাদের কাছে বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির মূল্য কী?

এ প্রশ্নের জবাব দু'ভাগে দেয়া যেতে পারে। এ কথা সত্যি যে, ইউরোপের বুর্জোয়া সমাজ তাদের দেশে উৎপাদন বিকাশের স্বার্থে পৃথিবীর দিকে দিকে

banglainternet.com

উপনিবেশ স্থাপনে মনোনিবেশ করেছিল। এসব উপনিবেশকে তারা দেখেছিল প্রধানত তাদের কলকারখানার জন্য কাঁচামালের যোগানদার হিসেবে এবং উৎপন্ন সামগ্রীর ক্রেতা হিসেবে। এই প্রক্রিয়ায় উচ্চ মুনাফাই ছিল তাদের লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে উপনিবেশে উন্নত শিল্প স্থাপন তাদের স্বার্থের অনুকূল ছিল না, তাই তা তারা হতে দেয়নি। অবশ্য শিল্প-বিপ্লবের কিছু ফলাফল—যেমন রেল-স্টিমার, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি—উপনিবেশে স্থাপন করতে হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনেরই প্রয়োজনে এবং এভাবে উপনিবেশগুলো শিল্প-বিপ্লবের আওতার বাইরে থাকতে পারেনি। এসেছে ভেতরে, তবে এ আসা অনেকটা যেন উনুনের ভেতর জ্বালানি আসার মতো—যে জ্বালানির প্রধান ভূমিকা হল নিজে জ্বলে-পুড়ে উনুনে তাপ সঞ্চার করা।

এই অসম সম্পর্কের একটা অনিবার্য ফল হয়েছে এই যে, উপনিবেশ আর তার পোষক এই দুইয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাল্লা ক্রমেই এক পাশে ভারী হয়ে উঠেছে। ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটবার আগে সে দেশ আর ভারত উপমহাদেশের মধ্যে জীবনযাত্রার মানে এমন কিছু প্রভেদ ছিল না। বিশ শতকের শুরুতে অর্থাৎ বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের আগে প্রভেদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল প্রায় আট গুণ। অথচ আজ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিলেতের সাথে মাথাপিছু আয়ের পার্থক্য প্রায় আশি গুণ। বলা বাহুল্য এই প্রভেদ ঘটেছে প্রধানত বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং উৎপাদন-শক্তি বিকাশের তারতম্যেরই কারণে।

কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, এই প্রভেদ যদি দূর করতে হয়, অন্তত যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনতে হয়, তাহলে তা-ও করতে হবে মূলত বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে। আজকের বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি বিপ্লবে অংশীদার না হয়ে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ জনগণের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি আনবে এবং আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে এ কথা কল্পনা করা যায় না। আমরা এই বিপ্লবে অংশীদার হতে চাই বা না-চাই উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো আমাদের তাতে অংশীদার করবেই আর সে ভূমিকা হবে ওই উনুনে জ্বালানির ভূমিকার মতো।

বিশ শতকের প্রথমার্ধকে ধরা যেতে পারে বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রস্তুতিকাল হিসেবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ঘটেছে মূলত এই বিপ্লবের বিকাশ। মনে রাখতে হবে এই বিকাশকালেই এদেশে বড় ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনেরও সূত্রপাত হয়েছে। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রের সংগ্রাম, জাতীয়তাবোধের বিকাশ, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাকার নানা ঘাত-প্রতিঘাত বয়ে গিয়েছে এ দেশের ওপর দিয়ে।

কিন্তু এসবের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবে অংশগ্রহণ বা তার ফলাফল কাজে লাগাবার বিষয়টি কি কখনো প্রাধান্য পেয়েছে? পেয়েছে বলতে পারলে আমরা সুখী হতাম। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, অন্তত সচেতনভাবে কখনো পায়নি।

তবে কি পেয়েছে অচেতনভাবে?—তা খুব সম্ভব পেয়েছে। আমরা ভাষা আন্দোলনের সময় বলেছি মাতৃভাষার মাধ্যমে এদেশের মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের কথা; স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আশ্বাস দিয়েছি স্বাধীন দেশে প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধিময় নতুন জীবনের—দেশের সব মানুষের জন্য জুটবে অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, স্বস্তি ও আনন্দ। এর কোনোটাই লভ্য হবার উপায় নেই বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির প্রয়োগ ছাড়া। কাজেই প্রচ্ছন্নভাবে আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কথা ভেবেছি নিশ্চয়ই।

কিন্তু দুনিয়াজোড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব আজকের পৃথিবীকে যে পর্যায়ে নিয়ে এসেছে তাতে এক্ষেত্রে এমন প্রচ্ছন্ন চিন্তার কোনো স্থান নেই। ভাষা আন্দোলন বা স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই উত্তাল দিনগুলোতে এদেশের মানুষের কাছে আমরা যে অঙ্গীকার করেছিলাম তা রক্ষা হতে পারে শুধু বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনের মূল ভূমিকায় বসানোর মধ্য দিয়ে।

বলাই বাহুল্য বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে মূল ভূমিকায় বসানো মানে বেদীতে স্থাপন করে পুজো করা নয়, তাদের লাগাতে হবে মানুষের কাজে। মুনাফা-লোভী পুঁজিতন্ত্র যেমন বিজ্ঞানের বিপুল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানববিধ্বংসী ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন করছে অথবা বাতিল হয়ে যাওয়া কলকব্জা বা বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পাঠিয়ে চারপাশের পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে তা-ও নিশ্চয়ই আমাদের লক্ষ্য হবে না। বরং আমরা এ ধরনের মানবতাবিরোধী উদ্যোগকে প্রতিহত করে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে প্রয়োগ করব এ দেশের সব মানুষের জীবন আর পরিবেশকে সমৃদ্ধ, সুন্দর আর আনন্দময় করে তোলার জন্য। শিল্প-বিপ্লব আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের অংশীদার না হতে পারার ফলে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের জীবনমানের পার্থক্য আজ ক্রমেই বেড়ে উঠছে; আমাদের লক্ষ্য হবে এই প্রক্রিয়াকে ঘুরিয়ে দেয়া। দেশের সব মানুষের জন্য যথেষ্ট খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য সুবিধে, যাতায়াত ব্যবস্থা আর আনন্দের উপকরণ যোগানো। আর ক্রমে ক্রমে আমাদের জীবনমান উন্নত করে অন্তত উন্নত দেশের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া।

বিজ্ঞান-লেখকদের ভূমিকাকে দেখতে হবে এই পরিপ্রেক্ষিতেই।

বিজ্ঞান-লেখকরা সত্যি কি কিছু করতে পারেন এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য? তাঁদের শক্তি কতটুকুই বা! আসলে কি সমগ্র ব্যাপারটি রাষ্ট্রীয় নীতির আওতায় পড়ে না?

banglainternet.com

পড়ে—এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নীতি অস্পষ্ট রয়েছে বলে কোনো দেশে লেখকরা কলম বন্ধ রেখেছেন এমন কথা কখনো শোনা যায়নি। বরং সকল কালে বিজ্ঞানীরা তাঁদের লব্ধ জ্ঞানকে অকৃপণ হাতে মানুষের মধ্যে প্রসারিত করেছেন। গূঢ় তত্ত্বের উপাসক ঐন্দ্রজালিক আর মধ্যযুগীয় যাজক শ্রেণীর সাথে বিজ্ঞানীদের এখানেই একটা বড় রকম প্রভেদ।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক সভ্যতার স্বর্ণযুগের অনেক আগে লিপির আবিষ্কার হলেও তখন পর্যন্ত কাগজের আবিষ্কার হয়নি। লেখা দুঃসাধ্য ছিল বলেই সেকালে কথোপকথনের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চারই ছিল প্রাধান্য। কিন্তু তবু অ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রি. পূ.) প্রকৃতিবিষয়ক বহু রচনা দীর্ঘকাল সমগ্র মানবসভ্যতার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এমনি বহু শতাব্দী ধরে ব্যাপকভাবে পঠিত হয়েছে দ্বিতীয় শতকের গ্রিক জ্যোতির্বিদ টলেমির রচনা। এঁদের দুজনেরই অনেক মতামত পরবর্তীকালে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে অনুগামীদের অন্ধতার জন্য এঁদের দায়ী করা সঙ্গত কিনা তা বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।

মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগেও দেখি ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭), আল বেরুনী (৯৭৩-১০৫১) প্রমুখ পণ্ডিতজন চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইবনে সিনা একশ'র বেশি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—তার কোনো কোনোটি পাঁচ, দশ বা বিশ খণ্ডে সমাপ্ত। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর আল-কানুন ফিত-তিব (চিকিৎসা-বিধি) প্রায় সাতশ বছর ধরে ইউরোপের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোক-তত্ত্বের জনক বলে পরিচিত সমসাময়িক পদার্থবিদ ইবনুল হাইসাম (৯৬৫-১০৩৯) যেসব বই লেখেন তা ষোড়শ শতকে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে দা-ভিঞ্চি, কেপলার, নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গবেষণায় ছাপ ফেলেছিল বলে জানা যায়।

অতীতের বিজ্ঞানীদের এসব লেখালেখি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশে ঘটেছে তাও নয়। অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীদের বক্তব্য প্রচলিত সামাজিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অ্যানাক্সাগোরাসের মতামত মনঃপূত হয়নি বলে এথেন্সের নগরপতিরা তাঁর বিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন; সুহৃদ পেরিক্‌লসের চেষ্টায় অল্পের জন্য তাঁর জীবন রক্ষা পায়। দশম শতকের শুরুতে বাগদাদে একদল সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানীকে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রচারের জন্য ইখওয়ানুস সাফা (পবিত্রতা ও আন্তরিকতার সংঘ) নামে গোপন সংঘ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। জোয়ার-ভাটা, ভূমিকম্প, জলবায়ু ও পরিবেশের পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেন; এ ধরনের অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই সে সময়

প্রকাশ্যে প্রচার করা নিরাপদ ছিল না। খলিফার রোষবহ্নি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইবনুল হাইসামকে মস্তিষ্কবিকৃতির ভান করতে হয়েছে, ইবনে সিনাকে আত্মগোপন করতে হয়েছে বারবার।

আধুনিককালেও বিজ্ঞানীর সাহসী কণ্ঠস্বর শুনি আমরা কোপের্নিকাস, গালিলিওর কণ্ঠে। গালিলিও তাঁর বক্তব্য শুধু পণ্ডিতী ভাষা ল্যাটিনে প্রকাশ করেননি, জনগণের কাছে নিয়ে গিয়েছেন তাঁদের বোধ্য ইতালীর ভাষায়। নির্যাতনের মুখে নতজানু হয়েও বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে উচ্চারণ করতে শুনি, 'তবু যে পৃথিবী ঘুরছে!' ধর্মযাজকদের প্রবল বিরোধিতার মুখে ডারউইনকে দেখি লিখে চলেছেন ক্রমাগত। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁর ক্রমবিকাশের তত্ত্ব। বিপুল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সে তত্ত্ব পৃথিবীর বুকে জীবনের বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানের বহু অন্ধকার গুহাকে ক্রমান্বয়ে আলোকিত করে তুলেছে।

আরো আধুনিককালে দেখি আলবার্ট আইনস্টাইন ব্যাখ্যা করছেন আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, মানুষকে সচেতন করে তুলছেন পরমাণু-যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে; লিখে চলেছেন জেমস জিনস, বারট্রান্ড রাসেল, জর্জ গ্যামো, জে বি এস হলডেন, জে ডি বার্নাল, কার্ল ফন ফ্রিশ, পি এম এস ব্ল্যাকেট, আর্থার সি ক্লার্ক, ফ্রেড হয়েল, আইজাক আজিমভ, কার্ল সাগান—এমনি অসংখ্য বিজ্ঞানী। তাঁদের কেউ ব্যাখ্যা করেছেন বিজ্ঞানের তত্ত্ব, কেউ সে সব তত্ত্বের সামাজিক গুরুত্ব, আবার কেউ মানুষকে সচেতন করেছেন বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিপদ সম্পর্কে।

এ সব বিজ্ঞানীরা স্পষ্টতই নানা মেজাজের লেখা লিখেছেন। কেউ লিখেছেন গবেষণাধর্মী রচনা, গবেষণাকর্মের বিবরণ দেয়াই তার প্রধান উদ্দেশ্য। সমমনা বিজ্ঞানীরা সে রচনার উদ্দিষ্ট পাঠক। কেউ লিখেছেন প্রধানত শিক্ষামূলক বই। কেউবা সহজ ভাষায় পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন অতি সাধারণ পাঠকের কাছে; বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের চিন্তা ও দৃষ্টির বিস্তার ঘটানোই তার প্রধান উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান সম্পর্কে এই সচেতনতা সৃষ্টির অবলম্বন হিসেবে কেউ হয়তো আশ্রয় নিয়েছেন বৈজ্ঞানিক কল্প-কাহিনীর। আবার কারো রচনায় দেখা যাবে এসব একটি-দুটি বৈশিষ্ট্যের মেশামেশি।—এর মধ্যে কোন ধরনের রচনা আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সব চাইতে বেশি প্রয়োজন?

খুব সাদামাটা হিসেবে ফেললে বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : ১. গবেষণাধর্মী, ২. সম্প্রচারমূলক ও ৩. সাহিত্যধর্মী। বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চা

banglainternet.com

ছাড়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির আর কোনো সহজ পথ নেই—এ বিষয়ে কেউ আজ তেমন দ্বিমত পোষণ করবেন না। ভাষা আন্দোলনের পরবর্তীকালে এই চর্চার প্রধান বাহন হবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা—এ বিষয়েও অন্তত প্রকাশ্যে সকলে সায় দেবেন বলে মনে করি। কিন্তু তারপরও লেখকের সুনির্দিষ্ট ভূমিকাটি কী হবে সে প্রশ্ন তবু ওঠে। কোনটার ওপর প্রধান গুরুত্ব দেয়া যথার্থ হবে : গবেষণা, সম্প্রচার অথবা সাহিত্য?

সন্দেহ নেই যে, গবেষণাই বিজ্ঞানের প্রাণ। কোনো বিজ্ঞানী যখন তাঁর গবেষণা থেকে নতুন কোনো তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কার করেন তখন তা বিজ্ঞান পত্রিকাতেই প্রকাশ করেন। পৃথিবীতে প্রথম বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৬৫০ সালে। তারপর দু'শ বছরে পত্রিকার সংখ্যা বেড়ে প্রায় হাজারের অঙ্কে পৌঁছয়। আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণা পত্রিকার সংখ্যা লাখ খানেক। প্রতি বছর এসব পত্রিকায় প্রায় এক কোটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইউনেস্কোর হিসেব অনুযায়ী সারা দুনিয়ায় বিজ্ঞানীর সংখ্যা আজ প্রায় চার কোটি, তার মধ্যে মোটামুটি বার শতাংশ সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত গবেষণায়।

বিজ্ঞান গবেষণার দিক দিয়ে বাংলাদেশ যে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ নিচের সারিতে তা না বললেও চলে। তবে এ দেশেও আজ বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে কয়েক ডজন গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আমাদের জনসম্পদ সারা দুনিয়ার জনসংখ্যার প্রায় দু'শতাংশ, কিন্তু বিজ্ঞানীর সংখ্যা সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানী সংখ্যার মাত্র আটশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ মোটামুটি পঞ্চাশ হাজার। এঁদের মধ্যে প্রায় দশ শতাংশ বা পাঁচ হাজার নিয়োজিত গবেষণায়; তবে সারা বছরে তাঁদের প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা হাতের আঙুলে গোনা যায়। স্পষ্টতই ভাষা আন্দোলনের আত্মদান বাংলা ভাষায় গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশের ক্ষেত্রে তেমন কোনো অগ্রগতির সূচনা করতে পারেনি।

সে হিসেবে বাংলা ভাষায় সম্প্রচারমূলক রচনার ক্ষেত্রে তৎপরতা অনেক বেশি লক্ষ্যযোগ্য। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের যেটুকু ছিটেফোঁটা স্পর্শ এসে লেগেছিল এ দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজে তাতেই তাঁদের কেউ কেউ বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজন বুঝতে পেরেছিলেন অন্তর দিয়ে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১) যথাক্রমে 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞান বিষয়ে নিয়মিত রচনা প্রকাশ করতে থাকেন। এই শতকের শেষে সার্থক বিজ্ঞান লেখক হিসেবে দেখা দেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৩-১৯১১); তাঁর 'প্রকৃতি' (১৮৯৬) ও 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪) বই দুটি সেকালে রীতিমতো সাড়া জাগায়।

প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষায় প্রথম গবেষক-লেখকের মর্যাদা যুগ্মভাবে জগদীশ-চন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) আর প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪)-এর প্রাপ্য। বাংলাদেশে কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) ও মুহাম্মাদ কুদরাত-এ খুদা (১৯০০-১৯৭৭)-কে এ পথের পথিকৃৎ বলা যায়। তবে তাঁরাও যে শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্যের বর্ণনায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছেন তা নয়। জগদীশচন্দ্রের 'অব্যক্ত' (১৯২১) বা কাজী মোতাহার হোসেনের 'সঞ্চরণ' (১৯৩৭) বই দুটির অনেক রচনাতেই সাহিত্য-রসের স্বাদ রয়েছে। জিজ্ঞাসার 'নিয়মের রাজত্ব', অব্যক্তের 'উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু', 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' বা সঞ্চরণের 'কবি ও বৈজ্ঞানিক', 'বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান-সাধনা', 'অসীমের সন্ধানে' এবং এ জাতীয় অনেক রচনা শুধু যে বিজ্ঞানের তত্ত্বপিপাসু পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করেছে তা নয়, আরো অনেক বাঙালি পাঠককেই বিজ্ঞানের বিচিত্র জগতের রসাস্বাদনে সহায়তা করেছে।

একই সঙ্গে গভীর বিজ্ঞান-রস এবং গভীর সাহিত্য-রসের স্বাদ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞানের গবেষণায় অংশগ্রহণ করেননি; কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব পৌঁছে দেবার জরুরি তাগিদ অনুভব করেছিলেন। তারই ফল হিসেবে এই আশ্চর্য রসসমৃদ্ধ বইটি তিনি রচনা করেন ছিয়াত্তর বছর বয়সে।

আসলে ভাষার সৌকর্য বিজ্ঞান-বিষয়ক সকল রচনারই একটি বিশেষ গুণ বলা যেতে পারে। সেদিক থেকে বিজ্ঞান-লেখকদের জন্য গবেষণা, সম্প্রচার ও সাহিত্যকে পুরোপুরি পৃথক করা শক্ত। বলা যেতে পারে প্রভেদটা মূলত ঝোঁকের। বিজ্ঞান-লেখক মাত্রই সম্ভবত কিছুটা পরিমাণে গবেষক—কতখানি তা প্রধানত তাঁর ব্যক্তিগত প্রস্তুতি, প্রবণতা ও রচনাভঙ্গির ওপর নির্ভরশীল। আবার কোনো বিজ্ঞান গবেষক যখন তাঁর গবেষণার ফলাফল লিখে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেন তখন তাঁকে সাহিত্যের আশ্রয় নিতে হয় বই কি।—কতটা তা নির্ভর করে তিনি কাদের জন্য কী ভঙ্গিতে লিখছেন তার ওপর। যদি রচনাটি হয় সহকর্মী গবেষকদের জন্য তাহলে সচরাচর তাতে সাহিত্যের ভাগ থাকে সামান্য; আর যদি হয় সাধারণ পাঠকের জন্য আর সে পাঠকের প্রতি লেখক যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হন তাহলে রচনা সুবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক করার জন্য তিনি প্রায়শ সাহিত্যরসের আশ্রয় নিতে চেষ্টা করেন।

এখানে একটা কথা উঠবে : গবেষণা যদি আগে না এগোয় তাহলে বিজ্ঞানের রচনা কি যথেষ্ট প্রসার লাভ করতে পারে? কিংবা অন্যভাবে বললে, আগে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে তারপরই কি বিজ্ঞানের তত্ত্ব সম্প্রচারে মনোনিবেশ করা উচিত নয়? এটা সত্যি যে, সার্থক গবেষক-বিজ্ঞানী যদি বিজ্ঞান সম্প্রচারে

banglainternet.com

আত্মনিয়োগ করেন তাহলে তাঁর রচনায় পাঠকের বিশ্বাস স্থাপন সহজ হবে। আইনস্টাইন, হলডেন বা কার্ল সাগানের রচনার জনপ্রিয়তার পেছনে নিঃসন্দেহে এই সত্যটি অনেকখানি কাজ করেছে। কিন্তু গবেষক-বিজ্ঞানীরা যে সবাই জনপ্রিয় রচনায় এঁদের মতোই সিদ্ধহস্ত হবেন তার নিশ্চয়তা নেই। সেজন্যই রবীন্দ্রনাথের মতো 'অবিজ্ঞানী' যখন বিজ্ঞান রচনার ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন তখন তার মূল্য কিছুমাত্র কম মনে হয় না।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের বিজ্ঞান রচনা স্বভাবতই এদেশের জনগণের জীবনের সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এসব রচনা শুধু এদেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে এমন কোনো কথা নেই। আসলে বিজ্ঞান তো কোনো দেশ ও জাতির সীমারেখা মেনে চলে না; সারা দুনিয়ার সকল বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ঐতিহ্যে সব দেশের মানুষের সমান অধিকার। আগুন বা চাকা যাঁরা প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা যদি পেটেন্ট বা আর কোনো উপায়ে এসবের প্রয়োগের ওপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করতেন তাহলে কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হত সেকথা আজ কল্পনা করাও শক্ত।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি সৃষ্টিশীল বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। কিন্তু সেজন্য যথোপযুক্ত পরিবেশ এবং দেশের মানুষের সক্রিয় সমর্থন প্রয়োজন। বিজ্ঞান-সচেতন মানুষই কেবল এই সমর্থন যোগাতে পারে। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের আবিষ্কার উদ্ভাবনকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের জন্যও চাই দেশের মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তার। সে দিক থেকে দেখলে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের গবেষণা এবং সাধারণ মানুষের বিজ্ঞানচেতনা দুর্বল বলেই বরং জনগণকে সচেতন করে তোলার জন্য জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনা আরো বেশি করে প্রয়োজন। এ দেশের সকল দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানকর্মী এ বিষয়ে সচেতন হলে দেশের অগ্রগতি হয়তো ত্বরান্বিত হত।

আসলে বিজ্ঞান-লেখকের দায়িত্ব তো শুধু বিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশন করা নয়। সেই সাথে দেশের উন্নয়নের অনুকূল সুস্থ, বিজ্ঞাননিষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টিতে বাধা দেয় যেসব শক্তি তাদের সচেতনভাবে প্রতিহত করারও প্রয়োজন রয়েছে।

একটি প্রতিকূল প্রভাব তো অবশ্যই সনাতন অশিক্ষা ও অজ্ঞতা, সামন্তযুগীয় ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কার। এসব অতিক্রম করতে হলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চাই দেশব্যাপী সাধারণ শিক্ষার বিস্তার। এই শিক্ষাবিস্তার

এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত কুশলতার বিকাশ না ঘটলে এ দেশের সকল উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য।

সেই সাথে রয়েছে নানা মহল থেকে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞান-বিরোধী উদ্যোগ। এর মধ্যে প্রকাশ্য উদ্যোগের চেয়ে বরং প্রচ্ছন্ন আয়োজনগুলোই বেশি ক্ষতিকর। বিজ্ঞান আজ এমন সফল বলেই চতুর্দিকে চলছে নানা স্বার্থে তাকে ব্যবহার করার চেষ্টা। যিনি পাখির ঠোঁটে ভাগ্য গণনা করেন বা হস্তরেখা দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দেন তিনিও দাবি করেন যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এসব করা হয়ে থাকে। ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র যে একটি বিজ্ঞান এই ঘোষণা সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন ও খবরের শিরোনামে ঘন ঘন জানানো হয়ে থাকে এই গোয়েবলসীয় আশায় যে, বারবার বললে লোকের মনে নিশ্চয় বাঞ্ছিত প্রত্যয় জন্মাবে। রাস্তার ধারে নানা জড়িবুটি টোটকা ওষুধ বিক্রি করেন যে ফেরিওয়ালা তিনিও দু'তিন রকম তরল পদার্থের মিশেল দিয়ে রসায়নের ভেলকি দেখাতে ছাড়েন না। এসবকে বিজ্ঞান বলা যায় না, বড়জোর বলা যেতে পারে অপবিজ্ঞান। এমনি অপবিজ্ঞানের কুজ্ঝটিকায় ছেয়ে আছে সারা দেশ।

এর চেয়ে আরো সূক্ষ্ম উদ্যোগও রয়েছে। বিজ্ঞান মূলত পরীক্ষা ও যুক্তির ভিত্তিতে প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের পদ্ধতি। পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ পাওয়া যায় না এমন বহু বিষয় বিজ্ঞানের আওতায় এনে উদ্যোগী ব্যক্তিরা সৃষ্টি করেন পরাবিজ্ঞানের লীলাক্ষেত্র। চাঁদের আকর্ষণে জোয়ার-ভাটা হয়; কাজেই তাতে চাকরির পদোন্নতি যদি নাও হয়, উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে প্রভাব নিশ্চয় পড়বে; পড়বে না যে তার প্রমাণ কি? ইউএফও বা অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তুদের নিয়ে গত কয়েক দশকে সারা দুনিয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি পরাবিজ্ঞানীদের জন্য পরম লোভনীয় পরিস্থিতি। এরিক ফন দানিকিন নামে একজন জার্মান লেখক মানুষের নানা প্রাচীন সভ্যতার স্থাপত্যকীর্তিকে ভিন্ন গ্রহের আগন্তুকদের পদচিহ্ন বলে দাবি করে প্রায় আধ ডজন বই লিখেছেন এবং নানা ভাষায় সে সব বই বিক্রি করে মুনাফাও করেছেন প্রচুর। অনেক ক্ষেত্রে পরাবিজ্ঞান বিজ্ঞানকে নিয়ে যায় অধ্যাত্মবাদের পথে। পাশ্চাত্যের কোনো কোনো দেশে 'ক্রিশ্চান সায়েন্স' আজ এক বড় রকম আন্দোলনের রূপ নিয়েছে।

আরো এক ধরনের উদ্যোগ হল আধুনিক সভ্যতার সব সমস্যার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে দায়ী করা। মুনাফা-শিকারী শিল্পপতিরা চারপাশের পরিবেশে নির্বিচারে বিষাক্ত বস্তু নিক্ষেপের ফলে পরিবেশ দূষিত হয়ে মানুষ বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে—সে দোষ যেন বিজ্ঞানের। উন্নত স্বাস্থ্যবিধির কল্যাণে রোগব্যাধি নির্মূল হয়ে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঘটছে এবং তাতে পৃথিবীর বস্তুসম্পদে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে—তার জন্যও বিজ্ঞানই দায়ী। প্রচণ্ড বিধ্বংসী মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের

banglainternet.com

ফলে সমগ্র মানবসভ্যতা ধ্বংসের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে—তার সমাধান হিসেবে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বর্জন করে সেই প্রাচীন তপোবনে ফিরে যাবার।—এসব তৎপরতা প্রকৃত সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে; তাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে চায় প্রকৃত বিজ্ঞান থেকেও।

অনাহার আর অস্বাস্থ্য মানুষের মৃত্যু ঘটায় এ আমরা সবাই জানি। কিন্তু সেই সাথে মানুষের মৃত্যু ঘটায় অজ্ঞানতা, কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসও। যারা মরে না তারাও এই অজ্ঞতার বিষবাষ্পে হয়ে থাকে জীবন্মৃত। এমনি জীবন্মৃত মানুষ কখনো দেশের অর্থনৈতিক বা সামাজিক উন্নয়নের অংশীদার হতে পারে না। একমাত্র প্রকৃত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোকই মানুষকে দিতে পারে পৃথিবী ও তার পরিবেশ সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, আর এক সমৃদ্ধ নতুন পৃথিবী সৃষ্টির দৃঢ় প্রত্যয়।

পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞান-লেখকরা চিরকাল জ্ঞানের জগৎকে প্রসারিত করেছেন; সেই সাথে তাঁরা আলোকিত করেছেন মানুষের চিত্তকে, সংগ্রাম করেছেন সামাজিক অগ্রগতির জন্য, সুগম করেছেন আরো অসংখ্য গবেষক বিজ্ঞানকর্মীর আবির্ভাব, এগিয়ে দিয়েছেন মানুষের সভ্যতার সীমানা। বিজ্ঞানের গবেষণার জগৎ আর ব্যাপক সমাজের সংস্কৃতি-কর্মকাণ্ডের মধ্যে তাঁরা সৃষ্টি করেছেন যোগসূত্র। এই হল বিজ্ঞান-লেখকের ঐতিহ্য।

বিজ্ঞান-লেখক মূলত একই সঙ্গে বিজ্ঞানী ও লেখক—হয়তো কেউ প্রধানত বিজ্ঞানী, কেউ প্রধানত লেখক। পৃথিবীতে সর্বকালে বিবেকবান লেখকরা যে কোনো পরিস্থিতিতে মানুষের পক্ষ নিয়েছেন। বাংলাদেশের বিজ্ঞান-লেখকদের সামনেও আজ সেই একই ঐতিহাসিক দায়িত্ব—বিজ্ঞানের তত্ত্ব আর তথ্য দিয়ে অভিষিক্ত করতে হবে দেশের মানুষকে। সেজন্য চাই আরো বেশি বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা—নানা ধরনের রচনা। আগামী দিনে বিজ্ঞানের আলোকধারায় স্নাত মানুষ উদ্যোগী হবে আধুনিককালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবকে আলিঙ্গন জানাতে। আর তার মধ্য দিয়ে এ দেশের সকল মানুষের জন্য সূত্রপাত ঘটবে এক নতুন জীবনের।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান-লেখকের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। এদেশের বিজ্ঞান-লেখকরা আজ এই লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন: এতেই বোঝা যায় তাঁরা তাঁদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। এই সচেতনতা কর্মের উদ্দীপনায় রূপান্তরিত হোক এই কামনা জানাই।

এপ্রিল, ১৯৮৫

[উৎস : *বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭]

মানুষ ও তার পরিবেশ

পরিবেশের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক সে এক অতি নিবিড় অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। বরং বলা চলে মানুষ আপন পরিবেশেরই সৃষ্টি এবং তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। অবিচ্ছেদ্য শুধু এজন্য নয় যে, মানুষকে বাদ দিলে পরিবেশের আজকের এ রূপ আর থাকে না, আসলে তার পরিবেশকে বাদ দিলে মানুষের অস্তিত্বই হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য। মানুষ একই সঙ্গে তার পরিবেশের সৃষ্টি এবং স্রষ্টা। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে রহস্যজনক মনে হবে; কিন্তু তবু কথাটা সত্যি।

বলছিলাম পরিবেশ থেকেই মানুষের সৃষ্টি। কথাটা স্পষ্ট করা যেতে পারে। দীর্ঘকালের জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি পৃথিবীর পরিবেশ এককালে ছিল কেবল জড়বস্তুর সমাবেশ। এই জড়বস্তু প্রাথমিক অবস্থায় কোন রূপে ছিল—সে কি ছিল উত্তপ্ত অগ্নিময়, অথবা শীতল গ্যাসপুঞ্জ? এসব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আজো মতের অমিল আছে; কিন্তু আদি পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধতা নেই।

প্রাণের আবির্ভাব কী করে ঘটেছে সে ইতিহাস দীর্ঘ এবং রোমাঞ্চকর। তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, সাধারণভাবে আজকের বিজ্ঞানীদের মতে জড়বস্তুর সংগঠন ক্রমে ক্রমে উন্নত ও সুসংগঠিত হবার ফলেই প্রাণবস্তুর উদ্ভব। এই উদ্ভবের পরও জীবদেহে বস্তুর সংগঠন ক্রমাগত পরিবর্তিত, রূপান্তরিত ও সুসংগঠিত হয়ে চলেছে। পরিবেশের তাপ, চাপ, আলোড়ন, সংঘাত, আলোক, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তির তাড়না তাতে প্রভাব বিস্তার করে নানাভাবে। এভাবেই অতি সরল উদ্ভিদ থেকে শুরু করে ক্রমে ক্রমে আজকের পত্র-পুষ্প-ফল-শোভিত বিচিত্র উদ্ভিদজগতের সৃষ্টি হয়েছে। তেমনি অতি ক্ষুদ্র নগণ্য প্রাণী থেকে ক্রমে ক্রমে রূপান্তর, অভিযোজন, উদ্বর্তন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে উদ্ভব ঘটেছে উন্নত থেকে উন্নততর প্রাণীর। অবশেষে মানুষে এসে পরিণতি লাভ করেছে তার চরম বিকাশ। মানুষের মস্তিষ্কই এ পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত, সবচেয়ে জটিল এবং সবচেয়ে সৃজনশীল বস্তুসংগঠন।

এই ক্রমবিকাশের ধারায় কেটে গিয়েছে বহু কোটি বছর। অধিকাংশ পরিবর্তন ঘটেছে ধীর গতিতে ধাপে ধাপে। কখনো জীবদেহে অনেক পরিবর্তন দীর্ঘকাল থেকেছে সুপ্ত; আবার কখনো প্রজননের সম্ভাবনা বৃদ্ধির ফলে কোনো পরিবর্তন

banglainternet.com

স্থায়ী রূপ নিয়েছে। আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে চার্লস ডারউইন দক্ষিণ আমেরিকার বিজন গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে আশ্চর্য হন তেরটি বিভিন্ন প্রজাতির ফিঙ্গে দেখে। এসব প্রত্যেক প্রজাতির ঠোঁটের গড়ন ভিন্ন। এমনি বিভিন্ন আকার সহায়ক বিভিন্ন ধরনের ফুলের বীজ, পোকামাকড় বা আর কোনো ধরনের খাদ্য সংগ্রহে। ডারউইন বুঝতে পারলেন স্থল থেকে দূরে বিভিন্ন দ্বীপের আবদ্ধ পরিবেশের বৈশিষ্ট্যই এসব ফিঙ্গের ঠোঁটের গড়নে এই বৈচিত্র্যের জন্ম দিয়েছে। এ থেকেই তাঁর যুগান্তকারী ক্রমবিকাশ তত্ত্বের সূত্রপাত।

এমনি বিভিন্নতা পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মধ্যেও দেখা যাবে। প্রাচীনকালের আর্য বা অনার্য কিংবা আজকের দিনের ককেশীয়, মঙ্গোলয়েড বা নিগ্রোদের দেহবৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের প্রাকৃতিক প্রভাবের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে গায়ের রঙ, উচ্চতা, নাক বা চোখের গড়ন, চুলের ধরন ইত্যাদি নানা উপাদান।

পরিবেশের ওপর শুধু যে মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যই নির্ভরশীল তা নয়। পৃথিবীর নানা অঞ্চলের লোকের পোশাক, আবাস, কৃষি, পশুপালন, শিল্প উৎপাদন, সংস্কৃতি আর চিন্তাচেতনাও অনেক পরিমাণে গড়ে উঠেছে সে সব অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ ধরনের ভূপ্রকৃতি, বস্তুসম্পদ ও জলবায়ুর ওপর ভিত্তি করে। নানা দেশের মানুষের মনে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি প্রভৃতি মহৎ বৃত্তির অনেকটাই গড়ে ওঠে দেশের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের প্রভাবে।

একই কথা একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কেও প্রযোজ্য। কোনো দেশে জনগণের জীবিকার পদ্ধতি কী হবে, কী ধরনের কৃষি বা শিল্প প্রাধান্য লাভ করবে তা একান্তই নির্ভরশীল সে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বস্তুগত সম্পদের লভ্যতার ওপর। আরবের ঊষর মরুভূমিতে লোকের জীবনযাত্রার যে ধারা গড়ে উঠেছে তার সাথে—ধর্মীয় ঐক্য সত্ত্বেও—বাংলাদেশের কোমল পলিমাটির আশ্রয়ে গড়ে-ওঠা মানুষের জীবনযাত্রা ও মানসিকতার সর্বাংশে মিল খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি কার্ল মার্কস বলেছিলেন, 'মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভর করেই বাঁচে। ...মানুষ যত বেশি বিশ্বজনীন হয় তত বেশি বিশ্বজনীন হয় জৈব পরিবেশের ওপর তার নির্ভরতার এলাকা। যে বিশ্বজনীনতা সমগ্র প্রকৃতিকে তার অজৈব দেহে পরিণত করে তাই হল মানুষের বিশ্বজনীনতার প্রকৃত রূপ। কেননা প্রকৃতি হল তার জীবনের প্রত্যক্ষ উপাদান এবং জীবনযাপনের বস্তু, অবলম্বন ও হাতিয়ার।' (কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'রচনাবলী', ইংরেজি সংস্করণ, খণ্ড ৩, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৬, পৃ. ২৭৫-৭৬)।

পরিবেশ থেকে আমরা দিবারাত্রি দুহাত ভরে গ্রহণ করলেও এই গ্রহণের মাত্রা যে কত বিশাল সে সম্পর্কে আমরা সব সময় সচেতন নই। হিসেব করে দেখা গিয়েছে, বর্তমানে প্রতিবছর নানা ধরনের উৎপাদনের কাজে মানুষ পৃথিবীর জৈব ও অজৈব বস্তুসম্পদ ব্যবহার করে দশ হাজার কোটি টনের ওপরে—অর্থাৎ মাথাপিছু অন্তত বিশ টন। এই শতাব্দী শেষ হতে হতে মানুষের প্রাকৃতিক বস্তুসম্পদের প্রয়োজন দাঁড়াবে হয়তো এর দ্বিগুণ; কারো কারো মতে তিনগুণ।

এককালে মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবীর বস্তুসম্পদ অফুরন্ত। সাধারণভাবে লোকে মনে করত সূর্যের কিরণ পৃথিবীতে আলো আর উত্তাপ দিয়ে যাবে অনন্তকাল; আর তেমনি অনন্তকাল ধরে পাওয়া যাবে বিশুদ্ধ বায়ু, ঝরনার সুপেয় পানি, বনের মিষ্ট ফল, ক্ষেতের ফসল আর অজস্র আকরিক। কিন্তু আজ এ ধারণায় বড় রকম চিড় ধরেছে। আজ দেখা যাচ্ছে মানুষ পরিবেশে হাত লাগিয়ে নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনছে।

এককালে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ছিল কম। মানুষ ছিল প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক। কিন্তু মানুষের চরিত্রই এই যে, সে পরিবেশে পরিবর্তন ঘটাতে চেষ্টা করে—চায় পরিবেশকে তার জীবনযাপনের জন্য ক্রমাগত আরো অনুকূল করে তুলতে। এজন্য বৈরী প্রকৃতিকে বশ করে করে মানুষকে এগোতে হয়েছে, ব্যবহার করতে হয়েছে পরিবেশের নানা বস্তুসম্পদ। ক্রমে ক্রমে যে পরিমাণ বস্তুসম্পদ মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি বস্তুসম্পদ সে সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে।

পাথরের অতি সাধারণ হাতিয়ার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানুষের সভ্যতার অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে উন্নততর হাতিয়ার নির্মাণ আজ থেকে আট-দশ হাজার বছর আগে সম্ভব করে তোলে কৃষি ব্যবস্থা—শুরু হয় কৃষি বিপ্লব। এভাবে ক্রমাগত উন্নত থেকে উন্নততর হাতিয়ারের উদ্ভব ঘটতে থাকে। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধিও দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে আরম্ভ করেছে। অবশেষে এসেছে ১৮-১৯ শতকের শিল্প-বিপ্লব। এই শিল্প-বিপ্লব অভূতপূর্ব বস্তুগত সমৃদ্ধি মানুষের আয়ত্ত করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করার ফলে এসব উপাদানের ভাণ্ডার যে সসীম এ সম্পর্কে মানুষকে আজ সচেতন হয়ে উঠতে হয়েছে।

আমাদের চারপাশে রয়েছে এক হাওয়ার সাগর; বলা চলে আমরা এই হাওয়ার সাগরে ডুবে আছি। এই হাওয়া—বিশেষ করে এর অক্সিজেন ছাড়া আমাদের জীবন একেবারে অচল। আমাদের জীবন ধারণের জন্য দৈনিক অন্তত এক কেজি খাবার আর দু'কেজি পানি দরকার, তার সাথে দরকার প্রায় বিশ কেজি হাওয়া। খাবার সংগ্রহের জন্য আমাদের রীতিমতো খাটতে হয় বলে খাবারের চাহিদার

banglainternet.com

কথা আমরা বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারি; কিন্তু হাওয়া পাই আমরা প্রায় বিনা পরিশ্রমে, তাই এই প্রয়োজনটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়।

মানুষের জন্য যেমন হাওয়া প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন কল-কারখানা ও মোটরযানের জন্য। একজন মানুষ সারা বছর যতখানি হাওয়া ব্যবহার করে, একটি মোটরযান ততটা হাওয়া ব্যবহার করে মাত্র এক হাজার কিলোমিটার পথ চলতে—খুব অল্পস্বল্প ব্যবহার করলেও মাত্র এক মাসে। অর্থাৎ একটি মোটরযান হাওয়ার অক্সিজেন ব্যবহার করে অন্তত দশ-পনের জন মানুষের সমান পরিমাণ। পৃথিবীতে আজ মোটরযানের সংখ্যা পঞ্চাশ কোটির ওপরে; কাজেই এসব মোটরযান যে পরিমাণ অক্সিজেন নিঃশেষ করছে তা মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যবহৃত অক্সিজেনের চেয়েও বেশি। বলাবাহুল্য কল-কারখানা যে অক্সিজেন নিঃশেষ করছে তা যোগ করলে এর পরিমাণ হবে আরো অনেক বেশি। এভাবে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের ভাণ্ডার শেষ হবার ফলে তাতে বাড়ছে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ। আর এই পরিমাণ যত বাড়ে তত সূর্যের তাপ বায়ুমণ্ডলে আটকে থাকে।

বায়ুমণ্ডলে কিছুটা কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রয়োজন উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরির জন্য। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এই পরিমাণ বেড়ে উঠেছে বিপজ্জনক হারে। বিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল প্রতি লক্ষ ভাগে ৩০ ভাগ, বর্তমানে এই হার হয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪ ভাগ।

বিজ্ঞানীরা বলছেন এই শতাব্দীর শেষে এই হার বেড়ে হয়তো হয়ে দাঁড়াবে লক্ষ ভাগে ৪০ ভাগ। একদল বিজ্ঞানী বলছেন এর ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়তে বাড়তে একুশ শতকে এমন এক সময় আসতে পারে যখন উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর বিশাল বরফভাণ্ডার গলতে আরম্ভ করবে; তার ফলে সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে উঠে ছোট ছোট বহু দ্বীপ হারিয়ে যাবে সমুদ্রের গহ্বরে। বাংলাদেশের মতো অনেক নিচু দেশের বিশাল অংশও তলিয়ে যেতে পারে সমুদ্রের তলায়।

অন্য বিজ্ঞানীরা বলছেন, একই সাথে বাড়ছে হাওয়ায় ধুলোর কণা; তার ফলে পৃথিবীতে সূর্যের আলো পৌঁছাচ্ছে কম। কাজেই বায়ুমণ্ডলের উত্তপ্ত হয়ে ওঠার প্রভাবটা তাতে অনেকটা কমে যেতে পারে। শেষ ফলাফল যাই হোক, শিল্প-বিপ্লবের সময় পর্যন্ত বহু হাজার বছর ধরে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসের মিশেল যা ছিল আজ তা মানুষ, তার কলকারখানা আর মোটরযানের কল্যাণে এমনভাবে বদলে দিয়েছে যে, আগের অবস্থায় আর ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই।

একইভাবে দেখানো যেতে পারে যে, পৃথিবীতে পানির পরিমাণ প্রায় অফুরন্ত বলে মনে হলেও সুপেয় পানির ভাণ্ডার ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসছে।

যন্ত্রসভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে নানা ধরনের শিল্পজাত বিষাক্ত বর্জ্যপদার্থ, কীটনাশক প্রভৃতি পানির ভাণ্ডারকে করে তুলছে কলুষিত ও ব্যবহারের অযোগ্য।

হাওয়া আর পানির মতোই আমাদের জীবনধারণের জন্য একটি বড় সম্পদ হল সবুজ উদ্ভিদ। পৃথিবীতে একমাত্র সবুজ উদ্ভিদই পাতার ক্লোরফিল বা পত্রহরিতের সাহায্যে সৌরশক্তিকে বন্দি করে। যে পরিমাণ সৌরশক্তি পাতার ওপর পড়ে তার মধ্যে সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বন্দি হয় বড় জোর এক কি দু' শতাংশ। এর অনেকটাই উদ্ভিদ তার নিজের বৃদ্ধি, জনন প্রভৃতি জৈবক্রিয়ায় কাজে লাগায়; মানুষ ও অন্য প্রাণীদের জন্য উদ্বৃত্ত থাকে বন্দি শক্তির মাত্র দশ থেকে বিশ শতাংশ।

এক বর্গমিটার জমিতে সবুজ উদ্ভিদের আচ্ছাদন থাকলে তাতে সারা বছরে বিশেষ ক্ষেত্রে ন'লক্ষ কিলোক্যালরি সৌরশক্তি পড়তে পারে, আর তার মধ্যে খাদ্য হিসেবে সঞ্চিত হয় মাত্র ন'হাজার কিলোক্যালরি। উদ্ভিদের নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে নিরামিষাশী পশু ও পোকামাকড়ের ভাগে পড়ে বড় জোর এর পনের শতাংশ; খাদ্যচক্রের মাধ্যমে মাংসাশী প্রাণীদের কপালে জোটে এক শতাংশের মতো। একটা মোটামুটি হিসেবে, মানুষসহ সব প্রাণীর যা মোট ভর তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পৃথিবীতে উদ্ভিদের সবুজ কোষ থাকা প্রয়োজন তার চেয়ে অন্তত একশ' গুণ বেশি ভরের। কিন্তু এই অনুপাত রক্ষা করা ক্রমেই হয়ে উঠছে দুঃসাধ্য।

পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আর গত দু'শ বছরে এই বৃদ্ধির হার ক্রমাগতই দ্রুত হচ্ছে। ১৮০০ সালে পৃথিবীতে বাস করত মাত্র ৭০ কোটি লোক, সেটা বেড়ে ১৯০০ সালে হয় ১৬০ কোটি, ১৯৫০ সালে ২৫০ কোটি—আর আজ হয়েছে ৫০০ কোটি। এই বাড়তি জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে একই হারে সবুজ উদ্ভিদের পরিমাণ বাড়ানো দরকার। বিশ শতকের শুরুতে পৃথিবীতে মোট জনসংখ্যা যা ছিল আজ হয়েছে তার তিনগুণের ওপর; অথচ বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন এই সময়ে উদ্ভিদের আচ্ছাদন না বেড়ে বরং কমেছে অন্তত পঁচিশ শতাংশ।

সবুজ উদ্ভিদ খাদ্যশক্তির যোগান দেয়া ছাড়াও বাতাস থেকে কারবন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে নেয় এবং বাতাসে অক্সিজেন যোগ করে। পৃথিবীর বুকে উদ্ভিদের পরিমাণ কমে যাওয়া তাই বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অকসাইড বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ।

এ ছাড়াও সবুজ উদ্ভিদ ভূমিক্ষয় রোধ করে এবং জলবায়ুতে অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য বিজ্ঞানীরা বলেন, কোনো দেশের মোট আয়তনের অন্তত এক-চতুর্থাংশ জায়গা বনভূমিতে আচ্ছাদিত থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে

banglainternet.com

বনভূমির পরিমাণ এই নিম্নতম পরিমাণের অর্ধেকেরও কম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলে ইতিমধ্যে মরুকরণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। এমনি খরা ও মরুকরণ আফ্রিকার 'সাহেল' অঞ্চলের দেশগুলোতে সাম্প্রতিককালে গুরুতর অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। সারা পৃথিবীতে সভ্যতাবিস্তারের নামে যে হারে বৃক্ষনিধন চলছে তাতে এমনি মরুকরণ আরো বহু দেশে বিস্তৃত হবার সমূহ আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে নগরায়ণের হারও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। নগরায়ণের ফলেও প্রাকৃতিক ভারসাম্যে গুরুতর রকম চাপ সৃষ্টি হয়। বিশ শতকের শুরুতে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র দশ শতাংশ বাস করত নগরাঞ্চলে। জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী এই শতকের শেষে পৃথিবীর জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের ওপর হবে নগরবাসী: এই এক শতকে নগরবাসীর মোট সংখ্যা বাড়বে প্রায় পনের গুণ। এমন বিপুল গতিতে নগরায়ণ ইতিহাসে এর আগে আর কখনো ঘটেনি। জাতিসংঘের এই হিসেবে বিশ শতকের শেষে নগরায়ণের হার হবে : উত্তর আমেরিকায় ৮৬ শতাংশ: ইউরোপে ৭৭ শতাংশ: অস্ট্রেলিয়া ও ওসেনিয়ায় ৭৭ শতাংশ, ল্যাতিন আমেরিকায় ৭৫ শতাংশ। ইতিমধ্যে মেক্সিকো সিটি, কলকাতা প্রভৃতি অনেক বড় নগরাঞ্চল নানা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে : নগরায়ণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘন বসতিপূর্ণ নগরাঞ্চলের নানা সমস্যাও আরো তীব্র রূপ ধারণ করবে।

এই আলোচনা থেকে মনে হতে পারে মানুষ সভ্যতাবিস্তারের সাথে সাথে পরিবেশের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে তা মূলত অকল্যাণকর এবং এই অকল্যাণকর প্রভাবের তীব্রতা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সাম্প্রতিককালে—বিশেষ করে পাশ্চাত্যে—এমন একটি ধারণা পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করেছে: তার ফলে বর্তমান সভ্যতার জটিল সমস্যাবলি থেকে উদ্ধার পাবার জন্য 'দাও ফিরে সে অরণ্য' প্রভৃতি স্লোগানের আড়ালে আবার সেই আদিম প্রকৃতি-নির্ভর যুগে প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টাও কোনো কোনো মহলে দেখা যাচ্ছে।

এ ধরনের চিন্তাধারা দুটি কারণে অবাস্তব এবং প্রতিক্রিয়াশীল। একটি হল : এই যুক্তিধারার অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত হবে যেহেতু মানবসভ্যতা ক্ষতিকর অতএব তার অগ্রগতি প্রতিহত করা প্রয়োজন। এই যুক্তি বর্তমান সমস্যার আসল জনক মুনাফালোভী পুঁজিতন্ত্রকে চিহ্নিত না করে তার অস্তিত্বকেই টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে। দ্বিতীয়ত, এভাবে সভ্যতার অগ্রগতি প্রতিহত করলে যে সব দেশ গত দুশ বছরে মূলত উপনিবেশবাদের কারণে শিল্প-বিপ্লবসৃষ্ট বস্তুগত সমৃদ্ধি

থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে সব উন্নয়নশীল দেশই সব চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এসব দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান আজ উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বহুগুণে নিচে এবং এদের পরিবেশের জীর্ণতা আর কলুষতার মূলে প্রধানত দায়ী তাদের সীমাহীন দারিদ্র্য। যে মানুষের নিম্নতম খাদ্যের সংস্থান নেই তার পক্ষে পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বা সৌকর্য প্রায়শই বিলাসিতা মাত্র বলে বিবেচিত হয়। এসব দেশের দারিদ্র্য দূর করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির পথে এগোনো ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশে শিল্প বিকাশ জরুরি, তবে তা ঘটাতে হবে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে। কিন্তু কী সে ভারসাম্য?

গোড়াতেই বলা হয়েছে, প্রকৃতির জড় বস্তুজগৎ থেকেই জীবজগতের উদ্ভব। আর মানুষসহ সমগ্র জীবজগৎ যেমন একদিকে তার অস্তিত্বের জন্য নির্ভরশীল পৃথিবীর বস্তুসম্পদের ওপর, তেমনি নির্ভরশীল নিজেদের পরস্পরের ওপরও।

উদ্ভিদ এবং প্রাথমিক ধরনের প্রাণীরা জীবনধারণ করে মূলত জড়বস্তুর ওপর নির্ভর করে। উদ্ভিদ মাটি থেকে নেয় পানি এবং তার সাথে মেশানো অজস্রখানেক খনিজ উপাদান, হাওয়া থেকে নেয় কার্বন ডাই-অক্সাইড, সূর্যের আলো থেকে নেয় শক্তি। তারপর রসায়নের আশ্চর্য জটিল প্রক্রিয়ায় এসব পরিণত হয় নানা জৈব বস্তু ও উদ্ভিদের প্রাণশক্তিতে। উদ্ভিদ খেয়ে বাঁচে অনেক প্রাণী। উদ্ভিদের জৈব উপাদান আরো জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে তৈরি হয় তাদের মাংস, দুধ, চর্বি প্রভৃতি উপাদান। এসব আবার খাদ্য হয় নানা মাংসাশী প্রাণীর। মানুষ তার পুষ্টি সংগ্রহ করে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উভয় ধরনের উপাদান থেকে।

পৃথিবীর কোনো অঞ্চলে উদ্ভিদের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনেকটাই নির্ভর করে সেখানকার মাটির রস, জলবায়ুর উপাদান প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুসম্পদের ওপরে। আবার উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে বাঁচে যে সব প্রাণী তাদের প্রাচুর্য নির্ভরশীল উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ও সংখ্যার ওপর। অনুকূল জলবায়ু বা আর কোনো কারণে উদ্ভিদের সংখ্যা বাড়লে এই নির্ভরশীল প্রাণীদের সংখ্যাও বাড়ে। তবে প্রাণীর সংখ্যা যদি অতিমাত্রায় বেড়ে ওঠে তাহলে তারা উদ্ভিদ খেয়ে নিঃশেষ করতে থাকে, তখন খাদ্যের অভাবে আবার প্রাণীর সংখ্যা কমে আসে।

অর্থাৎ চারপাশের জড়বস্তু, উদ্ভিদ ও প্রাণী পরস্পরের সঙ্গে একটা ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। হাজার হাজার বছরের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, নানা শক্তির প্রভাবের ফলে যে ভারসাম্য গড়ে উঠেছে তা একদিকে যেমন অতি সূক্ষ্ম তেমনি অত্যন্ত শক্তিশালী। এই ভারসাম্য বিপর্যস্ত হলে তার ফল হতে পারে মারাত্মক। আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে রপ্তানির জন্য নির্বিচারে ব্যাঙ নিধনের ফলে

banglainternet.com

ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের সংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত।

আদিম মানুষ গাছ থেকে ফলমূল পেড়ে খেত, বনে শিকার করত, নদীতে-হ্রদে মাছ ধরত। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য তাকে অনেকখানি নির্ভর করতে হত চারপাশের প্রকৃতির ওপর। এই অতি সরল জীবনযাত্রার জন্য সে যেসব উপকরণ গ্রহণ করত তাতে প্রকৃতির ক্ষতি হত খুব সামান্য; এই ক্ষতি পুষিয়ে যেত সহজেই। প্রকৃতি তার ক্ষতি পুষিয়ে আবার পৌঁছাত আগের অবস্থায়।

ক্রমে ক্রমে সভ্যতার অগ্রগতির ফলে প্রকৃতির দানের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে মানুষ তার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে আরম্ভ করল। এজন্য সে উদ্ভব ঘটাল নানা প্রযুক্তির, নানা কলাকৌশলের। এসব প্রযুক্তির প্রয়োগে প্রকৃতির উন্নতি যে কোথাও কোথাও না ঘটল এমন নয়। মরুভূমির প্রান্তে বনাঞ্চল বসিয়ে ঠেকানো হল উত্তপ্ত হাওয়ার রুক্ষ নিঃশ্বাস। বিশাল নদীতে বাঁধ দিয়ে তার পানি সেচের মাধ্যমে ঊষর প্রান্তরে সৃষ্টি হল দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত। দুর্গম জলাভূমিকে মানুষ পরিণত করল মনোরম আবাসভূমিতে।—কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নিতে গিয়ে নাড়া পড়ল পরিবেশের সূক্ষ্ম ভারসাম্যে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিই মানুষকে দিয়েছে প্রকৃতির সম্পদ ব্যবহারের বিপুল ক্ষমতা। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিই প্রকৃতির ভারসাম্যে আজ এই বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য দায়ী। কিন্তু বিজ্ঞান তো প্রকৃতিকে বিনষ্ট করতে বলে না। বরং বলা যেতে পারে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগই দায়ী পরিবেশের বিনাশের জন্য। কিংবা আরো গোড়ায় গিয়ে বলা চলে, মানুষের লাগামহীন ক্ষুধা—যার প্রকাশ ঘটছে মুনাফার পূজারী পুঁজিবাদী সমাজে—দায়ী পরিবেশের নির্বিচার সংহারের জন্য। এই সমস্যা যে সমগ্র মানবসভ্যতার সামনেই এক গুরুতর বিপদ সৃষ্টি করেছে এ বিষয়ে পুঁজিবাদী দুনিয়াও সচেতন হয়ে উঠেছে। তাই আজ দাবি উঠছে পরিবেশ-চেতনাভিত্তিক নতুন উন্নয়ন কৌশলের।

মানুষের এই নতুন পরিবেশ-চেতনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শুধু তার চারপাশের বস্তুজগৎ বা প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে বিবেচনা নয়, এর এলাকা বিস্তৃত মানুষ ও তার সমাজের ক্রিয়াকলাপ এবং চারপাশের পরিবেশের সাথে এসব ক্রিয়াকলাপের পারস্পরিক সম্পর্কের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে। প্রকৃতির বিভিন্ন প্রক্রিয়া পরস্পর নির্ভরশীল বলেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়মাবলি বিস্তারিতভাবে জানা এবং মানুষের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে তাদের যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়ে উঠেছে জরুরি।

এ থেকেই আজকের মানুষের সামনে দেখা দিয়েছে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ নতুন দায়িত্ব ঃ পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদের সংযত ব্যবহার এবং তাদের পুনরুৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি। এসব নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে শুধু যে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরাই সচেতন হয়ে উঠেছেন তা নয়, সারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য দেশে দেশে এক ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কি মানুষের উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ স্থগিত রাখতে হবে?—বলাবাহুল্য এমন প্রশ্ন তোলা বাতুলতা। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ বাসিন্দা আজ রয়েছে উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থায় আজকের দিনে মানুষের পরিবেশের ক্ষেত্রে একটি প্রধান সমস্যা হল গত দু'শ বছরের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলাফল অল্পসংখ্যক মানুষের কুক্ষিগত হয়ে পড়া এবং দুনিয়ার গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের কাছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলাফল না পৌঁছানো।

পাশ্চাত্যের দেশগুলো এক অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলাফল ভোগ করছে একপেশেভাবে, অনেক দেশকে উন্নয়নের ফলাফল থেকে বঞ্চিত রেখে। এই সব অনুন্নত দেশ আজ এত বেশি পিছিয়ে আছে যে, সেখানে যে কোনো ধরনের আধুনিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিচিত্র ধরনের পরিবেশ-দূষণজনিত সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। বিশেষ করে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে এ জন্য যে, অনেক ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যের উন্নত দেশের প্রযুক্তি নির্বিচারে এসব দেশে চালু করা হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিপ্লবের আগে পৃথিবীতে উন্নত ও অনুন্নত দেশের সমস্যা আজকের মতো এমন প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেও একজন মার্কিনীর তুলনায় একজন ভারতীয়ের গড় বার্ষিক আয় ছিল মাত্র আটগুণ কম; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এই পার্থক্য দাঁড়ায় পনের গুণ, আজ সেই পার্থক্যের পরিমাণ প্রায় পঞ্চাশগুণ। উন্নত দেশের সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের এই বিপুল ও ক্রমবর্ধমান পার্থক্য অনেকটাই আজকের পৃথিবীর অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি। এই ব্যবস্থায় পরিবেশগত ভারসাম্যে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে তা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপরাধ নয়, তার মূলে রয়েছে পুঁজিপতিদের সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার, উন্নয়নশীল দেশের মানুষদের শ্রম, স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তিকে নির্মমভাবে শোষণ।

আজকে আন্তর্জাতিক নানা মঞ্চে এই অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবি উঠেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো আর শুধু উন্নত দেশের কাঁচামাল আহরণের

banglainternet.com

ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হতে চায় না; তারা তাদের জনগণের কল্যাণের স্বার্থে স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের পথে এগোতে চায়। এই বিকাশের জন্য স্বভাবতই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হবে একটি প্রধান হাতিয়ার। সারা পৃথিবীতে এ যাবৎ যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত হয়েছে তাতে দুনিয়ার সব মানুষেরই রয়েছে সমান অধিকার। অথচ উন্নত দেশগুলো অনেক ক্ষেত্রেই পেটেন্ট প্রভৃতি রক্ষাকবচের আড়ালে এসব আবিষ্কারকে কুক্ষিগত করে রাখে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উত্তরাধিকারকে সমগ্র মানবজাতির উন্নয়নের জন্য ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি তাই নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি প্রধান করণীয়।

আর উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন সামগ্রিক পরিবেশগত ভারসাম্যের বিবেচনাকে সামনে রেখে। এসব দেশের অগ্রগতির লক্ষ্যে আজ যেমন চাই পরিবেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো বেশি গবেষণা, তেমনি প্রয়োজন উন্নয়নশীল দেশের জন্য উপযোগি প্রযুক্তি সম্পর্কে নিরীক্ষা। আর সেই সঙ্গে পৃথিবীর সীমাবদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদের কথা মনে রেখে উন্নত দেশগুলোতে সম্পদের নির্বিচার ভোগ সংযত করাও হয়ে উঠেছে জরুরি।

উন্নয়নের প্রসঙ্গে পরিবেশের মানের প্রশ্নটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরিবেশের মান কথাটাকে অবশ্য নানাভাবে দেখা যেতে পারে। কারো কারো কাছে পরিবেশের মান হল একটা নান্দনিক ধারণা—সৌন্দর্যচেতনার সাথে তার কিছুটা যোগ আছে। পরিবেশের মান অবশ্যই নান্দনিক বিচারে গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের পক্ষে এ ধরনের বিবেচনাকে পরিমাপের আওতায় আনা সহজ হয় না। তাই তাঁরা সচরাচর পরিবেশ কী পরিমাণে জৈব উৎপাদনের পোষকতা করে তার ভিত্তিতে পরিবেশের মান নির্ধারণ করেন।

পরিবেশের মান নিরূপণের একটি পরিমাপ হল তাতে প্রতি একক আয়তনের জমিতে একক সময়ে কী পরিমাণ জৈববস্তু উৎপন্ন হচ্ছে। জৈববস্তু উৎপাদনের নিখুঁত হিসেব পাওয়া দুঃসাধ্য। তবে বনভূমির পরিমাপ, শস্য উৎপাদনের হার, পশুসম্পদ জরিপ, মাছ ধরার পরিমাণ প্রভৃতি থেকে এর মোটামুটি হিসেব পাওয়া যেতে পারে। পরিবেশে যদি যথেষ্ট পরিমাণ জীব বাস না করে, তাদের সকলের যথেষ্ট পুষ্টি উপাদান না জোটে, বর্জ্যপদার্থ সহনীয় সীমার মধ্যে না থাকে—অর্থাৎ এক কথায় পরিবেশের মান যদি যথোপযুক্ত পর্যায়ের না হয়—তাহলে তাতে জৈববস্তুর উৎপাদন সন্তোষজনক হওয়া সম্ভব নয়।

মানুষ সভ্যতা বা উন্নয়নের নামে যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করে তার সবই কোনো-না-কোনোভাবে পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তার কোনোটি হতে পারে পরিবেশের ভারসাম্যের পরিপোষক, কোনোটি প্রতিকূল। বলা বাহুল্য উন্নয়ন অর্থপূর্ণ হতে হলে তার মাধ্যমে পরিবেশের মান বজায় রাখা এবং আরো

উন্নত করা একটি অত্যন্ত জরুরি শর্ত। উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় পরিবেশের সম্পদ সংরক্ষিত না হয়ে যদি বিপর্যস্ত বা নিঃশেষিত হয় তাহলে সে উন্নয়নের প্রক্রিয়া সচল রাখাই অসম্ভব হবে। পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে অব্যাহত উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার জন্য, এবং বিশেষ করে উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলির জনগণের নিম্নতম চাহিদা মেটাবার জন্য, তাই প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রশ্নটি আজ বিরাট গুরুত্ব লাভ করেছে।

পৃথিবীর কিছু সম্পদ আছে যা নবায়নযোগ্য; অর্থাৎ যার একটা অংশ ব্যয় করলে প্রাকৃতিক নিয়মে কালক্রমে সে ক্ষয় পূরণ হয়—যেমন বনভূমি, বন্যপ্রাণী, মৎস্যসম্পদ। আজকালকার অধিকাংশ ফসল এবং গৃহপালিত প্রাণী মানুষের সচেতন উদ্যোগের ফলে বন্য প্রজাতির রূপান্তরের ফল। তবু এসবও নবায়নযোগ্য—মাটি ও পানির নিপুণ ব্যবহারে পরিবেশ থেকে এসব সম্পদ নবায়িত হয়।

নানা ধরনের ধাতু প্রভৃতি আকরিক অনবায়নযোগ্য; এগুলো খনি থেকে তুলে একবার ব্যবহার করলে সেখানে আর নতুন করে সৃষ্টি হয় না। সাম্প্রতিককালে নতুন নতুন খনি আবিষ্কারের ফলে অনেক আকরিকের জ্ঞাত ভাণ্ডার বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো কোনো খনিজ বস্তু কিছুটা পরিমাণে বারবার ব্যবহারযোগ্য। তবে তারও একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করলে এসব সম্পদ আর পাবার উপায় থাকবে না; কাজেই এসবের ব্যবহার সম্পর্কে এখনই সতর্ক না হলে ভবিষ্যতে বড় রকম বিপদ দেখা দিতে পারে।

পৃথিবীর শক্তিসম্পদ কিছুটা নবায়নযোগ্য, কিছুটা অনবায়নযোগ্য। নবায়নযোগ্য সম্পদের মধ্যে পড়ে কাঠ ও অন্যান্য উদ্ভিদ জ্বালানি, বায়োগ্যাস প্রভৃতি। জল ও বায়ুপ্রবাহ, সূর্যকিরণ এসব শক্তি শুধু যে নবায়নযোগ্য তা নয়—চিরপ্রবহমান। আবার নানা ধরনের জীবাশ্মজ্বালানি—যেমন তেল, কয়লা, গ্যাস—এবং পরমাণুবিভাজনজনিত শক্তি অনবায়নযোগ্য। কাজেই এসব শক্তি ব্যবহারেও যথেষ্ট বিবেচনা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে।

সতর্কতা প্রয়োজন শুধু অনবায়নযোগ্য সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নয়, নবায়নযোগ্য সম্পদ ব্যবহারের বেলাতেও। অসংখ্য জাতের উদ্ভিদ, বন্য ও সামুদ্রিক প্রাণী আজ বিলুপ্তির সম্মুখীন। কোথাও এসবের বিলুপ্তি ঘটছে মানুষ এদের অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহারের ফলে—যেমন বিভিন্ন জাতের কড মাছ, তিমি ও গণ্ডার; আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে বহু জাতের উদ্ভিদ জ্বালানি হিসেবে অতিব্যবহারের ফলে আজ প্রায় বিলুপ্ত। বিলুপ্তির আরেক কারণ হল কৃষিভূমির বিস্তার, মানুষের বসতি স্থাপন, নগরায়ণ প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে বিভিন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণীর অভ্যস্ত পরিবেশে বিপর্যয়। উন্নয়মূলক কর্মসূচি গ্রহণের

banglainternet.com

সময় পরিবেশের ওপর এ ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব যাতে না পড়ে সেকথা সব সময় বিবেচনায় রাখা দরকার।

পরিবেশ মানুষের কী পরিমাণ অত্যাচার সইতে পারে, নানা ধরনের কী কী সম্পদ আছে তার ভাণ্ডারে, আর কী করে এসব সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করা যায় যেন পরিবেশের মান ব্যাহত না হয়ে বরং আরো উন্নত হয়—সে সব আজ নানা ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীদের জন্য এক গভীর চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্পষ্টতই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে আমরা আজ এক পরিবেশগত সংকটের সম্মুখীন হয়েছি। আগেই বলা হয়েছে, এজন্য অবশ্য বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিকে দায়ী করা চলে না, দায়ী মুষ্টিমেয় অর্থগৃধ্নু মানুষের বিবেচনাহীন মুনাফার লোভ। এভাবে দেখলে হয়তো কিছুটা সান্ত্বনা মেলে, তবু সমস্যার তীব্রতা তাতে কিছুমাত্র কমে না।

আসলে পরিবেশের যে সংকট আজ সমগ্র মানবসভ্যতাকে গ্রাস করতে উদ্যত তা শুধু সুপেয় পানি ও বাতাসে অকসিজেনের অভাব, পরিবেশ দূষণ বা আকরিকের স্বল্পতার সমস্যা নয়। ধনবাদী সমাজব্যবস্থা এক যুদ্ধংদেহী অর্থনীতি চালু রেখে সারা পৃথিবীর পরিবেশের ওপর আরো বড় রকম সংকটের পাখা বিস্তার করে আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তের দাগ শুকাবার আগেই নানা মহল থেকে এক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা শোনা যেতে থাকে। আইনস্টাইন, বারট্রান্ড রাসেল, জোলিও কুরি প্রমুখ বিবেকবান বিজ্ঞানীরা এসে দাঁড়ান দুনিয়াজোড়া শান্তি আন্দোলনের সামনে। দেশে দেশে পরমাণু অস্ত্র ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে বিপুল প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে তার ফলে গত চার দশকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হতে পারেনি। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের হুমকি সারা দুনিয়ার মানুষকে ঘিরে আছে সর্বক্ষণ। অন্তত ষাট হাজার পরম বিধ্বংসী পরমাণু অস্ত্র সজ্জিত হয়ে আছে যে কোনো মুহূর্তে পৃথিবীর দিকে দিকে সামরিক ও অসামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর হানা দেবার জন্য; পৃথিবীর নারী-শিশু-বৃদ্ধ প্রতিটি মানুষের জন্য প্রায় পাঁচ টন অতিবিস্ফোরক টিএনটির সমান শক্তির যুদ্ধাস্ত্র বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত।

পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা দু'তিন দশক ধরে পরিবেশে বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়েছে। পরমাণু যুদ্ধ বাধলে বোমার প্রচণ্ড ধাক্কা আর আগুনের লেলিহান শিখা শুধু যে নিমেষের মধ্যে মানুষের উন্নয়নমূলক কাজের অসংখ্য নিদর্শনকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে তা নয়, প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয় বিকিরণ দীর্ঘকাল ধরে বহু দূর পর্যন্ত পরিবেশকে বিষাক্ত করে রাখবে। কিন্তু এই সমরপ্রস্তুতির ফলে তার চেয়েও মারাত্মক প্রভাব পড়ছে পৃথিবীর সমগ্র অর্থনীতির ওপর। বিজ্ঞানীদের বিপুল মেধা নিয়োজিত আজ মারণাস্ত্রের গবেষণায়; বিপুল বস্তুসম্পদ

মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত না হয়ে প্রস্তুত করছে মৃত্যুর উপকরণ; আর এর ফলে অনুন্নত দেশের বহু কোটি মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে জীবনযাত্রার নিম্নতম প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে। মহাকাশেও আজ প্রচণ্ড বিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র স্থাপন করার উদ্যোগ চলছে।

কিন্তু মানুষের এই সংহারমূর্তিই আজকের দিনের একমাত্র সত্য নয়। একদিকে বিজ্ঞানের বিপুল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যেমন সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর পরিবেশকে কলুষিত, বিপর্যস্ত করার বিপুল ক্ষমতা, তেমনি আবার এই বিজ্ঞানের অবদান কাজে লাগিয়ে মানুষ আজ আয়ত্ত করেছে পরিবেশে কল্যাণকর পরিবর্তন সাধনের অপরিমেয় সম্ভাবনাও।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মানুষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিপ্লব এক নতুন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে পরমাণুশক্তি ব্যবহৃত হয়েছিল হিরোশিমা নাগাসাকিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি তাই সৃষ্টি করল পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তি। আজ পৃথিবীর বহু দেশে পরমাণুশক্তি থেকে পাওয়া বিদ্যুৎ দেশের মোট বিদ্যুৎশক্তির একটা প্রধান অংশে পরিণত হয়েছে; তার ফলে পৃথিবীর কয়লা আর তেলের ভাণ্ডারের ওপর চাপ কমছে, তেমনি কমছে এসব পোড়ানোর ফলে কারবন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণজনিত বায়ুদূষণও।

প্রায় একই সময়ে উদ্ভব ঘটেছে কম্পিউটার প্রযুক্তির। ষাটের দশকে সিলিকন চিপ নির্মাণের ফলে কম্পিউটার প্রযুক্তির বিকাশ বিপুল বেগ লাভ করে আজ ক্রমে ক্রমে তা সব উন্নত দেশের ঘরে ঘরে স্থান লাভ করেছে। এতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘটেছে বিপ্লব, বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে মানুষের তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষমতা। পৃথিবীর সম্পদ অনুসন্ধান ও যোগাযোগের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি ঘটেছে কৃত্রিম উপগ্রহের আবির্ভাবের ফলে; সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ জরিপ এবং এসব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী উপায় মানুষের আয়ত্ত হয়েছে।

এই নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের আর একটি যুগান্তকারী উপাদান হল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা বংশগতি-প্রকৌশল। পঞ্চাশের দশকে কেমব্রিজে ওয়াটসন ও ক্রীক ডিএনএ-র প্রকৃতি নির্ধারণ করার ফলে জীবদেহে বংশগতির ধারক জিনকণার রহস্য ভেদ করা সম্ভব হয়। সত্তরের দশকে মানুষ এই জিনকণায় পরিবর্তন ঘটিয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীর গুণাগুণে মৌলিক রূপান্তর ঘটাবার পদ্ধতি আয়ত্ত করেছে। কৃষি, শিল্প প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে তার ব্যাপক প্রয়োগ অদূর ভবিষ্যতে আরম্ভ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

banglainternet.com

এ সকল আবিষ্কার সবই মানুষকে তার পরিবেশে কল্যাণকর রূপান্তর ঘটাবার বিস্ময়কর নতুন ক্ষমতার অধিকারী করেছে। কিন্তু সে ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত কিভাবে ব্যবহৃত হবে—পরিবেশ ও মানুষের কল্যাণের জন্য অথবা অকল্যাণের জন্য—এ সিদ্ধান্ত বলা বাহুল্য মানুষকেই নিতে হবে। আজকের যে পরিবেশচেতনা তা যদি সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়, দেশে দেশে জনগণ সচেতন হয়ে ওঠে কিসে পরিবেশের কল্যাণ আর কিসে অকল্যাণ, আর ওয়াকিবহাল হয় এই পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য মানুষের আয়ত্ত ক্ষমতা সম্পর্কে, তাহলে মুষ্টিমেয় মুনাফালোভীর কবল থেকে পৃথিবীর পরিবেশকে রক্ষা করা মোটেই অসম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে : তাহলে মানুষের চারপাশের অজৈব ও জৈব উপাদান মিলিয়ে যে বস্তুগত পরিবেশ তাই কি সব? সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে পরিবর্তন না ঘটিয়ে এই বস্তুগত পরিবেশে পরিবর্তন ঘটানো কি সম্ভব?

প্রশ্নটা আবার যেন সেই 'ডিম আগে না মুরগি আগে' সে জাতের। বস্তুগত পরিবেশ অবশ্যই সব নয়, যদিও বলা হয়ে থাকে সকল চিন্তা-চেতনারই কোনো না কোনো বস্তুগত ভিত্তি রয়েছে। তবে আজকের দিনে বস্তুগত পরিবেশে কল্যাণকর রূপান্তর সাধনের বিপুল শক্তি যেমন মানুষের আয়ত্ত, তেমনি আয়ত্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে রূপান্তরের সম্ভাবনাও। আর এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই যে, শেষপর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর জনগণের সচেতন, সংগঠিত উদ্যোগ আর কর্মোদ্যমই কেবল সম্ভব করে তুলতে পারে দীনতা ও অকল্যাণের কলুষ থেকে মুক্ত প্রাচুর্য, শান্তি ও আনন্দময় আগামী দিনের নতুন পৃথিবী সৃষ্টি।

নভেম্বর, ১৯৮৫

[উৎস : *বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭]

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য

গত দুশো বছরে—অর্থাৎ ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের সময় থেকে—পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাত্রার ধারা দ্রুততালে বদলে গিয়েছে। কয়লা, তেল, গ্যাস প্রভৃতি খনিজ জ্বালানির ব্যবহার বেড়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সম্মিলনের ফলে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন-শক্তির বিপুল বিকাশ ঘটেছে। যাতায়াত ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। সেই সঙ্গে এসেছে মানুষের গড় আয়ুষ্কালের বৃদ্ধি, ব্যাপক নগরায়ণ এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা স্বাচ্ছন্দ্য।

প্রথম দিকে এই শিল্প-বিপ্লবের ফল প্রধানত লভ্য ছিল পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলোর কাছে। এসব দেশ অনেক ক্ষেত্রে তাদের নবলব্ধ ক্ষমতার সাহায্যে উপনিবেশ বিস্তারের মাধ্যমে পরদেশের সম্পদ কুক্ষিগত করে নিজেদের সমৃদ্ধিশালী করে তোলে। বিশ শতকে এসে এই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভিত নড়বড়ে হয়ে ওঠে। তার ফলে এককালের পরাধীন দেশগুলোও বিজ্ঞান ও শিল্প-বিপ্লবের ফলাফলে অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে থাকে। এসব দেশের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন আজ এক জীবন-মরণ প্রশ্ন। দীর্ঘকালের পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে উঠে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ ছাড়া এসব দেশের সামনে দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই।

কিন্তু এসব দেশের উন্নয়নের পথে আজ বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ আর পরিবেশের ভারসাম্যে বিপর্যয়। শিল্প সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে গিয়ে মানুষ পরিবেশে যে হারে বিপুল বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে চলেছে তার হাত থেকে নিস্তার লাভের উপায় কী? এ প্রশ্ন আজ সারা দুনিয়ার মানুষের মনকে আলোড়িত করছে? কোথাও কোথাও এর ফলে বিজ্ঞানবিরোধী এবং উন্নয়নবিরোধী মনোভাবও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে।

ষাটের দশকের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে র‍্যাচেল কারসন যখন Silent Spring বা 'মৌন বসন্ত' নামে বই লিখে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন তখন উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলোতেও পরিবেশ প্রসঙ্গ তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। এ বই যেন সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল লাগামবিহীন উন্নয়নের নামে মানুষ তার চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশে কী তাণ্ডব ঘটিয়ে চলেছে। কল-কারখানার

banglainternet.com

বিষাক্ত ধোঁয়া আচ্ছন্ন করছে নগর-জনপদের আকাশ-বাতাস; সার আর কীটনাশক ছড়িয়ে পড়ছে প্রান্তরে জলাশয়ে; শিল্প-কারখানার বর্জ্যদ্রব্য হ্রদ আর নদীগুলোকে করে তুলছে দূষিত; বিধ্বস্ত বন-বনানী বসন্ত ঋতুতেও আর আগের মতো পাখির কাকলিতে উঠছে না ভরে।

তারপর থেকে যত দিন যেতে লাগল ততই পরিবেশের আসন্ন বিপর্যয়ের চিত্র বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল মানুষের কাছে। পাশ্চাত্যের দেশে দেশে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য জঙ্গী গণ-আন্দোলন গড়ে উঠতে লাগল। আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারকদেরও টনক নড়ল তাতে। জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৭২ সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম-এ অনুষ্ঠিত হল মানব পরিবেশ-বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। প্রতিষ্ঠা ঘটল জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির।

গত প্রায় তিন দশকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়েছে। আজ আর এ সমস্যা শুধু উন্নত দেশগুলোর সমস্যা হিসেবে গণ্য নয়, উন্নয়নশীল দেশগুলো যারা কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছে তারাও সম্মুখীন হচ্ছে ব্যাপক পরিবেশগত সমস্যার। একটি হিসেবে জানা যায়, শুধু এই শতাব্দীতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মোট বনভূমির পরিমাণ কমে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। তার ফলে কমছে জ্বালানি কাঠ, জমির উর্বরতা, খাদ্য উৎপাদন, জল সরবরাহ। পৃথিবীর একশো কোটির বেশি লোক আজ গুরুতর জ্বালানি সংকটের সম্মুখীন।

পরিবেশের কিছু কিছু সমস্যা দেখা দেয় যেগুলো অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষ এবং সে কারণে সেগুলোর কার্যকারণ সহজে বোধগম্য। যেমন :

— চারপাশে আবর্জনা ছড়ালে তাতে নানা রোগের বিস্তার ঘটে।
— কল-কারখানার ধোঁয়া বায়ুকে দূষিত করে তোলে।
— প্রচণ্ড খরার ফলে দেশময় শস্যহানি ঘটে।
— বন্যা, ঝড়, সাইক্লোনে ফসল, বাড়িঘর, গৃহপালিত পশু ধ্বংস হয়।
— জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি জমি, খাদ্য, বাসস্থান, জল সরবরাহ ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধার সংকট ঘটায়।

আবার কিছু কিছু পরিবেশগত সমস্যা ততটা প্রত্যক্ষ নয়, তাই সে সবের কার্যকারণ বোঝাও সাধারণ মানুষের পক্ষে তেমন সহজ হয় না। যেমন :

— ক্ষেতে নির্বিচার কীটনাশকের ব্যবহার এবং শিল্পের বর্জ্যদ্রব্য মৃত্যু ঘটায় নদীর মাছের।
— জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ এবং জৈবসারের অভাব কৃষিজমির উৎপাদনশীলতা কমায়।

— বন বিনাশের ফলে ভূমিক্ষয় বাড়ে, নদীর নাব্যতা কমে, দেশে প্লাবন ও জলসংকট দেখা দেয়।
— খনিজ জ্বালানি পোড়ানোর ফলে জলবায়ুর তাপমাত্রা বাড়ে, হাওয়ার অম্লতা বৃদ্ধি পায়।
— বায়ুদূষণ ও অম্লবৃষ্টিতে বন ধ্বংস হয়।
— পরিবেশে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়া বাড়লে ক্যানসার প্রভৃতি ব্যাধিতে বহু লোকের মৃত্যু ঘটতে পারে।
— 'উঁচু আকাশে ওজোন গ্যাসের স্তর সঙ্কুচিত হচ্ছে, তাতে একদিন মানুষের জন্য বিষম বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।

এসব সমস্যা দুর্নিরীক্ষ্য বলেই যে সাধারণ মানুষের অগোচর তা বলা শক্ত। কখনো কখনো অতি দূর সমস্যা প্রচণ্ড নাটকীয়তা নিয়ে মানুষের খুব কাছে চলে আসে। ভূপালে কীটনাশক কারখানায় বিষাক্ত গ্যাস নিঃসরণ হয়ে যখন প্রায় তিন হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে তখন সে খবর আর শুধু ভারতের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে। তেমনি সোভিয়েত ইউক্রেনের চেরনোবিল নামে এক অখ্যাত জনপদের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটে তেজস্ক্রিয় ভস্ম ছড়িয়ে পড়লে সে আতঙ্ক বাংলাদেশের মানুষকে এমনভাবে গ্রাস করে যে, তারপর এ দেশের মানুষ দীর্ঘকাল ধরে দুধ বা দুগ্ধজাত কোনো জিনিস খাওয়া প্রায় বর্জন করে। তেমনি আফ্রিকায় ইথিওপিয়া প্রভৃতি সাহেল অঞ্চলের দেশগুলোতে যে দীর্ঘকালীন খরা দেখা দেয় তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীর বহু দূরপ্রান্তে। পৃথিবীর নানা অঞ্চলের মরুপ্রবণতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে মানুষ।

অর্থাৎ সবকিছু মিলিয়ে পরিবেশের সমস্যা আজ সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত। মানুষের পরিবেশ যে এক সর্বগ্রাসী বিপদের সম্মুখীন এ চেতনা আজ আর শুধু বিজ্ঞানীদের মধ্যে বা পরিবেশবাদীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ষাটের দশকে যা ছিল শুধু উন্নত দেশের গুটিকতক মানুষের সমস্যা তা এই আশির দশকের শেষে হয়ে দাঁড়িয়েছে সারা পৃথিবীর মানুষের সমস্যা।

এই সমস্যার চরিত্র নিয়ে নানা দেশের বিজ্ঞানী আর বিশেষজ্ঞরা গভীরভাবে ভাবছেন। এ বিষয়ে অজস্র বই লেখা হয়েছে। হাজার হাজার গবেষণাপত্র তৈরি হয়েছে। ১৯৮৩ সালে জাতিসংঘ নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী গ্রো হারলেম ব্রুন্টল্যান্ডকে (সে দেশের এককালীন পরিবেশমন্ত্রী) সভাপতি করে পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন ১৯৮৭ সালে Our Common Future বা 'আমাদের অভিন্ন ভবিষ্যৎ' নামে একটি রিপোর্ট

banglainternet.com

প্রণয়ন করে—তাতে সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে।

আজ এটা সবার কাছে স্পষ্ট যে, পরিবেশের সমস্যাকে মানবসমাজ এবং মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা আদৌ সম্ভব নয়। বলাবাহুল্য সব দেশে সমস্যার রূপ যে হুবহু এক তা নয়। যেমন ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার উন্নত শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলোতে অম্লবৃষ্টি একটি প্রধান সমস্যা; আবার নেপাল, ভারত বা বাংলাদেশে বনধ্বংসের ফলে ভূমিক্ষয় আজ গুরুতর রূপ গ্রহণ করেছে।

দুশো বছর আগে ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের সময় থেকে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির যে ধারা তার মধ্যেই পরিবেশগত সমস্যার বীজ নিহিত রয়েছে। পরিবেশের ওপর মানুষের আধিপত্য বিস্তারের ফলে মানুষ নির্বিচারে পরিবেশের নানা সম্পদ ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। তাতে মানুষের বস্তু ও শক্তি সম্পদের ব্যবহার বেড়েছে, বেড়েছে তার জীবনমান, আয়ুষ্কাল। সেই সঙ্গে দ্রুতগতিতে বেড়েছে মানুষের সংখ্যা। ১৮৩০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল প্রায় একশো কোটি; তারপর প্রায় এক শতাব্দীতে জনসংখ্যা বেড়েছে আরো একশো কোটি। অথচ মাত্র গত ষাট বছরের মধ্যেই পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা তিনশো কোটি বেড়ে আজ দ্রুত ছশো কোটির অঙ্কের দিকে এগিয়ে চলেছে। স্বভাবতই পৃথিবীতে খনিজ প্রভৃতি যেসব বস্তুসম্পদ সীমাবদ্ধ অথচ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সে সবের ভাণ্ডারে টান পড়তে আরম্ভ করেছে। এমনকি যেসব বস্তুর পুনরুৎপাদন সম্ভব সেগুলোর নবীকরণের জন্য প্রয়োজন সূক্ষ্ম পরস্পরনির্ভর প্রাকৃতিক ভারসাম্য—তা আজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। এই ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করলে সমগ্র মানবসভ্যতার সামনে আজ সমূহ বিপদ। প্রাকৃতিক সম্পদের বেহিসেবী ব্যবহার আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, সভ্যতার অগ্রগতির ধারাই আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

পরিবেশের ভারসাম্যের প্রসঙ্গে আজ কতকগুলো বিষয় বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে পড়ে :

ক. পরিবেশগত ভারসাম্যের বিবেচনাহীন প্রাকৃতিক সম্পদের আগ্রাসী ও মুনাফাভিত্তিক ব্যবহার;

খ. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য;

গ. বিশ্ব অর্থনীতিতে সামরিক খাতে ব্যয়ের প্রাধান্য;

ঘ. পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভিত্তিক যৌথ কার্যক্রমের অভাব;

ঙ. এ ধরনের কর্মসূচিতে সমগ্র জনসমাজ—বিশেষ করে তরুণ সমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণের সমস্যা।

জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা আজ প্রশ্নাতীত। বিশেষ করে, দরিদ্র দেশগুলোর জন্য উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা নিশ্চয়ই একান্ত জরুরি। তবে এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে : কোন ধরনের উন্নয়ন আমরা চাইব? পাশ্চাত্যে যে ধারায় উন্নয়ন চলেছে তাতে বেশকিছু ক্ষেত্রে পরিবেশের উন্নতি ঘটেছে; আবার অনেক ক্ষেত্রে মুনাফালোভী বেনিয়াবুদ্ধির প্রকোপে মুনাফার অঙ্ক বেড়েছে প্রকৃতির ভারসাম্য ধ্বংসের বিনিময়ে।

তা বলে উন্নয়ন মাত্রই ধ্বংসকর হবে এমন কোনো কথা নেই। বিজ্ঞানের আশ্চর্য নানা অবদানের ফলে ইতিহাসে এই প্রথম পৃথিবীর সব মানুষের জন্য আজ যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যের সংস্থান হওয়া সম্ভব; অধিকাংশ ব্যাধির নিরাময়ের পদ্ধতি আজ মানুষের আয়ত্তে—মহামারী ও অকালমৃত্যু আজ তাই উন্নত বিশ্বে অতি বিরল হয়ে উঠেছে। শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। প্লেগ, বসন্ত, কলেরা, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতি নানা কালব্যাধি আজ মানুষের নিয়ন্ত্রণে। গত একশো বছরে পৃথিবীতে শিল্পপণ্যের উৎপাদন বেড়েছে অন্তত পঞ্চাশগুণ। এই শতক শেষ হতে হতে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হবে নগরবাসী।

কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে ধাতু, খনিজ, জ্বালানি, বন প্রভৃতি নানা বস্তুসম্পদ নিঃশেষ হয়ে আসার আশঙ্কা। বহু জীবকুল পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। জৈবপ্রযুক্তি উদ্ভবের ফলে নতুন নতুন ধরনের জৈববস্তু সৃষ্টি হচ্ছে; উদ্ভিদ ও প্রাণীর চরিত্র মানুষ ইচ্ছেমতো বদলে দিতে শিখছে। শিল্পক্ষেত্রে সৃষ্টি হচ্ছে নানা নতুন নতুন ধরনের বিষাক্ত বস্তু, প্রকৃতিতে আপনা আপনি ক্ষয়ে যায় না এমনসব বর্জ্যপদার্থ। আর এত বিপুল আকারে এসব বস্তু তৈরি হচ্ছে যা পরিবেশের ওপর সৃষ্টি করছে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া। এবং সবকিছু মিলিয়ে মানুষের সমগ্র উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার প্রকৃতি কী হবে এবং পরিবেশের ওপর তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কী ঘটবে এই প্রশ্নটি আজ রীতিমতো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ মানুষের দারিদ্র্যও আজ প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর এক বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভূমিহীন, গৃহহীন, নিরন্ন মানুষের কাছে পরিবেশের ভারসাম্যের চেয়ে বেশি জরুরি জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ; পুকুরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা তার পক্ষে দুঃসাধ্য; বিশুদ্ধ পানীয় জল তার কাছে দুর্লভ। অনেক ক্ষেত্রে এসব মানুষ অসম সমাজব্যবস্থার শিকার হয়ে মানুষের সকল সম্পদের ওপরই মারমুখী। প্রায়শ এসব দরিদ্র মানুষ শিক্ষাবর্জিত, নিরক্ষর

banglainternet.com

—তাদের সবার কাছে তাই উন্নত নাগরিক-চেতনা বা পরিবেশ-সংক্রান্ত গভীর উপলব্ধি প্রত্যাশা আকাশ-কুসুম কল্পনা।

পৃথিবীতে শিল্পপণ্যের উৎপাদন দ্রুতগতিতে বাড়ছে। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধিও আজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে এগিয়ে আছে। কিন্তু তবু তাতে পৃথিবীর সামগ্রিক দারিদ্র্য পরিস্থিতির সুরাহা হচ্ছে না। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে গত তিন দশকে স্থির মূল্যে মাথাপিছু বার্ষিক আয় বাড়ছে না; মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণও কমছে। ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে শতকরা ৬০ ভাগের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে; দারিদ্র্যসীমার নিচে জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ। অনেকটা এমনি অবস্থা ঘটছে পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে।

জাতিসংঘের উদ্যোগে সত্তরের দশকের শুরুতে এক সুষম নতুন আন্তর্জাতিক আর্থব্যবস্থার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল; কিন্তু তার অগ্রগতি শম্বুকসদৃশ। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দরিদ্র দেশেই আজ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুধু নয়, জাতীয় অর্থনীতির বড় অংশ নির্ভরশীল বিদেশী সংস্থার ঋণের ওপর। আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত অনেক দেশেরই রপ্তানি আয়ের প্রধান অংশ চলে যাচ্ছে ঋণের সুদ যোগাতে (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় বিশ শতাংশ)। এমনি ঋণে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি দেশ দেউলে হবার উপক্রম হয়েছে। ঋণের সুদ যোগাতে উন্নয়নশীল দেশগুলো ক্রমেই বেশি করে রপ্তানি করতে বাধ্য হচ্ছে আর দেশের লোককে অভুক্ত রেখে বাইরে চলে যাচ্ছে প্রোটিন খাদ্য, ফলমূল এবং খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি অনবায়নযোগ্য সম্পদ। অর্থাৎ এক অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিগড়ে বাঁধা পড়ে দরিদ্র দেশের দারিদ্র্য না কমে বরং আরো বাড়ছে, তাদের পরিবেশগত সমস্যার সুরাহা না হয়ে আরো জটিল হচ্ছে। উন্নত দেশের যেসব পণ্য ও যেসব কলকারখানা বেশি করে পরিবেশ দূষণ ঘটায় সেগুলো ক্রমেই চালান হয়ে যাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশে।

পরিবেশের উন্নয়নের পথে আজ আরেক প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সমরায়োজন। পৃথিবীতে আজ প্রতি বছর সমরায়োজনে ব্যয় হচ্ছে প্রায় এক লক্ষ কোটি ডলার—অর্থাৎ পৃথিবীর নারী-শিশু-বৃদ্ধ প্রতিটি মানুষের মাথাপিছু দুশো ডলার (বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয়ের চেয়ে বেশি)। এই অঙ্ক সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনের (১৫ লক্ষ কোটি ডলার) সাত শতাংশের মতো এবং উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে যে সাহায্য দেয় তার ২৫ গুণেরও বেশি। উল্লেখ্য যে, সমগ্র পৃথিবীতে শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় এই অঙ্কের মোটামুটি অর্ধেক আর স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য ব্যয় হয় মোটামুটি এক-চতুর্থাংশ। স্পষ্টতই রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকগণ এক অবাস্তব নিরাপত্তা ব্যবস্থার মায়ার হরিণের পেছনে

ছুটে চলেছেন। প্রচণ্ড বিধ্বংসী পরমাণু অস্ত্র, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, 'তারকা-যুদ্ধ', রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের মধ্যে নিরাপত্তা সন্ধান করতে গিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রচণ্ড পারমাণবিক ধ্বংসের যে ভয়ালবিভীষিকার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে সে সত্য আজ ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

পরিবেশগত সমস্যাগুলো কোনো বিশেষ দেশের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে না—এসম্পর্কেও আজ সচেতনতা বাড়ছে। জলবায়ু যেমন একই সঙ্গে দেশজ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক, তেমনি পরিবেশের সমস্যাগুলোও সহজেই দেশের সীমা ডিঙ্গিয়ে যায়। তাই এক্ষেত্রে আজ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দাবি জোরালো হয়ে উঠছে। পরমাণু অস্ত্র রোধের জন্য নানা আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, মহাকাশ ও সমুদ্রসম্পদ বিষয়ে জাতিসংঘ সনদ গৃহীত হয়েছে, 'সার্ক' প্রভৃতি আঞ্চলিক সহযোগিতা কর্মসূচিতে পরিবেশ-বিষয়ক কিছু কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

আরো একটি সত্য আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, পরিবেশগত সমস্যার সমাধান শুধু রাষ্ট্রনায়ক বা নীতিনির্ধারকদের বিবেচনার বিষয় নয়। এ সমস্যার সমাধান নির্ভর করে প্রকৃত অর্থেই সমগ্র জনসমাজের সচেতন কর্মোদ্যোগের ওপরে। এ জন্য বিশেষ করে প্রয়োজন সমগ্র জনসমাজের মধ্যে পরিবেশ-বিষয়ক জ্ঞান ও উপলব্ধির সঞ্চার। তার জন্য যেমন আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবেশের জ্ঞানকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন তেমনি অনানুষ্ঠানিকভাবে নানা তথ্য-সম্প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমেও পরিবেশ-সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশে ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন (১৯৭২-৭৪) এ বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই কমিশনের সুপারিশ অনুসরণ করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটি (১৯৭৫-৭৭) পরিবেশ-বিষয়ক বিবেচনাকে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল স্তরের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে রয়েছে 'মানুষ ও তার পরিবেশ', 'পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপায়', 'অঞ্চল ও আঞ্চলিক পরিবেশ'; চতুর্থ শ্রেণীতে আছে 'স্বাস্থ্যকর পরিবেশ', 'পরিবেশ সংরক্ষণ', 'পরিবেশ ও মানুষের জীবনযাত্রা', পঞ্চম শ্রেণীতে রয়েছে 'মানুষ ও পরিবেশ—পারস্পরিক সম্পর্ক।' মাধ্যমিক স্তরে ষষ্ঠ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের পড়তে হয় 'জনসংখ্যা, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য', সপ্তম শ্রেণীতে 'প্রাণী ও উদ্ভিদের পরস্পর-নির্ভরতা', 'জনসংখ্যা ও পরিবেশ দূষণ', অষ্টম শ্রেণীতে 'জনসংখ্যা ও পরিবেশ'। এছাড়া নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞানের বিষয়সূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'মানুষের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা।

banglainternet.com

বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরিবেশ শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার ক্ষেত্রে 'মাধ্যমিক বিজ্ঞানশিক্ষা প্রকল্প' কিছুটা অবদান রাখছে। এই প্রকল্পের আওতায় চার হাজার মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক উপকরণ ও বইপত্র, চার্ট ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে; তার মধ্যে ১৭০০ প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান পরীক্ষাগার এবং শ্রেণীকক্ষ নির্মিত হচ্ছে। ন'টি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে 'মাধ্যমিক ও বিজ্ঞান শিক্ষা-কেন্দ্র' স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ২৫০০০ শিক্ষককে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদনের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হচ্ছে।

এই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় চারশো বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠেছে; এদের মধ্যে অনেকগুলি ক্লাব পরিবেশ সংরক্ষণ-বিষয়ক নানা কর্মসূচি গ্রহণ করছে। 'প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ সমিতি', 'বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক সমিতি', 'বাংলাদেশ বিজ্ঞানশিক্ষা সমিতি', 'বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেও পরিবেশ-বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির নানা উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারের পরিবেশ-দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে পরিবেশ-সংক্রান্ত কিছু কিছু গবেষণামূলক কার্যক্রমও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সমস্যার বিপুলতা ও দেশের প্রয়োজনের তুলনায় এসব উদ্যোগ অতি সামান্য। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে ঢাকার কাছে শীতলক্ষ্যা, চট্টগ্রামের কাছে কর্ণফুলি ও খুলনার কাছে রূপসা নদী আজ মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে উঠেছে। উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজনে যত্রতত্র রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলে জলপ্রবাহের স্বাভাবিক গতিধারা রুদ্ধ হয়ে প্লাবনের সমস্যা ক্রমাগতই বাড়ছে। উন্নয়ন তৎপরতার ফলে এ ধরনের যেসব পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে সে সম্পর্কে বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ এবং সে সবের সমাধানের উপায় নিরূপণের জন্য ব্যাপক উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে।

এ দেশের মানুষ পরিবেশের সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে চলার জন্য নানা পন্থা অনুসরণ করে এসেছে। ক্ষেতে নানা ধরনের দেশীয় কীটনাশক ও জৈব সারের ব্যবহার করেছে কৃষক, প্রবর্তন করেছে পর্যায়-চাষ; বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন, দীঘি খনন ও পানীয় জল সরবরাহকে গণ্য করেছে পুণ্যকর্ম বলে। যেসব সনাতন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি দীর্ঘকাল ধরে এদেশের পরিবেশগত সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বা জনগণ নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আজ যেসব প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করছেন সেগুলোকে সনাক্ত করা ও উন্নত করার বিষয়েও বিজ্ঞানীদের গবেষণা নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন।

অর্থাৎ সব মিলিয়ে সারা পৃথিবীতে আজ যে বিপুল পরিবেশগত সমস্যা দেখা দিয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে সমাধানের চেষ্টা করলে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্য, সামাজিক বৈষম্য, অসম আন্তর্জাতিক আর্থব্যবস্থা, খাদ্যসমস্যা, জ্বালানি সংকট, মরুকরণ, যুদ্ধায়োজন, জীবনমান—সব সমস্যাই আজ পরস্পর-সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে। তাই এসব সমস্যার সমাধানের জন্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্বিন্যাস যেমন প্রয়োজন, তেমনি সমগ্র জনসমাজের ব্যাপক, সমন্বিত কর্মপ্রচেষ্টাও অত্যন্ত জরুরি।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন আজ আর একটি সংকীর্ণ ধারণামাত্র নয়, এর অর্থ শুধু দেশের মোট বস্তুসম্পদের বৃদ্ধিও নয়। বস্তুসম্পদের বৃদ্ধি যদি গুটিকতক মানুষের সমৃদ্ধি বা স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশকে কলুষিত করে তোলে তাহলে সে উন্নয়ন হতে পারে সমগ্র সমাজের জন্য আত্মঘাতী। তাই উন্নয়নের আয়োজনে আজ প্রয়োজন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি—উন্নয়ন চাই দেশের সব মানুষের স্বার্থে; সব মানুষের কল্যাণ ও বিবেচনাবোধের ওপর নির্ভর করবে উন্নয়নের প্রকৃতি। বলা বাহুল্য, সেজন্য দেশের সব মানুষকে দিতে হবে শিক্ষালাভের সুযোগ, পরিবেশ-সংক্রান্ত সব তথ্য জানবার ও বুঝবার সুযোগ। সব মানুষের জন্য অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা লাভের সুযোগ নিশ্চিত না করে বা অন্তত অর্ধেকসংখ্যক মানুষের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি না করে এই ব্যবস্থা বাস্তবায়ন হবে রীতিমতো দুঃসাধ্য।

উন্নয়নের সমস্যা আজ যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং যেসব ক্ষেত্রে এই ভারসাম্য বিপর্যস্ত সেখানে তার পুনঃস্থাপন। এই প্রয়োজন আজ যেমন জরুরি সারা পৃথিবীতে, বোধ করি তার চেয়েও বেশি জরুরি আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এমনি অনেক দেশে কৃষিজমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ, খনিজ সম্পদ অপ্রতুল, দীর্ঘকালের লাগামহীন শোষণের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য অতিভঙ্গুর এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার সমগ্র বিশ্বসমাজের আশঙ্কার কারণ।

আমাদের জন্য কালক্ষেপের সুযোগ নেই। এখন প্রয়োজন পরিবেশ সংরক্ষার জন্য জরুরি পদক্ষেপ, সমগ্র জনসমাজকে সচেতন করে তোলার আয়োজন। বিশেষ করে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন আজকের তরুণ সমাজকে—যাদের বিবেচনা, আচরণ ও কর্মধারার ওপরই প্রধানত নির্ভর করবে আগামী দিনের সমাজ, দেশ ও পৃথিবীর পরিবেশ।

[উৎস : *বিজ্ঞান দর্শন সংস্কৃতি*, বিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিষদ, ঢাকা, ১৯৮৮]

banglainternet.com

পরিবেশের সংকট ঘনিয়ে আসছে

সারা পৃথিবী জুড়ে পরিবেশের সংকট যে ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে এটা আজ আর বিতর্কের বিষয় নয়। প্রথম প্রথম বলা হত আঠার-উনিশ শতকে ইউরোপের শিল্প-বিপ্লব ও তার পরবর্তীকালে পৃথিবী জুড়ে নানা ধরনের প্রযুক্তিগত উন্নয়নই মূলত পরিবেশের এসব সমস্যার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু ক্রমেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে যে, শুধু প্রযুক্তির ওপর দোষ চাপিয়ে এর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়, সমস্যার শেকড় রয়েছে আরো গভীরে।

চারদিকে পরিবেশের অবনতির লক্ষণ আজ অতি স্পষ্ট। খনিজ জ্বালানিতে যেসব শিল্প-কারখানা চলে সেগুলো দিন-রাত বিপুল পরিমাণ ধোঁয়া আর নানারকম বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দিচ্ছে চারপাশের বায়ুমণ্ডলে। তার অনেকটাই আবার ক্রমে ক্রমে মাটিতে এসে পড়ছে ভূসাকালি আর অম্লবৃষ্টির আকারে; তার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে ধোঁয়াশা, নষ্ট হচ্ছে বনভূমি, ধ্বংস হচ্ছে পুকুর-হ্রদ-নদীর জীবকুল। নানা ধরনের ছোট-বড় শিল্প-কারখানা যার বেশির ভাগেরই অবস্থান কোনো জলাশয়ের কিনারায় সেসব জলাশয়ের পানিতে ফেলছে বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত বর্জ্যদ্রব্য, তাতে পানির মারাত্মক দূষণ ঘটছে। জমি থেকে আরো বেশি ফসল পাবার তাগিদে ক্রমেই বেশি করে ব্যবহৃত হচ্ছে রাসায়নিক সার আর কীটনাশক। তাতে শুধু যে জমির গুণাগুণ নষ্ট হচ্ছে তা নয়, সেসবের অনেকটাই বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়ে পড়ছে নানারকম জলাশয়ে—কখনও আমাদের খাবার পানিতে। বাতাস, মাটি আর পানির এসব দূষণ পদার্থ প্রায়শ আশ্রয় নিচ্ছে গাছপালা, পাখি, জীবজন্তু, এমনকি মানুষের দেহে। তার ফলে নানারকম রোগের সৃষ্টি তো হচ্ছেই, অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ আর প্রাণী একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বুক থেকে।

এই প্রক্রিয়ায় একটা বড় জায়গা দখল করে আছে পৃথিবী জুড়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধি। মানুষের সৃষ্টির সময় থেকে শুরু করে শিল্প-বিপ্লবের সময় পর্যন্ত আসতে আসতে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল মোটামুটি একশ' কোটি, অথচ আজ পৃথিবীতে এই পরিমাণ মানুষ বাড়ছে প্রতি দশ বছরে। যত মানুষ বাড়ছে তত জমি দখল হচ্ছে তাদের বাসভূমির জন্য, চাষবাসের জন্য, আরো নানা

পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য। সেসব বাড়তি মানুষ পরিবেশের জন্য সৃষ্টি করছে আরো বেশি বেশি দূষণযুক্ত বর্জ্য বস্তু।

কিন্তু শুধু মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি আর তার প্রযুক্তির বিকাশই কি পরিবেশের মূল সমস্যা? প্রথম দিকে এমন একটা ধারণা তৈরি হলেও ক্রমেই মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে যে, আসলে পরিবেশের অবনতির মূলে যতটা না দায়ী প্রযুক্তির বিকাশ তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে দায়ী পরিবেশের ভারসাম্যের দিকে না তাকিয়ে অনেকটা বল্গাছাড়া গোছের উন্নয়ন। এর ফলে ক্রমে ক্রমে 'টেকসই' এবং 'প্রকৃতির সঙ্গে সুসমঞ্জস' উন্নয়নের ধারণা মানুষের মনে দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম-এ মানব-পরিবেশ-সংক্রান্ত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে পরিবেশের অবনতির দু'টি প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হল উন্নত দেশগুলোতে অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অতি ভোগ, আর তার বিপরীতে বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশে বিদ্যমান গভীর দারিদ্র্য। আশির দশকের মাঝামাঝি জাতিসংঘ নিয়োজিত পরিবেশ ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমিশনের রিপোর্ট (পরবর্তীকালে 'ব্রুন্ট্‌ল্যান্ড রিপোর্ট' নামে পরিচিত) ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়; তাতেও হুবহু এই বিষয়গুলোর ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে।

তারপর মানব-পরিবেশ-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের দু'দশক পূর্তি উপলক্ষে সম্প্রতি (১৯৯২ সালে) ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো-তে অনুষ্ঠিত হল পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ে দ্বিতীয় জাতিসংঘ সম্মেলন। তাতে যোগ দিলেন দুনিয়ার নানা দেশের রাষ্ট্রপতি বা কাছাকাছি পর্যায়ের শীর্ষনেতারা; সেজন্য এর আরেক নামকরণ হল 'ধরিত্রী শীর্ষ-সম্মেলন'। এই ধরিত্রী সম্মেলনে আবারও শিল্পোন্নত দেশগুলোতে অতিভোগ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মানুষের চরম দারিদ্র্যের বিষয় বড় করে তুলে ধরা হয়। উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের কতকগুলো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে এই সম্মেলন থেকে 'উন্নয়ন ও দারিদ্র্য সংক্রান্ত বিশ্ব ফোরাম' নামে একটি নতুন সংস্থা চালু করা হয়। এই ফোরামের প্রাথমিক ঘোষণায় বলা হয়, দরিদ্র মানুষরাই হল পরিবেশের অবনতির এবং সেকারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সবচেয়ে বড় শিকার। সম্পদশালীরা সচরাচর পৃথিবীর নানা সম্পদ প্রচুর পরিমাণে ভোগ করেই যেতে থাকে; অথচ দরিদ্ররা তাদের বেঁচে থাকার মতো খোরাকও জোটাতে পারে না। তাই শেষ বিচারে পৃথিবী থেকে এই অতিদারিদ্রের সমস্যার সমাধান না করে পরিবেশের সমস্যার সমাধান কিছুতেই করা যাবে না।

banglainternet.com

আজকের পরিবেশ পরিস্থিতি

এই শতকের ষাটের দশকের গোড়া থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে যে, পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যেভাবে দ্রুত বেড়ে চলেছে তাতে জমি, গাছপালা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর বেশ চাপ পড়ছে; এর সঙ্গে প্রকৃতির সুস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা না করে বল্গাহীন ভোগ যোগ হওয়ায় মানুষ তার চারপাশের প্রকৃতিতে যতটা উন্নয়ন ঘটাচ্ছে তার অনেকটাই আবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পরিবেশের ওপর সেসবের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণে। প্রযুক্তি বিকাশের প্রথম দিকে প্রকৃতিকে দেখা হত অনেকটা যেন প্রতিপক্ষের মতো, বলা হত আমরা প্রকৃতিকে 'ব্যবহার করতে' চাই, 'জয় করতে' চাই। আজকে এই ধারণা অনেকখানি পরিমাণে বদলেছে। আজ আমরা দেখছি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীটাই মানুষের একমাত্র আবাসস্থল; আর এই আবাসস্থলের সব রকম সম্পদ বেহিসেবী ভোগের ফলে এখানকার জীবন ব্যবস্থার ভারসাম্য আজ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। তার ফলে নিছক 'ব্যবহার' আর 'জয়' নয়, বরং 'টেকসই উন্নয়ন'-এর মাধ্যমে প্রকৃতি এবং তার সূক্ষ্ম ভারসাম্যকে 'রক্ষা' এবং 'সংরক্ষণ'-এর প্রয়োজনটাই বিশেষভাবে জরুরি হয়ে উঠেছে।

আজকের পরিবেশের সমস্যার কতকগুলো বাস্তব চিত্র তুলে ধরলেই বোঝা যাবে পৃথিবীর স্বাস্থ্য আজ কী রকম সংকটজনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

- বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের মাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে: দু'শ বছর আগে অর্থাৎ ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের শুরুতে, এই হার ছিল প্রতি লক্ষ ভাগে মোটামুটি ২৮০ ভাগ, ১৯৭২ সালে এটা হয় প্রতি লক্ষে ৩২৭ ভাগ, ১৯৯৫ সালে এটা এখন ৩৬০ ভাগের ওপর।
- গত এক দশকে পৃথিবীর নিরক্ষীয় বনাঞ্চলের পরিমাণ ১৯০ কোটি হেক্টর থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১৭০ কোটি হেক্টর; প্রতি বছর বনাঞ্চলের পরিমাণ কমছে প্রায় এক শতাংশ হারে (বাংলাদেশে এই হার প্রায় দু'শতাংশ)।
- সারা পৃথিবীতে প্রায় এক কোটি প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে (যদিও এযাবৎ তালিকাবদ্ধ হয়েছে মাত্র ১৫ লক্ষের মতো); তার মধ্যে গত মাত্র দু'দশকেই প্রায় দশ লক্ষ প্রজাতি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে; সত্তরের দশকে প্রতি বছর প্রজাতি ধ্বংসের হার ছিল মোটামুটি ৩০,০০০, দু'দশক পর সে হার আজ বেড়ে দাঁড়িয়েছে বছরে ৫০,০০০-এর উপরে।
- অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা আজ অতি দ্রুত হারে বাড়ছে: ১৯৫০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে ২৫০ কোটি থেকে ৫০০ কোটি হয়েছিল, মনে হচ্ছে ২০৫০ সালের মধ্যে এই অঙ্ক আবার দ্বিগুণ হয়ে ১,০০০ কোটিতে দাঁড়াবে। মাত্র আগামী দু'দশকে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়বে প্রায় ১৭০ কোটি: এই শতাব্দীর শুরুতে সারা পৃথিবীতে যত মানুষ বাস করত এই অঙ্ক তার সমান।

পরিবেশ-সংক্রান্ত আলোচনায় সারা পৃথিবীতে আজ একটি প্রশ্ন বেশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে: সে হল পরিবেশের এই গুরুতর সংকট সৃষ্টির পেছনে প্রধানত কে দায়ী আর এ সমস্যার প্রতিকারের প্রধান দায়িত্বই-বা কার। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা সারা পৃথিবীর লোকসংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশ, অথচ তারা সারা পৃথিবীর খনিজ জ্বালানির ২৫ শতাংশ ব্যবহার করে, আর সৃষ্টি করে পৃথিবীর সব কার্বন ডাই-অক্সাইডের ২২ শতাংশ। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর মোট জনসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ৭৮ শতাংশ; তারা ব্যবহার করে পৃথিবীর মোট খনিজ উৎপাদনের মাত্র ১২ শতাংশ আর বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রায় ১৮ শতাংশ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকর গ্রীনহাউস গ্যাস সঞ্চারেও তাদের অবদান সেই অনুপাতে। এমনি নানা তথ্য থেকে আজ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলো আজ যেসব জটিল পরিবেশগত সমস্যার মুখোমুখি তার অনেকগুলোরই মূলে রয়েছে উন্নত দেশগুলোতে মানুষের অতিভোগের প্রবণতা। আর এসব সমস্যার কারণ সন্ধান এবং সেসবের প্রতিকারের দায়িত্বও তাই অনেকটাই বর্তায় পাশ্চাত্যের উন্নত ধনী দেশগুলোর ওপরে।

সেদিক থেকে দেখলে বাংলাদেশে এখনও তেমন শিল্পায়ন ঘটেনি, কাজেই বাংলাদেশ তেমন বড় আকারে কার্বন ডাই-অক্সাইড বা অন্য দূষণবস্তু উৎপাদন করে না, অথচ মূলত শিল্পোন্নত দেশগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশে যে সব জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেছে তার দায়ভাগ অনেকটাই এসে পড়ছে হতভাগ্য বাংলাদেশের ওপরে। কিছু কিছু গবেষণা থেকে দেখা গেছে, শিল্পায়নের প্রথম পর্যায়ে যে সব শিল্প স্থাপন করা হয় তার চাইতে উন্নততর পর্যায়ের শিল্প অপেক্ষাকৃত কম দূষণের জন্ম দেয়। কাজেই সমগ্র পৃথিবীর পরিবেশের স্বার্থে যেসব দেশ এখনও শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, শিল্পোন্নত দেশগুলোর কর্তব্য হল উন্নত প্রযুক্তিজ্ঞানের অংশীদার করে তাদের সহায়তা দান করা: দূষণ-নিরোধী যেসব প্রযুক্তি এখনও কেবল উন্নত দেশগুলোতে লভ্য সেগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে অবাধে সরবরাহ করা। কিন্তু তারা যে তা করতে চাইবে এমন কোনো লক্ষণ এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

banglainternet.com

সম্পদের বিপুল বৈষম্য

১৯৭২ সালে যখন জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্বপরিবেশ নিয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল তার পর থেকে পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে; কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থায় যে অন্তর্নিহিত বৈষম্য তা না কমে বরং ক্রমাগত আরো বেড়েই চলেছে। এর ফলে পৃথিবীর সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যে অবনতি ঘটছে তা অল্প কিছু দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট হবে:

* পৃথিবীতে আজ যে ১৮৫টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য তাদের মধ্যে মাত্র ৫০টি দেশের মানুষ তাদের খাদ্যে দৈনিক ক্যালরি চাহিদা মেটাতে পারে: পৃথিবীর প্রায় ৫৭০ কোটি মানুষের মধ্যে অন্তত ৮০ কোটি নিয়মিত ক্ষুধার্ত থাকে।
* পৃথিবীর মোট বয়স্ক জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় এক শ' কোটি লোক এখনও রয়েছে নিরক্ষর; প্রাথমিক স্তরে শিশুদের ঝরে পড়ার হার অন্তত ৩০ শতাংশ। পৃথিবীর সব নিরক্ষর মানুষের দুই-তৃতীয়াংশই হল নারী।
* শিল্পোন্নত দেশগুলোর লোকসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ, অথচ তারা ব্যবহার করে উন্নয়নশীল দেশের মানুষের তুলনায় প্রায় দশ গুণ বেশি বাণিজ্যিক জ্বালানি; আর এরা পৃথিবীর মোট কার্বন ডাই-অক্সাইডের ৭১ শতাংশ এবং মোট শিল্পবর্জ্যের ৬৮ শতাংশ উৎপন্ন করে।
* শিল্পোন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে যে সাহায্য দেয় তাতেও প্রধানত রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করে; যে দশটি দেশে পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ গরিব মানুষের বাস তারা পায় এই সাহায্যের মাত্র এক-চতুর্থাংশ। যেমন অপেক্ষাকৃত ধনী দেশ হল সালভাদর, যার লোকসংখ্যা বাংলাদেশের তুলনায় মাত্র চার শতাংশ আর মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের চার গুণ, সে আমেরিকার কাছ থেকে বাংলাদেশের চেয়ে ঢের বেশি সাহায্য পায়।

১৯৮০-র দশকে এসে দেখা গেল, যদিও নানাক্ষেত্রে দুনিয়া জুড়ে সাধারণভাবে মানুষের অবস্থার বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে, গোটা পৃথিবীর স্বাস্থ্যের যেন ক্রমেই অবনতি ঘটছে! পৃথিবী জুড়ে বনভূমির পরিমাণ কমে আসছে; মরু অঞ্চল বিস্তৃত হচ্ছে, মৃত্তিকার ক্ষয় ঘটছে, উদ্ভিদ আর প্রাণী প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। আকাশের উঁচু স্তরে রয়েছে ওজোন গ্যাসের এক হালকা স্তর, তা আমাদের এবং সব ধরনের জীবদেহকে ক্ষতিকর তীব্র সৌরকিরণ থেকে রক্ষা করে; এই ওজোন স্তর ক্রমেই হালকা হয়ে আসছে; আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি যেসব ক্ষতিকর

গ্যাস গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বায়ুমণ্ডলে সেগুলোর পরিমাণ ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩-১৪ জুন ১৯৯২ ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে যে "ধরিত্রী শীর্ষ-সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয় তাতে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্ব পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য একটি বিশ্ব-সনদে স্বাক্ষর দেন; এছাড়া আগামী একুশ শতকে পরিবেশ ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য "এজেন্ডা ২১" নামে একটি কর্মসূচির দলিলও গৃহীত হয়। কিন্তু এই সম্মেলন দুনিয়ার মানুষের মনে যে বিপুল আশার জন্ম দিয়েছিল তা পূরণ হবার কোনো লক্ষণ এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না; পরিবেশের মূল সমস্যাগুলোর সমাধানেও এখনও তেমন কোনো অগ্রগতি ঘটেনি।

বাংলাদেশের পরিবেশ

বাংলাদেশের নদীমেখলা কৃষিভিত্তিক জীবন এদেশের মানুষকে স্বভাবতই পরিবেশ সচেতন করে তোলে, পরিবেশকে ভালোবাসতে শেখায়। তাই এদেশের মানুষ সহজেই হয়ে ওঠে প্রকৃতিপ্রেমিক। আবার অতি ঘন জনবসতি, প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ ভৌগোলিক অবস্থান এসব এদেশের মানুষকে পরিবেশের বিপর্যয়ের নিয়মিত শিকারে পরিণত করে। এর ফলে এদেশের নীতি নির্ধারক মহল এবং জনগণ গত ক'বছরে সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, আসলে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ এবং পৃথিবীর পরিবেশের ওপর আজ মানুষ নিরন্তর যত অত্যাচার করে চলেছে তা তার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাবার উপক্রম হয়েছে।

ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর বদ্বীপ অঞ্চলগুলোর একটিতে। এদেশের জলবায়ু এমন যে, সারা বছরই এখানে কোনো না কোনো ফসল ফলানো যায়। এদেশের বিস্তৃত জলা জায়গাগুলোতেও রয়েছে প্রচুর সম্পদ—নানা জাতের মাছ, চিংড়ি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী। অবশ্য প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা, উচ্চ জনবসতি (বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮০০-র ওপরে) ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হারের কারণে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের শুধু যে দ্রুত অবনতি ঘটছে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা নিঃশেষিতই হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের একটি প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ হল তার বিপুল জলা অঞ্চল। বাংলাদেশের জলা অঞ্চলের পরিমাণ নানাভাবে হিসেব করা হয়ে থাকে : তবে মোটামুটি হিসেবে তা ৭০-৮০ লক্ষ হেক্টর অর্থাৎ দেশের মোট আয়তনের প্রায়

banglainternet.com

পঞ্চাশ শতাংশ বলে ধরা যেতে পারে। বর্ষার সময় কোনো কোনো বছর দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এলাকাই জলা অঞ্চলে পরিণত হয়। এমন বিপুল জলা অঞ্চলে বাস করে নানা জাতের বন্যপ্রাণী। অসংখ্য নদী, হাওর-বাওরে আছে বহু বিচিত্র প্রজাতির মাছ। বাংলাদেশে প্রায় ২৬০ প্রজাতির মিঠাপানির মাছের খবর জানা গেছে। খাল-বিলে দেখা যায় প্রায় ১৫০ জাতের জলজ পাখি। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় জলা অঞ্চলে এবং হাওর এলাকায় ধান হল প্রধান ফসল।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনবসতির কারণে জলা অঞ্চলগুলোতে মাছ ধরার নিবিড়তা ক্রমেই বাড়ছে। শুকনোর সময় দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলোতে মিঠাপানির সরবরাহ অনেকটা কমে আসে : তখন নদীর খাড়িতে ব্যাপকভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে লোনা পানি এসে ঢোকার কারণে সুন্দরবন এলাকায় 'ম্যানগ্রোভ' বা গরানবনের পরিবেশ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সুন্দরবন অঞ্চলের গাছপালা ব্যাপকভাবে কেটে ফেলা হচ্ছে; এসবও মৎস্যসম্পদ ধ্বংস হবার বড় কারণ। মিঠাপানির জলা অঞ্চলগুলোর অবনতির প্রধান কারণ হিসেবে নিচের বিষয়গুলো উল্লেখ করা যায়:

জনবিস্ফোরণ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের সর্বত্র বাসস্থান ও চাষের জমির ওপর বিপুল চাপ পড়ছে। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে জলা-জমি ভরাট করে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাতে মাছের আবাসস্থল নষ্ট হয়ে তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং গ্রামের লোকজন তাদের খাদ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন উপাদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কৃষিজমিতে যে সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করা হয় তার অনেকটাই ধুয়ে নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে গিয়ে পড়ে এবং সেগুলো পানির অক্সিজেন সরবরাহ কমিয়ে দিয়ে ও বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে নানা রকম জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়। এইভাবে বড় শহর অঞ্চলগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য নদীর পানিতে পড়ে তাতে ব্যাপক দূষণ ঘটাচ্ছে।

শিল্পদূষণ : বাংলাদেশে ছোট-বড় বেশিরভাগ শিল্প-কারখানাই নদীর কিনারায় অবস্থিত। এর মধ্যে আছে কাগজ ও মণ্ডের কল, কস্টিক-ক্লোরিন কারখানা, ট্যানারি, সার কারখানা, পাটকল, সুতাকল, কাপড়ের কল ইত্যাদি। এসব শিল্প-কারখানা থেকে যেসব তরল বর্জ্য নিঃসৃত হয় তা নদীর পানির অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দেয় এবং জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়।

সার ও কীটনাশক : কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য সার ও কীটনাশকের ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ছে। গত দশ বছরে বাংলাদেশে মোট রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রায় দশ লক্ষ টন থেকে বেড়ে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টনে পৌঁছেছে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় জানা গেছে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারে প্রথম অবস্থায় ফসলের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ে। কিন্তু পরে দেখা যায়

অতিরিক্ত সার ও কীটনাশকের ব্যবহার জমির গুণাগুণ নষ্ট করে ফেলে; তাছাড়া এসব ধুয়ে জলাশয়ে বিস্তৃত হয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে। তাতে শেষ পর্যন্ত নানারকম পোকামাকড়ের দেহে প্রতিরোধ শক্তি জন্মায় এবং তখন আর উৎপাদন তেমন বৃদ্ধি পায় না।

ভূমিক্ষয় ও পলি পড়া : গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা মিলে যে নদীসমষ্টি সারা বাংলাদেশকে বেষ্টন করে আছে তা প্রতি বছর প্রায় ২৪০ কোটি টন পলি আর তলানি বয়ে নেয়; এর বেশির ভাগই হল নদীর পাড় ভাঙ্গা থেকে উৎপন্ন। এ ধরনের পাড় ভাঙ্গার ফলে প্রায়শ উর্বর কৃষিজমি নষ্ট হচ্ছে আর নদীর খাত ভরাট হয়ে গিয়ে তার বাস্তুসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ভৌত নির্মাণ : সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে অনেক রাস্তাঘাট তৈরির সময় পানির স্বাভাবিক প্রবাহের দিকের কথা মনে রাখা হয়নি। এর ফলে পানির নিয়মিত প্রবাহ ব্যাহত হয়ে কোথাও কোথাও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে; আবার অন্যত্র পানির অভাব দেখা দিয়েছে। তেমনি বন্যা ঠেকাবার জন্য অনেক নদীতে বাঁধ প্রভৃতি তৈরি করা হয়েছে কিন্তু এসব নির্মাণের দীর্ঘকালীন পরিবেশগত ফল কী হবে তা বিবেচনা করে দেখা হয়নি। এ ধরনের নির্মাণের কারণে নদীর খাতে তলানি পড়ার হার বেড়েছে, তাতে পানির প্রবাহ কমে গিয়েছে এবং অবশেষে আরো বড় ধরনের বন্যা ঘটছে। সেজন্য সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্বব্যাংকের উদ্যোগে যে 'বন্যা নিরোধ কর্মপরিকল্পনা' হাতে নেওয়া হয়েছে তার তীব্র সমালোচনা করা হচ্ছে। সবগুলো বড় নদীর ধারে উঁচু বাঁধ দিয়ে বর্ষাকালীন পানির প্রবাহ নদীর খাতে সীমাবদ্ধ রাখা এই পরিকল্পনার একটি প্রধান দিক। অনেক বিশেষজ্ঞ এ পরিকল্পনার নানা ক্ষতিকর পরিবেশগত অভিঘাতের আশংকার কথা বলছেন : যেমন হঠাৎ কোনো কারণে কোথাও বাঁধ ভেঙ্গে গেলে বা ক্রমে ক্রমে তলানি পড়ার ফলে নদীর তলা উঁচু হয়ে উঠলে দেশের জলা অঞ্চলগুলোর ওপর এবং বন্যপ্রাণীদের ওপর তার বড় রকম বিরূপ প্রভাব পড়বে।

'উন্নয়ন' থেকে ক্ষতি

কথাটা শুনতে কিছুটা অদ্ভুত শোনায়, কিন্তু কখনও দেখা যায় সরকার বা আর কোনো সংস্থার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে নানা রকম অপ্রত্যাশিত পরিবেশগত সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সে উন্নয়ন হতে পারে কৃষির, শিল্পের অথবা আর কোনো ক্ষেত্রের। এমনিতেই মানুষের সভ্যতা বিস্তারের ফলে নানারকম উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাতে তাদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে উঠছে।

banglainternet.com

বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান সম্পদ হল অপেক্ষাকৃত ছোট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ব্যাপক বৈচিত্র্য। এদেশে এ যাবৎ ১২৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৫৭৯ প্রজাতির পাখি, ১২৪ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ১৯ প্রজাতির উভচরের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। এসব উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনযাত্রার ওপর তীরভূমি উদ্ধার, কৃষিজমির বিস্তার, নদী ভাঙনের ফলে বড় নদীগুলোর অববাহিকায় অতিরিক্ত পলিপড়া—এ ধরনের পরিবেশগত পরিবর্তনের ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। এর ফলে অনেক বড় আকারের স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি ও সরীসৃপ সাম্প্রতিককালে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে; অবিলম্বে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আরো অনেকগুলো শীগ্‌গিরই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অবস্থা বর্তমানে এমন সঙ্গিন হয়ে উঠেছে যে, মনে করা হয় দেশের মোট প্রায় ৮৪৭ প্রজাতির মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে ১৫টি মাত্র গত কয়েক দশকে বিলুপ্ত হয়েছে এবং আরো ৩৩টি প্রজাতি বিলুপ্ত হবার পথে।

পরিবেশের অবনতির ফলে পৃথিবীর এ অঞ্চলে সাম্প্রতিককালে বন্যা, সাইক্লোন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েছে; বাংলাদেশের ওপর তার বড় রকম প্রভাব পড়ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন ঘন ঘন বন্যা, আরো বেশি ভূমিক্ষয়, অস্বাভাবিক খরা এবং গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল পানিতে তলিয়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা আরো সংকটজনক হয়ে উঠবে।

অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতিতে ভালো খবর যে কিছুই নেই তা নয়। গত দু'দশকে বাংলাদেশের সরকার পরিবেশের সংরক্ষণের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। ১৯৮২ সালে একটি পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ সৃষ্টি করা হয়; পরবর্তীকালে এটিকে পরিবেশ অধিদপ্তর নামকরণ করা হয় এবং ১৯৮৯ সালে নবগঠিত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। ১৯৮০-র দশক জুড়ে দেশে পরিবেশের নানা সমস্যা নিয়ে সচেতনতার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৯০ সালকে পালন করা হয় 'পরিবেশ বর্ষ' হিসেবে; ১৯৯১-৯৯ সালকে পালন করা হচ্ছে 'পরিবেশ দশক' হিসেবে। দেশে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে সরকার দেশ থেকে ব্যাঙের পা এবং সব রকম পশু-পাখির রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছেন। নতুন পলিথিন ব্যাগ তৈরির কারখানা স্থাপনও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এসব পদক্ষেপ সরকার ও জনগণের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়ে আগ্রহের পরিচয় দেয়। একটি জাতীয় পরিবেশ নীতি চূড়ান্ত করা হয়েছে; আশা করা যায় তার বাস্তবায়ন অদূর ভবিষ্যতে দেশের পরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট অবদান রাখবে।

দারিদ্র্য ও পরিবেশ পরিকল্পনা

এটা সবারই জানা যে, বাংলাদেশে দারিদ্র্য সর্বব্যাপী। দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় গড়ে মাত্র ২১০ ডলার, আর দেশে এ যাবৎ তেমন কোনো খনিজ সম্পদ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। আজ থেকে দু'শ-আড়াইশ' বছর আগে অর্থাৎ ইংরেজদের আবির্ভাবের সময়ে, এদেশ দুনিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ বলে বিবেচিত হত; কিন্তু আজ বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। আরো বেশি উদ্বেগের ব্যাপার হল দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে;

> সম্পদের অপ্রতুলতা, বিশেষ করে সরকারি পর্যায়ে, ক্রমেই বেশি করে প্রকট হয়ে উঠছে।... প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ জনশক্তি কোনো উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত নয়। দক্ষতা ও সাক্ষরতার রয়েছে দারুণ অভাব। ... প্রায় অর্ধেকসংখ্যক পরিবার তাদের নিম্নতম দৈনন্দিন খরচ মেটাতে পারে না। গত ২০ বছরের মধ্যে এ অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং এর প্রভাব পড়ছে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে।
>
> (Human Development in Bangladesh. Dhaka: UNDP, 1992. pp. 44-45)

এই একই রিপোর্টে বলা হয়েছে, এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে যাদের প্রবৃদ্ধির হার সবেচেয়ে কম বাংলাদেশ তাদের দলে পড়ে। বাংলাদেশে মানুষের গড় প্রত্যাশিত আয়ু মাত্র ৫২ বছর, আর এদেশটি দুনিয়ার মাত্র তিনটি দেশের মধ্যে একটি যেখানে মেয়েদের গড় আয়ু পুরুষদের তুলনায় কম। এদেশে গড়ে পাঁচটি শিশুর মধ্যে একটি মারা যায় পাঁচ বছর বয়স হবার আগেই; এই শিশুমৃত্যুর হার দুনিয়ার ১০৬টি দেশের ওপরে। ১৯৩৭ ও ১৯৮৬ সালের মধ্যে পাঁচ দশকে বাংলাদেশে দৈনিক মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ২,৭৪৩ থেকে নেমে হয়েছে মাত্র ১,৯২৭; এই কমার ধারা এখনও অব্যাহত আছে। জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক রয়েছে দারিদ্র্যসীমার নিচে, কাজেই তাদের ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ স্বভাবতই এই গড় হারের চেয়েও কম।

এমন দুর্গত অবস্থায় স্বভাবতই দেশের জনগণের চরম দারিদ্র্যের লাঘব না করে সুস্থ পরিবেশ রচনার উদ্যোগ গ্রহণ একেবারে অসাধ্য না হলেও তবে একান্তই দুরূহ কাজ। এই পরিপ্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কেউ কেউ উন্নয়ন আর পরিবেশকে দেখেন দুই প্রতিপক্ষ হিসেবে; যেন এরা পরস্পরের একেবারে বিপরীত। আসলে উন্নয়ন আর সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যবস্থাপনা হবার কথা পরস্পরের সহযাত্রী ও পরিপূরক। পরিবেশের সংরক্ষণ হল

banglainternet.com

উন্নয়নেরই একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ । যথাযথ পরিবেশ সংরক্ষণ ছাড়া উন্নয়নের সকল উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে উন্নয়ন না ঘটলে বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট সম্পদ জুটবে না এবং পরিবেশ সংরক্ষণের সব উদ্যোগ হবে ব্যর্থ। উন্নয়নশীল দেশগুলো স্বভাবতই উন্নয়ন ছাড়া টিকতে পারে না। তাদের উন্নয়নের গতি কমাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, বরং এই গতি আরো ত্বরান্বিত করা দরকার। তাদের আরো বেশি করে প্রযুক্তি ব্যবহারও প্রয়োজন; তবে সে প্রযুক্তি হতে হবে যথাযথ ধরনের, কম অপচয়মূলক, কম দূষণকারী, বেশি দক্ষ এবং পরিবেশের জন্য অনুকূল।

গত ক'বছরের পরিবেশবাদী আন্দোলনের একটি মূল্যবান শিক্ষা হল পরিবেশের সমস্যা যেহেতু সমগ্র জনসমাজকে স্পর্শ করে, কাজেই পরিবেশের সংরক্ষণের ব্যাপারেও সমগ্র জনসমাজকেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এজন্য একটি জরুরি প্রয়োজন হল সমগ্র জনগণের মধ্যে বুনিয়াদি শিক্ষার বিস্তার। প্রায়শ জনগণ অজ্ঞতাবশত পরিবেশের ক্ষতি করে বসে। সারা পৃথিবীতে আজ প্রায় ৯৪ কোটি লোক রয়েছে নিরক্ষর, তাদের মধ্যে ৯০ শতাংশেরই বাস হল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এ অবস্থার আশু পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশে মোট বয়স্ক জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশ লিখতে পড়তে পারে না। প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে সবাই স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় না; আবার যারা যায় তাদের মধ্যেও অর্ধেকের বেশি প্রাথমিক স্কুল শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে। এদেশে পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু শুধু এই ঘোষণাই যথেষ্ট নয়। দেশের অন্তত ৮০ শতাংশ ছেলেমেয়ের জন্য আট-বছর মেয়াদী বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে দেশের বিপুলসংখ্যক বয়স্ক মানুষের জন্যও চাই উপানুষ্ঠানিক বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা। এই বুনিয়াদি শিক্ষায় ভাষা সাক্ষরতা ও গণিত সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশগত ও প্রযুক্তিগত সাক্ষরতাও সব মানুষের কাছে লভ্য করে তোলা প্রয়োজন।

সমস্যার দু'মুখো সমাধান

সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের মতো অতি দরিদ্র একটি দেশে দারিদ্র্য দূর করার উদ্যোগ আর প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উদ্যোগ হাত ধরাধরি করে চলতে হবে। একেবারে দরিদ্র যারা তাদের স্বনির্ভর হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার সুযোগ করে দিতে হবে যাতে তারা নিজে থেকেই পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। এভাবেই শুধু আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসের উপযোগী দেশ উপহার দিয়ে যেতে পারব।

পরিবেশের সমস্যার সমাধানের জন্য দু'পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে: রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় পর্যায় এবং স্থানীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়। জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনায় যেমন পরিবেশ সম্পর্কে কতকগুলো বিশেষ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে তেমনি সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিটি পরিকল্পনায় পরিবেশ-সংক্রান্ত বিবেচনাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি ছাড়াও এমন অনেক পদক্ষেপ রয়েছে যা ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত হতে পারে। এসব পদক্ষেপের প্রধান লক্ষ্য হবে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং পরিবেশের ভারসাম্যকে সুসংহত করা। এমনকি অনেক ছোটখাট কাজের মধ্য দিয়ে আমরা ব্যক্তিগতভাবে পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারি।

আমাদের পূর্বপুরুষদের চাইতে আমাদের সামনে প্রকৃতি ও পরিবেশকে বোঝার এবং তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করবার সুযোগ অনেক বেশি। সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে নানা অগ্রগতি আমাদের অনেক নতুন নতুন উপলব্ধি ও হাতিয়ার দিয়েছে। আজ এমন সব নীতি এবং কার্যসূচি গ্রহণ করতে হবে যা পরিবেশের সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করবে, বিরল সম্পদের বিকল্প উদ্ভাবনে উৎসাহিত করবে এবং পরিবেশের সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়তা দেবে।

[উৎস : *পরিবেশের সংকট ঘনিয়ে আসছে*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৬]

banglainternet.com

জলাজমি যেন সোনার খনি

ভরা বর্ষায় বাংলাদেশের মাঠঘাট পানিতে থই থই করে। প্রতি বছরই বর্ষাকালে এদেশে এমন হয়। শহরের রাস্তাতেও প্যাচপেচে কাদা হয়, গ্রামের পথে তো কথাই নেই। অনেক জায়গায় পানির জন্য যাতায়াত হয় দুঃসাধ্য, কোথাও কোথাও নৌকো বা ভেলাই হয় একমাত্র ভরসা। হাজার হাজার লোকের ঘরবাড়ি ডুবে যায় পানিতে, তাদের কষ্টের সীমা থাকে না। এমন দেশে জলাজমিকে সোনার খনির সঙ্গে তুলনা করা হয়তো পরিহাস বলে মনে হবে। তা হোক, তবু বিজ্ঞানীরা বলছেন কথাটা সত্যি।

জলা জায়গা যে শুধু মাছের আবাস তা নয়; জলাভূমিতে জন্মায় হাজার রকম জলজ উদ্ভিদ আর প্রাণী। এসব উদ্ভিদ আর প্রাণী বন্দি করে রাখে সূর্যের শক্তিকে। উদ্ভিদেরা মানুষের জন্য সৃষ্টি করে অক্সিজেন; মাছ ও অন্যান্য প্রাণী দেয় প্রচুর প্রোটিন আর অন্যান্য খাদ্য-উপাদান। জলা জায়গা সূর্যের শক্তি যেভাবে জমা করতে পারে সচরাচর সমান পরিমাণ জায়গায় ডাঙ্গায় এমন হয় না। তাই এসব এলাকা বিজ্ঞানীদের চোখে সবচেয়ে সুফলা অঞ্চল বলে গণ্য। এমনি জলা জায়গায় যে পরিমাণ ও যত বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্মায় তার সঙ্গে কেবল আমাজানের মতো নিরক্ষীয় বনাঞ্চলের তুলনা করা চলে। আর এজন্যই জলা জায়গাগুলো বহু প্রজাতির যাযাবর ও অন্যান্য ধরনের পাখিদের প্রজনন ও চারণক্ষেত্র।

মানুষের আবাস ও বিচরণ প্রধানত মাটির ওপরে। তাই তার সভ্যতাও মূলত ডাঙ্গাকে ভর করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু তবু জল-পরিবেশকে বাদ দিয়ে মানুষের চলে না। নদী-সমুদ্রের ওপর দিয়ে অজস্র জলযান আমাদের যাতায়াতকে সহজ করে; নদী-হ্রদ-সমুদ্র যোগায় মাছ এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী। জলাজমিগুলো তার বুকে টেনে নেয় প্লাবনের পানিকে; সুষম রাখে জলবায়ু। কিন্তু তার পরও আমরা প্রায়শ ভুলে যাই যে, আমাদের এই পৃথিবীর ওপরকার মাত্র ২৯ শতাংশ এলাকা ডাঙ্গা, বাকি ৭১ শতাংশই জলভাগ। আর ডাঙ্গার এলাকাতেও জলাজমিগুলো মানুষের অর্থনীতি আর জীবনযাত্রায় বিপুল প্রভাব বিস্তার করে আছে।

পৃথিবীর ওপর মানুষ প্রভৃতি প্রাণী, বিপুলসংখ্যক কলকারখানা আর যানবাহন কেবলই নানা ধরনের জ্বালানি পুড়িয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি করছে; সেই কার্বন ডাই-অক্সাইডে কলুষিত হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডলকে শোধনের দায় বহন করছে গাছপালা। গাছপালা সালোক-সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড আত্মস্থ করে তাকে পরিণত করছে খাদ্যে, আর বিনিময়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়ে দিচ্ছে আমাদের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় অক্সিজেন। এই পদ্ধতিতে সারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যত অক্সিজেনের যোগান আসছে তার প্রায় সত্তর শতাংশ দিচ্ছে সমুদ্রের শেওলা, প্লাঙ্কটন প্রভৃতি উদ্ভিদ। এছাড়া সারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া, জলবায়ু এসবের পেছনেও বিরাট ভূমিকা রয়েছে পৃথিবীর জলমণ্ডলের।

ডাঙ্গার ওপরকার যে জলা জায়গা তার কথাতেই আসা যাক। পৃথিবীর ওপর এ ধরনের জলা জায়গার মোট পরিমাণ আজ খুব বেশি নয়; সারা পৃথিবীর হিসেব নিলে দু'তিন শতাংশের মতো হবে। এর মধ্যে পড়ে নানা এলাকায় বিল, খাল, নালা, জলাভূমি, নদী, হ্রদ, পুকুর, দীঘি, খাঁড়ি, নদীমোহনা, হাওর, বাওর এ সবই। এসব এলাকায় কোথাও কোথাও পানি থাকে সারা বছর; কোথাও পানি থাকে বছরের খানিকটা সময়। কোথাও পানি আবদ্ধ, স্থির, কোথাও পানিতে প্রবাহ আছে। কোথাও এসব জলাশয় রয়েছে আবহমান কাল থেকে, কোথাও সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রতিককালে।

আসলে পৃথিবীতে জলাজমির পরিমাণ আগে আরো অনেক বেশি ছিল। মানুষের সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জলাজমির পানি ছেঁচে ফেলে বা ভরাট করে সেসব এলাকায় মানুষ বসত গড়ে তুলেছে বা চাষের জমি তৈরি করেছে। এই শতকের ষাটের দশকে যখন সারা পৃথিবী জুড়ে পরিবেশ দূষণ ও অবনতি সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে উঠতে থাকে তখন এসব জলাজমির গুরুত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে সচেতন হয়ে উঠতে আরম্ভ করেন। ক'বছর আগে হিসেব করে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যে পরিমাণ জলাজমি ছিল তার মাত্র ৯ শতাংশ অবশিষ্ট আছে; ওহায়ো অঙ্গরাজ্যে আছে ১০ শতাংশ, আয়োয়াতে আছে ১১ শতাংশ, ইন্ডিয়ানা আর মিজৌরিতে আছে ১৩ শতাংশ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জলাজমির পরিমাণ কমতে কমতে আজ মোট জমির মাত্র পাঁচ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে যে পরিমাণ জলাজমি অবশিষ্ট আছে তার গুণগত মান দ্রুত নেমে যাচ্ছে নানা ধরনের দূষণের কারণে। এভাবে জলাজমি নিঃশেষ হয়ে আসায় সে দেশের অনেক উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী ও পাখি প্রজাতি উপযুক্ত আবাস ও খাদ্যের অভাবে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে। আজ তাই

banglainternet.com

সেদেশে জলাজমি রক্ষার জন্য নতুন করে আইন পাশ করতে হচ্ছে। কিন্তু এসব আইনও জলাজমি রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয় বলে পরিবেশবাদী বিজ্ঞানীদের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

বাংলাদেশে জলাজমি

বাংলাদেশ জলাজমির দিক থেকে বিশেষ ভাগ্যবান বলা যেতে পারে। এদেশের সত্তর থেকে আশি লাখ হেক্টর এলাকা অর্থাৎ দেশের মোট জমির প্রায় অর্ধেক জলাজমি বলে গণ্য হতে পারে। এর মধ্যে তিনটি বিশাল নদীপ্রবাহের (গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও সুরমা-মেঘনা) অববাহিকায় সাত-আট লাখ হেক্টর এলাকা স্থায়ীভাবে জলমগ্ন থাকে। ছোট বড় শাখানদী-উপনদী মিলিয়ে ৭০০ নদ-নদী (প্রায় ২৪,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ) জুড়ে আছে প্রায় পাঁচ লাখ হেক্টর এলাকা। এক হাজারের ওপর বিল, হাওর-বাওর মিলিয়ে অধিকার করে আছে প্রায় দু'লাখ হেক্টর। প্রায় এক লাখ হেক্টর জুড়ে আছে বড় বড় দীঘি আর প্রায় দেড় লাখ হেক্টর জুড়ে আছে প্রায় লাখ দশেক ছোটখাট পুকুর আর জলাশয়। এছাড়া প্রতি বছর বর্ষাকালে চার-পাঁচ মাস পানিতে তলিয়ে থাকে এমন চাষের জমি আছে প্রায় ৫৮ লাখ হেক্টর। বর্ষাকালে প্রতি বছরই দেশের প্রায় অর্ধেক এলাকা (কোনো বছর তিন-চতুর্থাংশ) পরিণত হয় জলাজমিতে।

এসব জলাজমি বিপুল পরিমাণ মাছ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আবাস। বাংলাদেশের নদ-নদী-বিল হাওরে প্রায় ২৬০ প্রজাতির মিষ্টি পানির মাছ জন্মায়। পানির ধারে বাস করে প্রায় ১৫০ প্রজাতির পাখি। বাংলাদেশের প্রায় পঞ্চাশ লাখ লোকের জীবিকা নির্ভর করে মাছ ধরার ওপর। দেশে প্রতি বছর মিঠা পানির মাছ, চিংড়ি, ব্যাঙ প্রভৃতি জলজ প্রাণী ধরা হয় প্রায় আট লাখ টন। এসব আমাদের খাদ্যে অতি জরুরি প্রোটিন সরবরাহ করে; এর বেশ খানিকটা অংশ রপ্তানিও হয়। কিন্তু আজ বাংলাদেশে জলাজমি নানাভাবে সঙ্কুচিত ও দূষিত হয়ে ওঠার ফলে অনেক প্রজাতির মাছ আর পাখি ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা এবং সিলেটের হাওর অঞ্চলের জলাজমিতে ব্যাপকভাবে ধান ও পাটের চাষ হয়। শুকনোর সময়ে জলাজমি থেকে ক্ষেতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। এসব জলাজমি ভূগর্ভের জলসমতল রক্ষা করে আমাদের পানীয় জল সরবরাহেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; অনেক সময় খোলা জলাশয় থেকে সরাসরিও পানীয় জল সংগ্রহ করা হয়। জলাজমিতে প্রচুর গরু-বাছুর চরে; জলা জায়গা থেকে সংগ্রহ করা খড় বর্ষাকালে গরুবাছুরের খাদ্য যোগায়।

দেশে জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে; তার ফলে জলাজমির ওপর আজ ক্রমেই চাপ বাড়ছে। নদী-খাল-বিল থেকে বড়-ছোট নির্বিশেষে সব মাছ ছেঁকে তোলা হচ্ছে, বিশেষ করে কোনো জলাশয় যখন মাছের ব্যবসায়ীদের কাছে ইজারা দেয়া হয় তখন তারা মাছের বংশরক্ষার কথা না ভেবে সব মাছ নিঃশেষে তুলে নেবার চেষ্টা করে। এর ফলে অনেক এলাকায় মাছের পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা ফল হয়েছে এই যে, সব অনাবাদী জমি ক্রমান্বয়ে চাষের আওতায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার ফলে অনেক বিল অঞ্চলের পানি ছেঁচে ফেলে তাকে ধানের জমিতে পরিণত করা হচ্ছে। এতে সেই এলাকার সব জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠছে। এভাবে দেশের অনেক বিল আজ শুকিয়ে উঠছে। এই প্রক্রিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল পাবনা জেলার চলন বিল। এই বিলটির এককালে আয়তন ছিল এক লাখ হেক্টরের ওপর; কিন্তু আজ তার এলাকা এক-চতুর্থাংশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবশিষ্ট অংশেরও শুধু এক-তৃতীয়াংশে এখন সারা বছর পানি থাকে। অবিলম্বে প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে চলন বিল অঞ্চলের পরিবেশের অবনতি রোধ করার আর কোনো উপায় থাকবে না।

দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে গত ক'বছর জমিতে জলসেচের জন্য গভীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভের পানি তোলা হয়েছে। তাছাড়া গঙ্গার উজানে বাঁধ দেয়াতেও এই অঞ্চলের পানি সরবরাহ কমেছে। এসব মিলিয়ে উত্তরাঞ্চলে মরুপ্রবণ জলবায়ু দেখা দিয়েছে। দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে আরেক ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। নদীর উজান থেকে মিঠা পানির সরবরাহ কমে যাওয়ায় দক্ষিণের সমুদ্র থেকে লোনা পানি নদীতে এসে ঢুকছে। তাতে উপকূল অঞ্চলের পশু-পাখি, মাছ, গাছপালা, চাষবাস ও সমগ্র জীবনধারার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

'উন্নয়ন'-এর বিপদ

অন্যান্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং নানা ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের ফলে জলাজমির পরিবেশের ওপর আজ বড় ধরনের হুমকি দেখা দিয়েছে। এই হুমকি আসছে নানা দিক থেকে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় মানুষের কৃষিজমি ও বসতির বিস্তার; শিল্প, কৃষি ও গার্হস্থ্য বর্জ্য পদার্থের দূষণ, বেহিসেবী ধরনের মাছ ধরা, গরানবন ও অন্যান্য জলাজমি অঞ্চলে ব্যাপক বৃক্ষনিধন, জল-অববাহিকার অবনতির ফলে ভূমিক্ষয়, পলি পড়া প্রভৃতি। মিঠা পানির জলাজমির অবনতির অনেকগুলো কারণ রয়েছে :

banglainternet.com

ক. দেশের জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়তে বাড়তে আজ ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮০০-র ওপর দাঁড়িয়েছে। এতে বসতি ও কৃষির জন্য সকল পতিত জমির ওপর চাপ পড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে জলাজমির পানি ছেঁচে ফেলে তাকে বসত ও চাষের কাজে লাগানো হচ্ছে। এর ফলে মাছের আবাস নষ্ট হয়ে মাছের পরিমাণ কমে যাচ্ছে; তাতে মানুষের খাদ্যে প্রোটিনের সরবরাহ ক্রমেই কমছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরেক ফল হল কৃষিজমিতে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বাড়ছে; তার একটা বড় অংশ ধুয়ে নেমে নদীর পানিতে মিশছে এবং সে পানির অক্সিজেনের সরবরাহ কমিয়ে দিয়ে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জীবন সংশয় ঘটাচ্ছে। অন্যদিকে শহরাঞ্চলে বিপুল জনসংখ্যার জৈব আবর্জনা নদীর পানিতে মিশে সে পানির দূষণ ঘটাচ্ছে।

খ. বাংলাদেশে ছোট-বড় কলকারখানার অধিকাংশই গড়ে উঠেছে নদীর ধারে। কাগজকল, সাবানের কারখানা, ট্যানারি, রাসায়নিক সারশিল্প, পাটকল, কাপড়ের কল এসব কারখানা থেকে তরল বর্জ্যপদার্থ গিয়ে নদীর পানিতে মেশে এবং তাতে অক্সিজেনের অভাব ঘটে যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে তাতে নদীর সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যু ঘটে।

গ. গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার নদী সমাবেশ প্রতি বছর প্রায় আড়াই শ' কোটি টন মাটি-কাঁকর-পলি বয়ে নিয়ে যায়। এর বেশির ভাগই আসে পাড় ভেঙ্গে পড়ার ফলে। এই পাড় ভাঙ্গার মাধ্যমে কৃষিজমির ব্যাপক ভূমিক্ষয় ঘটছে এবং এগুলো নদীর তলায় তলানি হিসেবে জমছে। এতে কোথাও চর পড়ছে, কোথাও নদীর গভীরতা কমে গিয়ে জলজ পরিবেশের অবনতি ঘটাচ্ছে।

ঘ. দেশে নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলেও অনেক ক্ষেত্রে জল-পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে অনেক রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেগুলো তৈরির সময় প্রায়শ বন্যার পানির স্বাভাবিক চলাচলের গতিধারা বিবেচনায় নেয়া হয়নি। তার ফলে পানি নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি হয়ে নানা জায়গায় জলাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছে; আবার কোথাও দেখা দিচ্ছে পানির অভাব। তেমনিভাবে বন্যার প্রকোপ কমাবার জন্য অনেক জায়গায় বাঁধ দেয়া হয়েছে কিন্তু এর ফলে যে দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া ঘটবে তার কথা হিসেবে ধরা হয়নি। বাঁধের দরুন নদীতে পলি পড়ার হার বেড়ে গিয়ে পানির প্রবাহ স্তিমিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত আরো ব্যাপক বন্যার সৃষ্টি হয়েছে।

ভুল পরিকল্পনা যে কিভাবে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে তার একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল খুলনা ও যশোর জেলায় বিল ডাকাতিয়ার জলাবদ্ধতা। এখানে এক বিশাল এলাকায় চাষের জমিকে জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানি থেকে রক্ষা করার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞদের তৈরি এক পরিকল্পনা অনুযায়ী ষাটের দশকে একটি

বাঁধ তৈরি হয়। বিল এলাকা থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়ার জন্য এই বাঁধে তিনটি স্লুইস গেটের ব্যবস্থা করা হয়। তাতে কিছুদিন এই এলাকায় প্রচুর ফসল ফলে আর কৃষকদের মুখে হাসি দেখা দেয়। কিন্তু ক'বছর যেতে না যেতেই স্লুইস গেটগুলো বিকল হয়ে পড়ে। তার ফলে কৃষকদের হাসি শীগ্‌গিরই কান্নায় পরিণত হয়।

আশির দশকের শুরু থেকে বিল ডাকাতিয়ার প্রায় ২৪ কি. মি. দীর্ঘ আর ১৬ কি. মি. প্রস্থ (প্রায় ৩২,০০০ হেক্টর বা ৩২০ বর্গকিলোমিটার) এলাকা নোনা পানিতে জলমগ্ন হয়ে আছে। নোনাধরা মাটি হয়ে উঠেছে নিষ্ফলা; প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের ঘরবাড়ি আর রুজি-রোজগার এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; কিন্তু কোনো মহল থেকে তার কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এলাকার বিক্ষুব্ধ জনগণ একত্র হয়ে সেপ্টেম্বর ১৯৯০-এ বাঁধের খানিকটা অংশ কেটে দেয় কিন্তু তাতেও সমস্যার সুরাহা হয়নি। অবশেষে সরকারের টনক নড়েছে কিন্তু তবু বিল ডাকাতিয়ার জলাবদ্ধতার সমস্যার সমাধান হতে হয়তো বিশ শতক পেরিয়ে যাবে। বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় যে বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে তাতেও ব্যাপক আকারে বাঁধ নির্মাণের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে; এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে পরিবেশের ওপর নানা ধরনের প্রতিকূল অভিঘাত পড়তে পারে বলে অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করছেন।

পরিবেশের অবনতির ফল

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কারণে জলাজমির পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে; আবার যেসব জলাজমি এখনও টিকে আছে সেসব এলাকার পরিবেশের ক্রমেই অবনতি ঘটছে। এমনি অবনতির একটি অবশ্যম্ভাবী ফল হল জলাজমিতে যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে তাদের জীবনসংশয় ঘটা।

বাংলাদেশের জীবসম্পদের বিপুল বৈচিত্র্য এদেশের একটি প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। এদেশে রয়েছে বহু প্রজাতির স্তন্যপায়ী, পাখি, সরীসৃপ ও উভচর। উপকূল অঞ্চলে গৃহায়ন, কৃষিজমির বিস্তার, ভূমিক্ষয়ের ফলে পলি পড়া প্রভৃতির কারণে জলজ পরিবেশের ওপরে যে প্রভাব পড়ছে তাতে জীবকুলের জন্য সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে গত কয়েক দশকের মধ্যে বেশ কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এবং আরো অনেক প্রজাতির অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে।

স্তন্যপায়ীর মধ্যে এক-শিং গণ্ডার, বুনো মহিষ, নীলগাই এসব এর মধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে। পাখির মধ্যে এর মধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে গোলাপী হাঁস ও বেঙ্গল ফ্লোরিক্যান; বিলুপ্তির পথে রয়েছে দেওহাঁস আর নাফতা হাঁস। সরীসৃপদের মধ্যে

banglainternet.com

ঘড়িয়াল এখন প্রায় বিলুপ্ত; বেশ কয়েকটি প্রজাতির কুমির ও কচ্ছপ বিলুপ্তির মুখে। মাছের মধ্যে মহাশোল আর নান্দিনা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সরপুঁটি বিলুপ্তির পথে। স্বভাবতই অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যেও এভাবে অনেক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে। আর ঠিক একইভাবে বিলুপ্ত হচ্ছে নানা প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ। এখন যে হারে পরিবেশের অবনতি ঘটছে তা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে যে প্রজাতি ধ্বংসের হার আরো বাড়বে তাতে সন্দেহ নেই। অবশেষে মানুষের জীবনেও তার ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

এ সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য আজই আমাদের দেশের নানা ধরনের জলজ পরিবেশ সম্পর্কে ব্যাপক জরিপ এবং গবেষণার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি এবং পরিবেশের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া নিয়েও গবেষণা শুরু করতে হবে। বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী এক জটিল খাদ্যশৃঙ্খলে বাঁধা; একের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব তাই অন্য অনেকের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। অনেক ক্ষেত্রে এসব উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের খাদ্য-বস্ত্র-ওষুধ প্রভৃতি উপকরণ যোগায়, কখনো আরো নানাভাবে আমাদের পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এসব সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান তাই আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

সচেতনতা আর সহযোগিতা

পরিবেশের সুস্বাস্থ্যের জন্য যেমন গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন জনগণের সচেতনতা। শেষ বিচারে, জনগণই পরিবেশের সঙ্গে নিরন্তর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তার উন্নতি বা অবনতি ঘটায়। তাই ব্যাপক জনগণের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে সুস্থ চেতনার বিস্তার না ঘটলে পরিবেশের সুস্থতা রক্ষা বা তার উন্নয়ন ঘটানো কঠিন।

আমাদের দেশের অনেক শহুরে মানুষের মনে বর্ষা বা বন্যা সম্পর্কে একটা ভীতিজনক ধারণা রয়েছে। কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষ বর্ষা ও বন্যাকে ঠিক এক চোখে দেখেন না; তাঁরা এ দুয়ের মধ্যে তফাত করেন এবং সময়োচিত ও যথাযথ মাত্রার বর্ষাকে তাঁদের কৃষিকাজ ও জীবনযাত্রার অবশ্য প্রয়োজন অনুষঙ্গ বলে গণ্য করেন। বর্ষার শেষে জমিতে যে পলি পড়ে তা জমির উর্বরতা বাড়ায় এবং তাকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে। এদেশের কৃষকরা সেটা ভালোভাবেই জানেন; আর তাই স্বাভাবিক মাত্রার বর্ষাকে তাঁরা ভয় তো পানই না, বরং তাকে স্বাগত জানান। এদেশের প্রকৃতি ও মানুষের এ ধরনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই আমাদের এগোতে হবে; সম্পূর্ণভাবে বন্যার পানির আগমনকে প্রতিহত করে তাই বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু এদেশের মানুষের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রচনার যে জ্ঞানগত ভিত্তি তা দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও তৈরি হয়নি। এদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে তাই পানির দেশ বাংলাদেশের জলজ পরিবেশ নিয়ে আরো প্রচুর গবেষণার এবং সেসব গবেষণার ফলাফল দেশবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজন রয়েছে।

এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পানি কিভাবে দূষিত হচ্ছে, তার ফলে বিভিন্ন আণুবীক্ষণিক জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর এবং অন্য জীবকুলের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়ছে, বিভিন্ন ধরনের দূষণের ফলাফল কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় এমনি নানা বিষয় নিয়ে ব্যাপক গবেষণার সুযোগ রয়েছে। পরিবেশগতভাবে এবং আর্থসামাজিকভাবে জলজ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার বাস্তব পন্থা নিয়েও যথেষ্ট বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে গবেষণার ফলাফল শুধু বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে। সেসব তথ্য বা প্রযুক্তি দেশের নীতিনির্ধারকদের কাছে বা সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছয় না। তার ফলে পরিবেশের দূষণ বা অবনতি আগের মতোই অব্যাহত ধারায় চলতে থাকে। আর তাই যেমন দেশের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাস্তরে তেমনি নানা ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমে পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা প্রদর্শন, পোস্টার প্রদর্শন, আলোচনা সভা প্রভৃতির আয়োজন সরকারি-বেসরকারি সকল মহলের উদ্যোগে হওয়া প্রয়োজন। বিপুল জনসংখ্যা ও আরো নানা চাপে জর্জরিত বাংলাদেশ আজ পরিবেশগত যে সব জটিল সমস্যার সম্মুখীন একমাত্র সমগ্র দেশের জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগ আর সহযোগিতার মাধ্যমেই তা মোকাবেলা করা সম্ভব।

[উৎস : *পরিবেশের সংকট ঘনিয়ে আসছে*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৬]

banglainternet.com

নদীরা হ্রদেরা কেন মরে যায়

ঢাকা শহরে আজ পাড়ায় পাড়ায় পানির সংকট। শহরে যত পানির দরকার তার অর্ধেকও সরবরাহ করতে পারছে না ঢাকা ওয়াসা। পানির অভাবে রাস্তার ধারের কলে দেখা দিচ্ছে লম্বা লাইন; কোথাও পানির জন্য হন্যে হয়ে ফিরছে মানুষ।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মরুভূমির লক্ষণ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গাছপালা নিধনের ফলে বৃষ্টিপাত কমে গিয়েছে; খরা হচ্ছে প্রায় প্রতি বছরই। ভূগর্ভের পানির স্তরও বিপজ্জনকভাবে নিচে নেমে গিয়েছে, টিউবওয়েল থেকে আর সেচের পানি উঠছে না। তার ফলে কৃষকরা তাদের হাড়ভাঙা খাটুনির ফসল শেষ পর্যন্ত ঘরে তুলতে পারছে না।

ফারাক্কা বাঁধের প্রতিক্রিয়ায় পদ্মার পানিপ্রবাহ কমতে কমতে আজ এক নিম্নতম পর্যায়ে নেমে এসেছে। এককালের প্রমত্তা পদ্মা আজ শুকনোর সময়ে মানুষ হেঁটে পার হচ্ছে। নদীর পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় শুধু যে নৌচলাচল আর মাছের সরবরাহ সঙ্কুচিত হয়েছে তা নয়, দক্ষিণের সমুদ্র থেকে নোনা পানি এসে ঢুকছে নদীগুলোতে; লবণাক্ত হয়ে উঠছে নদীর পানি, আশপাশের জমি।

—এমনি ধারার অসংখ্য দুঃসংবাদ আজ খবরের কাগজ খুললে নিত্যই চোখে পড়ে। আর এমন যে শুধু বাংলাদেশে ঘটছে তা নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে দেশে দেশে দেখা দিচ্ছে ব্যাপক মরুময়তার লক্ষণ। পৃথিবীর স্থলভাগের এক-চতুর্থাংশ হল শুকনো অঞ্চল; তার বেশির ভাগ এলাকাই আজ এমনি মরুময়তার শিকার। দুনিয়াজোড়া জমির উর্বরতা কমছে, পানির সরবরাহে সংকট দেখা দিচ্ছে। তাই জাতিসংঘ প্রতি বছর ১৭ জুন তারিখকে ঘোষণা করেছে বিশ্ব মরুময়তা দিবস হিসেবে; ১৯৯৫ সালে পালন করা হল এমনি প্রথম মরুময়তা দিবস।

পানিসম্পদ ফুরিয়ে আসছে

মানুষের জীবন আর সভ্যতার সঙ্গে পানির সম্পর্ক একেবারে ওতপ্রোতভাবে গাঁথা। কথায় বলে 'জলই জীবন'। মানুষের দেহের প্রায় ৭০ শতাংশই পানি; শুধু তা নয়, ভূপৃষ্ঠেরও প্রায় ৭০ শতাংশ পানিতে ঢাকা। এই পানি আমাদের কাজে লাগে দৈনন্দিন পানীয় হিসেবে, ঘরকন্নার ধোয়ামোছায়, চাষবাসে,

শিল্পকারখানার কাজে, মাছ প্রভৃতি খাদ্যের উৎস হিসেবে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, যাতায়াতের প্রয়োজনে। মানুষের সভ্যতায় পানি পালন করেছে এক মুখ্য ভূমিকা; আর সেজন্যই সেই অতি প্রাচীনকাল থেকে জনবসতি আর মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছে নদী, হ্রদ এমনি সব জলপ্রবাহ আর জলাশয়ের তীরে তীরে।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন, আমাদের এই পৃথিবীতে মোট পানির পরিমাণ ১৪০ কোটি ঘন কিলোমিটার। তার অবশ্য প্রায় ৯৮ শতাংশই সমুদ্রের নোনা পানি—আয়তনে হবে প্রায় ১৩৭ কোটি ঘনকিলোমিটার। আরো প্রায় ৩ কোটি ঘন কিলোমিটার পানি রয়েছে অ্যান্টার্কটিকা বা দক্ষিণ মেরুর পুরু বরফের স্তূপে আটকা। এরপর কিছু বরফ আছে উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় আর হিমশৈলে—এগুলোও অনেকটা মানুষের নাগালের বাইরে। মানুষ সরাসরি চাষবাস, কলকারখানা বা খাওয়ার জন্য কাজে লাগাতে পারে মাত্রই দু'লাখ ঘন কিলোমিটারের মতো পানি। এগুলো রয়েছে হ্রদে, নদীতে, মাটিতে, হাওয়ায়। কিন্তু এমনি সুপেয় পানির সঞ্চয় সারা পৃথিবী জুড়েই আজ ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে আসছে।

কিছুটা সেচের কাজে ব্যবহারের জন্য, কিছুটা নানা রকম রাসায়নিক দূষণের কারণে কোথাও পানি যাচ্ছে শুকিয়ে, কোথাও অতিমাত্রায় দূষিত পানি হয়ে উঠছে মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য। উন্নত দেশগুলোতে ব্যাপক আকারে শিল্পায়ন ঘটেছে; সেই সঙ্গে ঘটেছে নদী-হ্রদের ব্যাপক দূষণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে কৃষিতে রাসায়নিক উপাদানের ব্যবহার বহু গুণে বেড়েছে। অন্যদিকে মেরুপ্রদেশের হিমশৈলের আকার কমছে; পর্বতশিখরের বরফের সঞ্চয়ও কমে আসছে। জনবসতির চাপে জলাশয়গুলোকে ক্রমেই আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি। ভূগর্ভের পানির সঞ্চয়ও কৃষি আর নগরের প্রয়োজনে দ্রুত তুলে ফেলা হচ্ছে অর্থাৎ সবটা মিলিয়ে সারা পৃথিবীতে সুপেয় পানির বিপজ্জনক অভাব দেখা দিচ্ছে। আমরা যদি এখনই সতর্ক না হই তাহলে আর কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবী জুড়ে এক ভয়ঙ্কর পানি সংকট দেখা দিতে পারে।

বাংলাদেশ পানিসম্পদের দিক থেকে রীতিমতো ধনবান। এ দেশে রয়েছে ছোট-বড় প্রায় সাতশ নদ-নদী; এক হাজারের ওপর বিল আর হাওর-বাওর; প্রায় লাখ দশেক ছোটখাট পুকুর আর জলাশয়। এসব নদ-নদী-বিল-হাওরে আছে প্রায় ২৬০ প্রজাতির মাছ; পানির ধারে বাস করে প্রায় ১৫০ প্রজাতির পাখি। কিন্তু নদী, বিল আর পুকুর-জলাশয় যে চিরকাল বেঁচে থাকবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কোথাও প্রাকৃতিক কারণে, কোথাও মানুষের অবহেলায়

banglainternet.com

অনেক পুকুর-দীঘি-হাওর আজ বুঁজে যাচ্ছে; নদী-বিল মরে যাচ্ছে। বাংলাদেশ তার মূল্যবান পানিসম্পদ হারাতে বসেছে।

চলন বিল ধ্বংস হবার পথে

বৃহত্তর পাবনা-রাজশাহী চলন বিলের দৃষ্টান্ত এখানে দেয়া যায়। এককালে এই বিশাল বিল ছিল অসংখ্য মাছ আর পাখির আবাস। পলি পড়ে আর সেচের খাল কেটে পানি বের করে নেওয়ায় সে বিলের বেশির ভাগ আজ বুঁজে গেছে। একদিন যে বিল ছিল হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের এক বিশাল হ্রদ তার আকার কমতে কমতে আজ ২৫ বর্গকিলোমিটারও হবে কিনা সন্দেহ। আবার বিলের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তারও অনেকখানি এলাকায় পানি থাকে শুধু বছরের খানিকটা সময়। এ এলাকা আজ চাষবাসের অযোগ্য, বিলে আর মাছও পাওয়া যায় না। অধিকাংশ পাখি তল্লাট ছেড়ে উধাও।

আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে ১৭৮৭ সালের পর পুরনো ব্রহ্মপুত্রের স্রোত যখন যমুনার নতুন খাঁড়িতে বইতে শুরু করে তখন সে পানির ধারা গঙ্গার পানির ধারার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। তাতে করতোয়া আর আত্রাই নদীর (এই দুটো নদী তখন গঙ্গায় গিয়ে পড়ত) মুখে পলি জমতে শুরু করে। তাতে এই দুই নদীর পানি রাজশাহী আর পাবনা জেলার মাঝামাঝি নিচু জায়গায় জমে গিয়ে বিশাল চলন বিলের সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, উনিশ শতকের শেষে এই বিলের আয়তন ছিল এক হাজার বর্গকিলোমিটারের ওপরে। ইংরেজ আমলে চলন বিল এলাকা যেমন প্রচুর ফসল আর মাছের জন্য বিখ্যাত ছিল তেমনি জলদস্যুদের উৎপাতের জন্য এর অখ্যাতিও ছিল প্রচুর।

কিন্তু তারপর এই বিলে পদ্মা ও অন্যান্য নদীর বয়ে-আনা পলি জমতে থাকে। আত্রাই নদী দিনাজপুর আর রাজশাহী জেলার ওপর দিয়ে বয়ে প্রচুর বর্ষার পানি আর তার সঙ্গে পলি এনে চলন বিলে ফেলতে থাকে। বড়াল নদী আনতে থাকে গঙ্গার পানি আর সেই সঙ্গে গঙ্গার বয়ে-আনা বিপুল পরিমাণ পলি। বড়াল নদী চলন বিলের মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়ে পড়ে যমুনায়। কিন্তু যমুনায় যখন বান ডাকে তখন বড়ালের প্রবাহ যায় থেমে, তখনই পলি পড়তে থাকে সবচেয়ে বেশি। ১৯০৯ সালে এক জরিপ চালিয়ে দেখা যায় বিলের আয়তন হাজার বর্গ কিলোমিটারের ওপর থেকে ক্রমে ক্রমে কমে মাত্র ৩৭০ বর্গকিলোমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে আবার সারা বছর পানি থাকে মাত্র ৮৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায়। তখন এই বিলে প্রতি বছর পলি পড়ছিল প্রায় ৪৮ লক্ষ ঘনমিটার হারে: এ হারে পলি পড়লে গত প্রায় আট দশকে পুরো বিলের তলা অন্তত এক মিটার উঁচু হয়ে ওঠার কথা।

এরপর চলন বিল নিয়ে আরো একটা জরিপ করা হয়েছিল ১৯১৩ সালে: তাতে দেখা যায় বিলের এলাকা মাত্র ত্রিশ থেকে চল্লিশ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর থেকে এ দেশে জনসংখ্যা অব্যাহত হারে বেড়েছে। বিলের এলাকা যেমন বুঁজে গেছে তেমনি তার চারপাশে গড়ে উঠেছে মানুষের বসতি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলন বিল এলাকার পরিবেশের ওপর যোগ হয়েছে মানুষের অবহেলা আর অত্যাচার। তাতে এই বিলের পরিধি যেমন কেবলই সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে তেমনি এখানকার পরিবেশেরও অবনতি ঘটেছে।

এমনি আরেক বিপর্যয় ঘটেছে বৃহত্তর খুলনা-যশোর জেলার বিল ডাকাতিয়ায়। সত্তরের দশকে নদীতে ত্রুটিপূর্ণ বাঁধ দেবার ফলে বিল ডাকাতিয়ার চারপাশের জমি ক্রমে ক্রমে পলি পড়ে উঁচু হয়ে ওঠে; তাতে এই বিল থেকে বাইরে পানি নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যায়। বদ্ধ বিলে গাছপালা মরে পচে বিলের পানি দূষিত হয়ে ওঠে; ক্রমে ক্রমে এই মরা বিলের পানির তলায় ডুবে যায় আশেপাশের প্রায় দেড়শ বর্গকিলোমিটার আয়তনের বিশাল এলাকা। তাতে চারপাশের পরিবেশে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, চাষবাস নষ্ট হয়েছে, মানুষের জীবনে নেমে এসেছে কঠিন বিপর্যয়। চলন বিলের বিপর্যয় ঘটেছে প্রধানত প্রাকৃতিক কারণে যদিও তার মধ্যে মানুষের অমনোযোগ আর অবহেলা রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। কিন্তু বিল ডাকাতিয়ার সমস্যা সম্পূর্ণভাবে মানুষেরই সৃষ্টি।

আমাদের দেশে আরও যে সব নদী আর বিল আছে তাদের ভাগ্যেও এমনি দুর্বিপাক—হয়তো এমনি মৃত্যুর আশঙ্কা- কি আজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে?

আরল হ্রদের বিপর্যয়

পৃথিবীর তিনটি বড় হ্রদ এমন বড় যে, সেগুলো সাগরই বলতে গেলে—শুধু তাদের চারদিক স্থল দিয়ে ঘেরা: তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটি সেই কাস্পিয়ান রয়েছে মধ্য এশিয়ায়: দ্বিতীয়টি সুপিরিয়র—আছে উত্তর আমেরিকায়। আর তৃতীয়টি—আরলও রয়েছে মধ্য এশিয়ায়। ১৯৬০ সালে আরলের আয়তন ছিল ২৬,০০০ বর্গমাইল বা প্রায় ৬৭,০০০ বর্গকিলোমিটার (বাংলাদেশের অর্ধেকের কাছাকাছি)। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন আরল সাগর আজ ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর তিন দশক পরে হয়তো আরলের অস্তিত্বই থাকবে না। বিশেষজ্ঞদের মতে পৃথিবীতে মানুষের তৈরি এমন বড় ধরনের পরিবেশগত বিপর্যয় এ যাবৎ খুব কমই ঘটেছে।

মধ্যএশিয়ায় কারাকুম আর কিজিলকুম মরুভূমির মাঝখানে বিরাট এক উজ্জ্বল টিপের মতো ঝলমল করত আরল সাগরের স্বচ্ছ নীল পানি। পামির আর তিয়ানশান পর্বতমালা থেকে নেমে এসে মরুভূমির ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ

banglainternet.com

বেয়ে আরলের বুকে গিয়ে পড়ত সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার সবচেয়ে বড় দুটি নদী আমুদরিয়া আর সিরদরিয়ার প্রাণ জুড়ানো ধারা। আমুদরিয়া পড়েছে আরলের দক্ষিণ প্রান্তে আর সিরদরিয়া উত্তর প্রান্তে। এই দুটি নদীর ধারে ধারে গড়ে উঠেছে জনপদ। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি তাশখন্দ, সমরখন্দ, বোখারা এই এলাকারই আশেপাশে।

হ্রদের পানিতে একদিন বাস করত বিপুল পরিমাণ মাছ আর অন্যান্য জলজ প্রাণী। ধারে ধারে পানিতে সৃষ্টি হয়েছিল বিপুল নলখাগড়ার বন। হ্রদের তীরে গড়ে উঠেছিল মাছ ধরার বন্দর, দিগন্তজোড়া গোচারণভূমি।

সোভিয়েত বিপ্লবের পর পরই সে দেশের নেতারা স্থির করলেন তাঁদের দেশকে তুলা উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। উজবেকিস্তান আর কাজাখস্তানের লক্ষ লক্ষ হেক্টর তুলার ক্ষেতে আমুদরিয়া আর সিরদরিয়া থেকে সেচের পানি সরবরাহ করা শুরু হয় ১৯১৮ সাল থেকে। তার ফলে ১৯৩৭ সাল নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের চাহিদা মিটিয়ে তুলা বিদেশে রপ্তানি করতে শুরু করে। আর আরলের বিপদের সূত্রপাতও প্রায় তখন থেকেই—যদিও ষাটের দশকের আগে বিপদের রূপটা কেউই ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি।

আরল সাগর ষাট, সত্তর আর আশির দশকে মধ্য এশিয়ার অর্থনীতিতে বিরাট রূপান্তর আনে। এ সময়ে এ অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন বেড়েছিল চারগুণ। সারা সোভিয়েত ইউনিয়নের ৯৫ শতাংশ তুলা উৎপন্ন হত এই এলাকায়। ধানের উৎপাদনের ৪০ শতাংশ আর ফলফলারির এক-তৃতীয়াংশও হত এই অঞ্চলে। আরল সাগর এলাকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের শস্যভাণ্ডার। এসবই সম্ভব হয়েছিল আরল সাগরের আশপাশে ব্যাপক সেচব্যবস্থা গড়ে তোলার ফলে। কিন্তু তার জন্য শেষ পর্যন্ত আরলকে বিরাট রকম দাম দিতে হল।

পঞ্চাশের দশকে সোভিয়েত সরকার এই এলাকার কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য আফগানিস্তান আর ইরানের ধার ঘেঁষে বিশাল কারাকুম খাল খনন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনুযায়ী ১৯৫৪ সালে প্রায় ১,৩০০ কিলোমিটার লম্বা পৃথিবীর দীর্ঘতম এই খাল খোঁড়ার কাজ শুরু হয়; খালটি চালু হয় ১৯৫৬ সালে। আমুদরিয়া আর সিরদরিয়ার ধারে ধারে জলসেচের জন্য অসংখ্য ছোট ছোট খাল তৈরি করা হয়। তার ফলে এসব নদী থেকে আরল সাগরে যে পানি গিয়ে পড়ত তা ক্রমে ক্রমে কমতে কমতে প্রায় একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। ষাটের দশকের আগে দুটি নদী দিয়ে প্রতি বছর আরল সাগরে পানি পড়ত প্রায় ৫৫ ঘনকিলোমিটার (১৩ ঘনমাইল)। এই পানি পড়া যখন প্রায় একেবারে বন্ধ হয়ে গেল তখন আরল থেকে কেবল পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে লাগল। কিন্তু

তা আর পূরণ হবার কোনো ব্যবস্থা রইল না। ক্রমে ক্রমে আরল শুকিয়ে উঠতে লাগল।

১৯৬০ সাল থেকে তিন দশকে আরল হ্রদের পানির এলাকা কমে গিয়েছে চল্লিশ শতাংশের ওপরে; পানির উচ্চতা কমেছে তের মিটার। বাকি যে পানি তাতে আছে তা এমন নোনতা হয়ে উঠেছে যে, হ্রদে যেখানে একদিন ২৪ প্রজাতির তরতাজা মাছ খলবল করত সেখানে আজ তার সবই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আরল ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন, আর তিন দশক পর হয়তো আর আরল সাগরের অস্তিত্বও থাকবে না। থাকবে শুধু তার প্রেতাত্মা—ঘন নোনা পানি-ভরতি কটি ছোট ছোট মরা ডোবা।

শস্যভাণ্ডার থেকে প্রেতপুরী

ষাট সাল পর্যন্ত ব্যাপারটা যে কী ঘটছে তা ঠিকমতো বোঝা যায়নি। কিন্তু তারপর থেকে দেখা গেল ক্রমেই হ্রদের পানি কমে যাচ্ছে। পাড়ে জেগে উঠছে নুনমেশানো বালি। হ্রদের গাছপালা আর মাছ মরে যেতে লাগল। জেলেরা মাছ ধরা জাহাজগুলো বেশ কিছুদিন চালু রাখার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু ক্রমেই পানি সরতে সরতে পুব আর দক্ষিণ দিকে কিনারা থেকে সরে গেল প্রায় একশ কিলোমিটার। এখানে ওখানে ডাঙ্গার ওপর পড়ে রইল মাঝধরা জাহাজ আর নৌকাগুলো। আগে যেখানে আরলের পানির এলাকা ছিল প্রায় ৭০,০০০ বর্গকিলোমিটার সেখানে এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪০,০০০ বর্গকিলোমিটার। অর্থাৎ প্রায় ৩০,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় জেগেছে নুন ছড়ানো বালির চড়া। এই বালিতে আজকাল প্রায়ই দেখা দেয় ধুলোর ঝড়; লোকের নাকে মুখে চোখে ধুলোর ঝাপটা লেগে সর্বক্ষণ জ্বালা করতে থাকে। এমন অবস্থা যে, ধুলোঝড়ের সময় চোখ খোলা রাখাই শক্ত। চোখের রোগ, গলার ক্যান্সার পুরো এলাকা জুড়ে বেড়ে উঠেছে। শিশুরা জন্মের পরপরই শ্বাসের রোগে মারা যাচ্ছে পতঙ্গের মতো।

হ্রদের পানি কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকার আবহাওয়া হয়ে উঠেছে রুক্ষ অর্থাৎ গরমের সময় তাপমাত্রা অত্যন্ত চড়ে যায়; শীতের সময় ঠাণ্ডাও পড়ে খুব বেশি। হ্রদের ওপর থেকে মেঘ হয়েছে উধাও—অর্থাৎ বৃষ্টি ঝরছে কম। তার ফলে পশুচারণের জন্য খড়-বিচালির অভাব দেখা দিয়েছে। দারুণ আকাল দেখা দিয়েছে খাবার পানিরও। ময়লা ঘোলা পানি খেয়ে বেশির ভাগ লোকের দেখা দিচ্ছে আন্ত্রিক রোগ। মানুষের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে; তারা নানা রকম রোগের শিকার হচ্ছে।

banglainternet.com

সেচের ব্যবস্থা বিস্তৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে আরেক ধরনের দূষণ। তুলা আর ধানের ফলন বাড়াবার জন্য ব্যাপকভাবে ক্ষেতে সার ও কীটনাশক ছড়ানো হচ্ছে, তাতে মাটি মরে যাচ্ছে আর এসব রাসায়নিক বস্তু মিশে বিষিয়ে উঠছে খাবার পানি। কিছু কিছু কীটনাশকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু চাষীরা ফসল বাড়াবার জন্য মরিয়া হয়ে সে সব নিষিদ্ধ কীটনাশকও ব্যবহার করে চলেছে। বিজ্ঞানীরা মায়ের দুধে মারাত্মক পরিমাণে ডিডিটি ও অন্যান্য কীটনাশকের হদিস পেয়েছেন।

বিশেষজ্ঞরা হিসেব করে বলছেন, আগে আরল সাগরে পানি থাকত মোটামুটি এক হাজার ঘনকিলোমিটার; তা কমতে কমতে হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪০০ ঘন কিলোমিটার। আগে প্রতি বছর আমুদরিয়া আর সিরদরিয়া দিয়ে বয়ে যেত প্রায় একশ ঘনকিলোমিটার পানি। তার মধ্যে ৫০ ঘনকিলোমিটার গিয়ে পড়ত আরল সাগরে। হ্রদে বৃষ্টির পানি পড়ত মোটামুটি ১০ ঘনকিলোমিটার অর্থাৎ প্রতি বছর হ্রদে গিয়ে পড়ত মোট ৬০ ঘনকিলোমিটার পানি। আবার প্রতি বছর হ্রদ থেকে বাষ্প হয়ে উড়ে যেত এর সমান পরিমাণ অর্থাৎ প্রায় ৬০ ঘন কিলোমিটার পানি। তাতে হ্রদে পানি সরবরাহের ভারসাম্য বজায় থাকত। কিন্তু সেচের জন্য বাঁধ দিয়ে আর খাল কেটে নদীর পানি আটকে ফেলায় ১৯৭০ সালে আরল সাগরে গিয়ে পড়ে মাত্র ৩৫ ঘনকিলোমিটার পানি; ১৯৮০ সালে পড়ে মাত্র ১০ ঘন কিলোমিটার। আজ কোনো কোনো বছর আরল সাগরে আর আদৌ কোনো পানি গিয়ে পড়ছে না। অথচ তা থেকে পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যাওয়া থেমে থাকেনি। তার ফলে নষ্ট হয়েছে এই বিশাল হ্রদের পানির ভারসাম্য। আর চারপাশের পরিবেশের ওপর পড়ছে তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া।

আরল সাগরকে বাঁচাবার লড়াই

আরল সাগরকে বাঁচাবার কথাও ভাবছেন বিজ্ঞানীরা। সোচ্চার হয়ে উঠেছেন পরিবেশবাদীরা। একটি হ্রদ প্রকৃতির অমূল্য দান। দেখতে দেখতে আমাদের চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যাবে এই হ্রদ—এটা কখনো মেনে নেওয়া যায় না। আরল যদি মরে যায় তাহলে উষর হয়ে যাবে এই এলাকা। কারাকুম আর কিজিলকুম মরুভূমি ক্রমে ক্রমে গ্রাস করবে আরলের চারপাশ। এত বড় একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন করে হোক ঠেকাতে হবে—আরল হ্রদকে বাঁচাতে হবে।

টনক নড়েছে সরকারেরও। ১৯৮৮ সালে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তুলা চাষের এলাকা কিছুটা কমাতে হবে—যাতে সেচের পানির দরকার কম হয়। খাদ্যশস্যের জন্য এক-তৃতীয়াংশ জায়গা ছাড়তে হবে যাতে ফসলে কিছুটা বৈচিত্র্য আসে। কিছু জমি প্রতি বছর পতিত রাখতে হবে; তাতে এখন যেভাবে অতিচাষের ফলে জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার হাত থেকে জমি বাঁচবে। সেচের পানির বরাদ্দও কমিয়ে দেয়া হয়েছে—যাতে কিছু পানি গিয়ে পড়তে পারে আরল সাগরে।

কিন্তু সেচের পানি কমাতে চাইলেও তা করা মোটেই সহজ নয়। এই এলাকায় গত তিন দশকে গড়ে উঠেছে প্রচুর জনবসতি। চাষের এলাকা বাড়ার ফলে দেশের নানা এলাকা থেকে লোকজন এসেছে এখানে। তাদের রুজি-রোজগার বাঁধা এই এলাকার চাষের সঙ্গে, জলসেচের সঙ্গে। জলসেচ ছাড়া এই মরুভূমির রুক্ষ মাটিতে ফসল ফলাবার কোনো উপায় নেই।

জলসেচের পানি যাতে কোনোভাবে অপচয় না হয় তার জন্য নানা উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। আগে শুধু মাটি কেটে খাল করা হয়েছে; তার নিচ দিয়ে প্রচুর পানি চুঁইয়ে চলে যাচ্ছে মরুভূমির মাটিতে—সেগুলো চাষের বা আর কোনো ধরনের কাজে লাগছে না। এখন খালের নিচে আর পাশে প্লাস্টিকের বা কংক্রিটের দেয়াল দেবার কথা হচ্ছে। অনেক জায়গায় সেচের পানি গিয়ে ঢুকছে নানা ডোবা বা জলায়। সেগুলো যাতে আরল সাগরে গিয়ে পড়তে পারে তার চেষ্টা করা হচ্ছে। এসবের ফলে প্রতি বছর ২০ ঘনকিলোমিটার পানি যদি আরলে পড়ে তাহলে তার সঙ্গে বৃষ্টির পানি যোগ হয়ে মোট পানি জমার পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ২৫ থেকে ৩০ ঘনকিলোমিটার। তখন হয়তো তার আকার আজকের চেয়ে আর কমবে না।

কিন্তু আরল সাগর আজ মধ্যএশিয়ার পরিবেশে এক বিশাল ক্ষতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপর উঠছে এমন বিশাল সাদা নুন-ধুলোর ঝড় যে, তা মহাকাশের নভোযান থেকেও দেখা যাচ্ছে। কখনো এই ঝড়ের ঝাপটা ছড়িয়ে পড়ে ৪০০ কিলোমিটার লম্বা আর ৪০ কিলোমিটার চওড়া এলাকা জুড়ে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতি বছর প্রায় সাড়ে চার কোটি টন নুন-বালি উড়ে যাচ্ছে এই ঝড়ের সঙ্গে। আরলের নুন ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে, এমনকি উত্তর মেরু এলাকা পর্যন্ত। এই নুনের পলস্তারা এমন পুরু হয়ে পড়ছে চারপাশের নানা এলাকার ক্ষেতে যে, সে সব জায়গার জমি তাতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তেমনি নষ্ট হচ্ছে পশুচারণের তৃণভূমি। তাতে এই অঞ্চলের পশুসম্পদ কমে যাচ্ছে দ্রুত।

আরলের হ্রদের পানি যত কমবে তত তার পাড়ে জমবে পানি থেকে নুন, আর তত উড়তে থাকবে ধুধু বালি। নুনের পাড় থেকে নুন-ধুলোর ঝড়। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন, আরলের বুকে জমা আছে অন্তত একশ কোটি টন নুন; পানি কমার বর্তমান ধারা যদি চলতে থাকে তাহলে এই শতাব্দীর শেষে তার পানি হয়ে দাঁড়াবে সমুদ্রের পানির চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বেশি নোনতা।

প্রকৃতির সঙ্গে মিতালী

আরল সাগরের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ যখন লড়ে, তখন সে লড়াইয়েরও কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। প্রকৃতি তো আসলে মানুষের শত্রু নয়, তার বন্ধু। তাই প্রকৃতির সঙ্গে লড়ার চেয়েও বেশি দরকার মিতালী। প্রকৃতিকে ভালো করে জানতে হবে, বুঝতে হবে তার নিয়ম-কানুন।

banglainternet.com

প্রকৃতির নিয়ম-কানুন মেনে তার সঙ্গে মিতালী গড়ে তুললে প্রকৃতি হয়ে ওঠে মানুষের বন্ধু, তাকে দেয় অঢেল উপহার। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম-কানুন ভালোমতো বিচার না করে তার সঙ্গে লড়তে গেলে প্রকৃতি হয়ে উঠতে পারে অতি নিষ্ঠুর, তার নির্দয় আক্রোশ মানুষের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।

মধ্য এশিয়ায় যাঁরা খাল খোড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, আমুদরিয়া আর সিরদরিয়ার সব পানি খাল দিয়ে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাঁরা শুধু ক্ষেতে ফসল বাড়াবার আর লাভের কথাই ভেবেছিলেন; কিন্তু এতে সে এলাকার পরিবেশে কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে তার কথা তখন মোটেই ভেবে দেখেননি। আজ যখন পুরো অবস্থাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন মনে হচ্ছে বুঝি এখন বড্ড বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে!

আজ সবাই আরল সাগরকে রক্ষা করার কথা বলছে। আরল সাগর আজ আর শুধু মধ্যএশিয়ার কটি দেশের সমস্যা নয়, সারা পৃথিবীর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা দেশের বড় বড় বিজ্ঞানী আর প্রকৌশলী গবেষণা করছেন কী করে এই হ্রদকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া যায়; অন্তত যাতে এই হ্রদ এখন যতটা আছে তার চেয়ে আর না শুকায় তার ব্যবস্থা নেয়া যায়। দুনিয়ার নানা দেশের বিজ্ঞানী আর পরিবেশবাদীরা ভাবছেন আরল সাগরকে নিয়ে।

আসলে আমাদের চারপাশে প্রকৃতির যা কিছু অবদান তা তো শুধু আমাদের এক প্রজন্মের ভোগের জন্য নয়, আগামী প্রজন্মের মানুষরাও যাতে প্রকৃতির এসব সম্পদ ভোগ করতে পারে তার কথাও আমাদের ভাবতে হবে। কৃষি, শিল্প, রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য আমরা যখন নানা রকম প্রকল্প গ্রহণ করি তখন প্রায়ই আমাদের নজর থাকে শুধু আজকের লাভের দিকে, এসবের ফলে পরিবেশের ওপর কতটা প্রতিক্রিয়া পড়বে, আগামী দিনে কোনো ক্ষতি হবে কি না তার কথা আমরা প্রায়ই ভেবে দেখি না।

আরল সাগরের বিপর্যয় সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য একটা শিক্ষা হয়ে থাকতে পারে।

[উৎস : *পরিবেশের সংকট ঘনিয়ে আসছে*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৬]

জীবজগতের বৈচিত্র্য কমে আসছে

আমাদের চারপাশে যে বিশাল রূপময় পৃথিবীকে আমরা দেখি তার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বৈচিত্র্য। এই সীমাহীন বৈচিত্র্য যেমন প্রকৃতির নিজের তেমনি সে প্রকৃতি যে জীবনধারাকে লালন করে চলেছে তারও। দেশে দেশে কত না পাহাড় নদী সাগর, কত জাতের পোকামাকড়, গাছপালা, পশুপাখি। দিন-রাত কত বিচিত্র সাজে প্রকৃতি নিজেকে সাজিয়ে রাখে! পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে কত ধরনের মানুষ, আর কত বিচিত্র তাদের জীবনযাত্রা!

তবে দুনিয়াজোড়া এসব মানুষের এত বৈচিত্র্য থাকলেও তাদের মধ্যে একটা বিষয়ে খুব মিল খুঁজে পাওয়া যাবে; সে হল তাদের সবার জীবন একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে, পরিবেশের গাছপালা-পশুপাখির সঙ্গে। একেক দেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, উদ্ভিদ আর প্রাণিজগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে গড়ে উঠেছে সে সব দেশের মানুষের জীবনযাত্রার ধরন। মরুভূমি আর মেরুর দেশের জীবন, পাহাড়ি আর নদীতীরের জীবন একান্তভাবে আবর্তিত তাদের পরিবেশকে ঘিরে। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে: গাছপালা পশুপাখি যদি আদৌ না থাকত তাহলে কি পৃথিবীতে মানুষ বাঁচত? এ প্রশ্নের এ ধরনের একটা জবাব দেয়া যায় : আর কোনো ধরনের মানুষের উদ্ভব হলে তারা হয়তো-বা বাঁচতেও পারে, কিন্তু আজ যে ধরনের মানুষ পৃথিবীতে বাস করে তারা নিশ্চয়ই বাঁচত না।

সারা পৃথিবীতে আজ বহু জাতের গাছপালা, পশুপাখি আছে; কিন্তু কত জাতের তা কি আমরা ঠিকমতো জানি? বিজ্ঞানীরা আজ শুধু এর একটা মোটা দাগের হিসেব বলতে পারেন: সে হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীতে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা মোটামুটি চার লাখ আর প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা এগার লাখ হবে—অর্থাৎ সব মিলিয়ে পনের লাখের মতো। তবে এ হিসেবে বেশ খানিকটা ফাঁক আছে। তাই অনেকেরই ধারণা হল আসলে প্রজাতির সংখ্যা হবে এর চেয়ে ঢের বেশি—হয়তো ত্রিশ লাখ; আবার আর কারো কারো মতে এই সংখ্যাটি তিন কোটি হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

এই যে বিজ্ঞানীদের হিসেবের মধ্যে এমন বিশাল ফাঁক, এ থেকে বোঝা যায় সব দেশের সব গাছপালা আর প্রাণী প্রজাতির খবর তাঁরা এখনও যোগাড় করে

banglainternet.com

উঠতে পারেন নি। বিশেষ করে আমাজানের নিরক্ষীয় গভীর বনাঞ্চল এবং পৃথিবীর আরো সব অজানা আর দুর্গম বন-জঙ্গলে এখনও বহু প্রজাতি (প্রধানত উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ আর অমেরুদণ্ডীদের প্রজাতি) রয়ে গিয়েছে মানুষের হিসেবের বাইরে। এমন কি যে পনের লাখ প্রজাতির খবর বিজ্ঞানীরা জানেন তাদেরও মাত্র দশ শতাংশর মতো এ যাবৎ তাঁদের বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতায় এসেছে, বাকিদের সম্বন্ধে অনেক কথাই এখনও রয়েছে অজানা।

অতি সাফল্য থেকে বিপদ

এ পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে। ঠিক কখন সে হিসেব খানিকটা নির্ভর করে মানুষ বলতে আমরা কী বোঝাচ্ছি তার ওপরে। তবে হিসেবটা যে বিশ-ত্রিশ লাখ বছরের কম হবে না তা অবশ্য বলা যায়। সে যাই হোক, মানুষ যখন প্রথম আসে তখন স্বভাবতই তার সংখ্যা ছিল কম। তবে মানুষ যেহেতু হয়ে উঠেছিল অন্য যে কোনো প্রাণীর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান তাই তার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকে অন্য সব প্রাণীর চেয়ে দ্রুত। গত কয়েক শতকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির হাতিয়ার নিয়ে মানুষ যেমন শক্তিমান হয়ে উঠেছে তেমনি তার বংশবৃদ্ধির গতিও দ্রুততর হয়েছে। মানুষের এই অতি সাফল্য আর দ্রুত বংশবৃদ্ধি পৃথিবীর উদ্ভিদ আর প্রাণীকুলের জন্য রীতিমতো সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষের জীবনযাপনের সুবিধের খাতিরে তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে।

এই বিশ শতকে এসে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির হার যেমন বেড়েছে তেমনি নগরায়ণও ঘটেছে দ্রুতগতিতে। এই শতকের শুরুতে পৃথিবীতে নগরবাসী মানুষের হার ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র দশ শতাংশের মতো; এখন সে হার দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ শতাংশের কাছাকাছি। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে নগরায়ণের হার বেড়েছে আরো বেশি—মোটামুটি দু'শতাংশ থেকে পঁচিশ শতাংশের মতো। নগরায়ণের এই রুদ্ধশ্বাস গতি একাধারে রিক্ত করে তুলছে গ্রামাঞ্চল আর বনাঞ্চলকে; সেই সঙ্গে বিপন্ন করছে দুনিয়াজোড়া জীবজগতের বৈচিত্র্য।

আসলে শুধু তো নগরবাসীর সংখ্যা বাড়ছে না; বাড়ছে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যাই। উনিশ শতকের শুরুতে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল একশ' কোটির নিচে। এই জনসংখ্যা সৃষ্টি হয়েছিল বহু লক্ষ বছরের ধীর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আর সম্ভবত এ সময়েই ছিল পৃথিবীতে জীবজগতের সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র্য। জীবজগতের বৈচিত্র্য মানে হল নানা বিচিত্র প্রজাতির উদ্ভিদ, নানা বিচিত্র

প্রজাতির প্রাণী। এমনি অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ আর প্রাণীকে মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করতে থাকে তার জীবনযাত্রা-পদ্ধতির উন্নয়নের কাজে।

আজ এই বিশ শতকের শেষে এসে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে বিপুলভাবে; পাঁচশ কোটির অংক ছাড়িয়ে সে সংখ্যা আজ ছ'শ কোটি ছুঁই ছুঁই করছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সারা দুনিয়া জুড়ে মানুষের অপ্রতিহত পদসঞ্চারের ফলে কমে আসছে জীবজগতের বৈচিত্র্য। বিজ্ঞানীরা বলছেন, গত দু'শ বছরে অব্যাহত গতিতে প্রজাতির সংখ্যা কমেছে। তাঁদের হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত উঁচু শ্রেণীর প্রজাতি রয়েছে প্রায় ৪৫,০০০ (স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ ও উভচর প্রজাতি প্রায় ১৫,০০০, পাখির প্রজাতি প্রায় ৯,০০০ আর মাছের প্রজাতি প্রায় ২১,০০০)। তার মধ্যে গত দুশ' বছরে প্রায় দু'শতাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং এক শতাংশের ওপর পাখি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে। আরো অন্তত পাঁচ শতাংশ স্তন্যপায়ী আর আট শতাংশ পাখি প্রজাতি আজ বিলুপ্তির মুখোমুখি। এভাবে চললে আগামী তিন দশকের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবীর ৫ থেকে ১৫ শতাংশ প্রজাতি; একুশ শতকের মাঝামাঝি পৌঁছবার আগেই নিশ্চিহ্ন হবে পৃথিবীর প্রজাতি সম্পদের প্রায় ২৫ শতাংশ।

গত কয়েক শ' বছরে পৃথিবীর ইতিহাস আর তাতে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ আর প্রাণীদের নিয়ে যে সব গবেষণা হয়েছে তাতে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, এত নানা রকম প্রাণী আর উদ্ভিদ আকস্মিক একদিন পৃথিবীতে এসে হাজির হয়নি। আদতে খুব সম্ভব পৃথিবী একদিন ছিল প্রাণহীন একটি পিণ্ড; ক্রমে ক্রমে নানা রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাতে এক আদি প্রাণকণার উদ্ভব ঘটেছিল; তারপর সেই প্রাণকণা থেকেই বিচিত্র বিকাশের পথ ধরে নানা ধরনের উদ্ভিদ আর প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে। প্রাণের এমনি বিকাশ ঘটেছে প্রায় চারশ' কোটি বছর ধরে ধাপে ধাপে। আর এই চারশ' কোটি বছর ধরেই প্রাণের নানা বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক আন্তঃসম্পর্ক আর পারস্পরিক নির্ভরতা। প্রতিটি প্রজাতি তার পরিপার্শ্বের অন্য নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঙ্গে এবং তার পরিবেশের নানা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে টিকে থাকে। কাজেই যে কোনো একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হলে অন্য বহু প্রজাতির জীবনধারার ওপর তার অনিবার্য প্রভাব পড়ে। তাই অনেক ধর্মমতেও বলা হয়ে থাকে জীবজগতের সব ধরনের উদ্ভিদ আর প্রাণীরই বেঁচে থাকবার অধিকার রয়েছে।

সাধারণত দেখা যায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলোর প্রজাতি-সম্পদ নাতিশীতোষ্ণ বা হিমমণ্ডলের দেশের চেয়ে বেশি। তার মধ্যে আবার বাংলাদেশ উদ্ভিদ আর প্রাণী প্রজাতি সম্পদে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এদেশে রয়েছে অন্তত ৫,০০০ প্রজাতির

banglainternet.com

সপুষ্পক উদ্ভিদ, ৫০০ প্রজাতির মাছ, ১৯ প্রজাতির উভচর, ১২৪ প্রজাতির সরীসৃপ, ৫৭৯ প্রজাতির পাখি আর ১২৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। এদেশে নানা ধরনের খাদ্যশস্যের প্রজাতিও রয়েছে প্রচুর। নদীতে আর উপকূলে চিংড়িই রয়েছে প্রায় ৩০ প্রজাতির।

মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি আর বেহিসেবী বৃক্ষনিধনের কারণে আজ বাংলাদেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ দ্রুত কমে যাচ্ছে। যেখানে দেশের অন্তত এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ এলাকায় বন থাকা দরকার সেখানে প্রকৃত বনের পরিমাণ নেমে এসেছে পাঁচ শতাংশের নিচে। তার ফলে বেশ কিছু উদ্ভিদ আর প্রাণী প্রজাতি সম্প্রতি বিলুপ্ত হয়েছে; ১১ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ১৩ প্রজাতির পাখিসহ আরো বহু প্রজাতি আজ বিলুপ্তির মুখোমুখি। এভাবে চললে দুতিন দশক পরে বাংলাদেশে আর কোনো বনাঞ্চলের অস্তিত্ব থাকবে না। বলাই বাহুল্য, সেদিন এক ভয়ঙ্কর পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দেবে।

এই শতাব্দীর মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে যে সব বন্যপ্রাণী হারিয়ে গেছে তাদের মধ্যে রয়েছে তিন প্রজাতির গণ্ডার, বুনো মোষ, পারা হরিণ, নীলগাই, নেকড়ে, গৌর (বাইসনের মতো প্রাণী), বান্টিং (এক জাতের বনগরু), লালশির হাঁস, ময়ূর, মেছো কুমির– এমনি বহু প্রাণী। আরো অনেক প্রজাতির প্রাণী আজ বিলুপ্তির দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে রয়েছে সুন্দরবনের বাঘ আর চিত্রা হরিণ, ভালুক, উড়ন্ত কাঠবিড়ালি, হাড়গিলা, শকুন, লক্ষ্মীপেঁচা, বাদিহাঁস, ঘড়িয়াল, গুইসাপ ইত্যাদি।

বাংলাদেশে একদিন প্রায় দশ হাজার প্রজাতির ধান দেখা যেত। কিন্তু ষাটের দশক থেকে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ আরম্ভ হবার পর ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কম ফলন দেয় এমন দেশি জাতের ধানের চাষ কমে যেতে থাকে। আজ দেশের প্রায় অর্ধেক ধান আসছে উচ্চ ফলনশীল জাতের গাছ থেকে। কিন্তু এসব জাতের বংশানুক্রমে নিজের গুণাগুণ ধরে রাখার ক্ষমতা কম; তাছাড়া রোগে, খরায় এসব জাত কাবু হয়ে পড়ে বেশি। কাজেই শেষ পর্যন্ত এ ধরনের জাতের ফসলের ওপর অতিনির্ভরতা দেশের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। এছাড়া ধান, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের চাষের ওপর বেশি গুরুত্ব দেবার কারণে ডাল, তেলবীজ প্রভৃতি চাষের ওপর ক্রমেই কম জোর দেয়া হচ্ছে; এটাও ফসলের বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সুন্দরবনের রাজসিক বাঘ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে রয়েছে সুন্দরবনের বিশাল বনভূমি– আয়তন মোটামুটি চার হাজার বর্গকিলোমিটার। এটি হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল; পাশের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেকার এলাকা এবং ডাঙ্গা-পানি মিলিয়ে ধরলে হবে প্রায় দশ হাজার বর্গকিলোমিটার। এছাড়া এই বনভূমিতে রয়েছে পৃথিবীর সেরা বাঘ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (*Panthera tigris*); আর আছে অপরূপ রূপময় চিত্রা হরিণ (*Cervus axis*)। শ'খানেক বছর আগেও দেশের প্রায় অর্ধেক জায়গায়, এমনকি ঢাকা শহরের আশেপাশেও বাঘের দেখা পাওয়া যেত। কিন্তু আজ বনজঙ্গল কমে আসায় দেশের আর কোথাও বাঘের দেখা পাওয়া যায় না; বাঘ আটকা পড়েছে সুন্দরবন এলাকায়। তাও পত্রপত্রিকায় প্রায়ই খবর দেখতে পাওয়া যায় : চোরা শিকারীদের কবলে পড়ে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যাও দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

ইতিহাস থেকে জানা যায় এককালে সুন্দরবন বিস্তৃত ছিল বৃহত্তর খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালি, ফরিদপুর, নোয়াখালি জেলা জুড়ে। কিন্তু মানুষ কাঠ, কাগজের মণ্ড, শিকারের পশু, মাছ, মধু এসব মূল্যবান সম্পদের জন্য সুন্দরবনকে তছনছ করছে বছরের পর বছর ধরে; তার ফলে আজ প্রকৃত বনের এলাকা কমতে কমতে নেমে এসেছে চার হাজার বর্গকিলোমিটারের নিচে।

সুন্দরবনে গাছ কাটা সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কথা; কিন্তু তা আদপে মোটেই কার্যকর হচ্ছে বলে মনে হয় না। তার ফলে ১৯৮৫ সালে এক জরিপে দেখা যায় সুন্দরবনের যে প্রধান দু'ধরনের গাছ সুন্দরী (*Heritiera fomes*) আর গেওয়া (*Excoecaria agallocha*) তার সংখ্যা দু'দশকের মধ্যে মারাত্মকভাবে কমে গেছে। সুন্দরবনের দক্ষিণের দিকে উপকূল অঞ্চলের পানি বেশ নোনা; উত্তরদিকের পানি অপেক্ষাকৃত মিষ্টি (অর্থাৎ নোনা নয়)। আর এই এলাকাতেই গাছপালা জন্মায় সবচেয়ে ভালো। গঙ্গা নদীর উজানে ভারতের ফারাক্কা বাঁধ তৈরির কারণে শুকনোর সময়ে গঙ্গার প্রবাহ প্রায় চল্লিশ শতাংশ কমে যায়; তাতে সুন্দরবনের লবণাক্ত পানি ক্রমে উত্তরদিকে সরে আসছে। তার ফলে আগামরা রোগে বনের অনেক সুন্দরী গাছ মরে যেতে আরম্ভ করেছে।

সুন্দরবনে পানির লবণাক্ততা বেড়ে ওঠা অবশ্য চিংড়ি চাষের জন্য একটা নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে। চিংড়ি চাষীরা ঘের দিয়ে নোনা পানি আটকে রাখছে; তাতে সে এলাকার গাছপালা এবং চাষবাসের জন্য আরো বিপদ সৃষ্টি হয়েছে। নোনা পানিতে সেখানকার জমি স্থায়ীভাবে গাছপালার জন্য বিষাক্ত হয়ে উঠছে। এ অঞ্চলের পরিবেশের অবনতি ঘটায় মাত্র এই শতাব্দীর মধ্যেই সুন্দরবনের চার প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে; এর মধ্যে রয়েছে এক প্রজাতির গণ্ডার, এক প্রজাতির বুনো মহিষ আর দু'প্রজাতির হরিণ।

সুন্দরবনের প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন পাশ হয় ১৯৭৩ সালে; তার

banglainternet.com

পরের বছর এক সংশোধনীর মাধ্যমে সুন্দরবনে সব ধরনের শিকার নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু সুন্দরবনে গাছপালার সংখ্যা কমে আসায় এমনিতেই বাঘের জন্য উপযুক্ত আবাসভূমি এবং খাবার-দাবারের সমস্যা দেখা দিয়েছে। গাছপালা কমার ফলে সাধারণভাবে পরিবেশে আরো নানা পরিবর্তন ঘটেছে; যেমন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলোকপাত, হাওয়া, পানি সব কিছুতেই কিছু-না-কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আর সেসব এ অঞ্চলের জীবজন্তুর ওপরে নানা ধরনের প্রভাব ফেলছে। তার ওপর রয়েছে শিকারীদের উৎপাত। শুধু বাঘ নয়, সুন্দরবনের পরিবেশ নষ্ট হওয়ায় অনেক ধরনের গিরগিটি, কচ্ছপ, অজগর, টেরাপিনও বিপন্ন বলে বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু আইন থাকা সত্ত্বেও বাঘ শিকার বন্ধ করা যাচ্ছে না।

কিছু চোরা শিকারী ফাঁদ পেতে অথবা হরিণ মেরে তার গায়ে বিষ মিশিয়ে বাঘ শিকার করছে। তারপর সে বাঘের চামড়া, মাথা, চর্বি, নখ, দাঁত এসব মোটা রকম অর্থের বিনিময়ে বিদেশে পাচার করছে। বিদেশে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের শুধু একটি চামড়ার দামই নাকি ওঠে বাংলাদেশী মুদ্রায় তিন লাখ থেকে পাঁচ লাখ টাকা! এই বাঘের চামড়া ব্যবহার করা হয় ঘর সাজাবার জন্য; এছাড়া দাঁত, হাড়, চোখ, নখ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় তথাকথিত ওষুধ তৈরির জন্য। চোরা শিকারীদের উৎপাতে অস্থির হয়ে বাঘ কখনো চলে আসে লোকালয়ে; তারপর সে বাঘের শিকার হয় গবাদি পশু, কখনো মানুষও। তখন গ্রামের লোকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আরো বাঘ হত্যা করে।

সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা কত তার সঠিক হিসেব পাওয়া শক্ত। ১৯৬৭ সালে একটি জরিপ থেকে জানা যায় সে সময়ে বাঘের সংখ্যা ছিল মাত্র একশ। ১৯৭৫ সালে এক জরিপের ফলাফলে বলা হয় বাঘের সংখ্যা তিনশ'। ১৯৮২ সালে আরেক জরিপে বলা হয় সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা সাড়ে ৪ শতে উঠেছে। কিন্তু ইতোমধ্যে সুন্দরবনে অপরিকল্পিতভাবে গাছপালা কেটে ফেলায় এবং আগামরা রোগে অনেক গাছ বিনষ্ট হওয়ায় গাছপালার ঘনত্ব কমে গেছে। তাতে চোরা শিকারীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে উঠেছে; বাঘের সংখ্যাও দ্রুত কমতে আরম্ভ করেছে। এখন বাঘের সংখ্যা তিনশ' থেকে চার শ'র মধ্যে হতে পারে।

বাঘের সংখ্যা যে শুধু বাংলাদেশে কমছে তা নয়। আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থার হিসেবে বলা হয়েছে সারা পৃথিবীতে এখন বাঘ আছে মোটামুটি ৫,০০০ থেকে ৭,০০০; মাঝামাঝি হিসেব নিয়ে ধরা যাক ৬,০০০। তার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ ৪,০০০-এর মতো) আছে ভারতে। বাঘের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠায় সে দেশে সরকারিভাবে একটি ব্যাঘ্র প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে; অনেক বনাঞ্চলকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে। তবু বাঘের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হতে পারছেন না। মাত্র এই শতাব্দীর চল্লিশের দশকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে

ইন্দোনেশিয়ার বালি বাঘ, সত্তরের দশকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে কাস্পিয়ান বাঘ, আশির দশকে জাভা বাঘ। যে চীনে এক সময় প্রায় সারা দেশে বাঘ দেখা যেত সেখানে এখন বাঘের সংখ্যা একশ'র নিচে নেমে এসেছে। কাজেই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আর বন নিধনের চাপে বাংলাদেশ আর ভারত এই দু'দেশেরই জাতীয় প্রাণী বাঘ যে আর কতদিন টিকে থাকতে পারবে তা বলা শক্ত।

এশিয়ার হাতিরা আজ বিপন্ন

হাতি হল ডাঙ্গার সবচেয়ে বড় প্রাণী; তার গায়ে শক্তিও প্রচুর। অনেক দেশে কাঠের শিল্পে বা দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ভারি বোঝা টানার জন্য হাতির শক্তিকে ব্যবহার করা হয় ব্যাপকভাবে। কিন্তু আজ হাতির এই শক্তি আর অর্থকরী ব্যবহার তার অস্তিত্বের বিপন্নতাকে ঠেকাতে পারছে না। আফ্রিকার হাতিদের (*Loxodonta africana*) নিকেশ করা হচ্ছে তাদের বিশাল আর মূল্যবান দাঁতের জন্য। এশিয়ার হাতির (*Elephas maximus*) সাধারণত দাঁত হয় ছোট, তাও শুধু পুরুষগুলোর; তারা মারা পড়ছে বিপুল জনসংখ্যার চাপে।

হাতিরা সচরাচর গভীর জঙ্গলে বাস করে; তাই তাদের সংখ্যা খুব নিখুঁতভাবে গোনা রীতিমতো শক্ত। তবু বিজ্ঞানীরা হাতির সংখ্যার হিসেব করেছেন। তাঁদের হিসেব মতো এশিয়ায় হাতির সংখ্যা ৩৫,০০০ থেকে ৫৫,০০০—মাঝামাঝি একটা হিসেব নিয়ে ধরা যাক সংখ্যাটি ৪৫,০০০। এর মধ্যে মানুষের পোষা হল ১০,০০০ অর্থাৎ মানুষ এসব হাতিকে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি টানা ইত্যাদি কাজে লাগায়। ভারতে হাতির মোট সংখ্যা হবে প্রায় ২৫,০০০; বর্মায় দশ হাজারের কাছাকাছি; চীনে রয়েছে মাত্র শ'পাঁচেক। অথচ সে হিসেবে আফ্রিকায় হাতি আছে প্রায় পাঁচ লাখ।

হাতিরা নানা বিচিত্র জাতের গাছপালা খেয়ে বেঁচে থাকে। মালয়েশিয়ার জঙ্গলে দেখা গেছে তারা প্রায় ৪০০ প্রজাতির উদ্ভিদ খায়; দক্ষিণ ভারতে এক জরিপে দেখা যায় এই সংখ্যাটি ১১২। অবশ্য হাতিদের বিশাল বপুর কারণে তাদের দৈনিক খাবার দরকার হয় প্রচুর। বয়স্ক একটি হাতির জন্য শুধু খাবার পানিই দরকার দৈনিক দু'শ লিটারের ওপর। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন সচরাচর গোটা বিশ মাদী হাতি মিলে একটি দল বাঁধে; তারপর এমনি ক'টি দল মিলে হয় তাদের একটি গোত্র। তাতে পুরুষ হাতিরাও যোগ দেয়। একেকটি গোত্রে থাকে ৫০ থেকে ২০০টি করে হাতি। গোত্রের হাতিরা একই বনে মোটামুটি এক সঙ্গে চরে বেড়ায়।

হাতিরা যেভাবে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে তাতে তাদের এক সঙ্গে অন্তত পঞ্চাশটি হাতি থাকা দরকার; কিন্তু ঠিকমতো বংশবৃদ্ধি আর নানা পরিবেশের

banglainternet.com

সঙ্গে খাপ খাইয়ে টিকে থাকার জন্য কোনো বনে এক সঙ্গে শ'পাঁচেক হাতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অথচ আজ জনসংখ্যার চাপে বন-জঙ্গলের পরিমাণ যেভাবে কমে যাচ্ছে তাতে এতগুলো হাতি এক সঙ্গে থাকা হয়ে উঠছে খুবই কঠিন। ভারতে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে সে দেশে প্রতিটি হাতির জন্য বনভূমি রয়েছে গড়ে মাত্র তিন বর্গকিলোমিটার; এটা তাদের চরে বেড়াবার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। তার ওপর আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন দেশের জনসংখ্যা আজকের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে উঠবে, সঙ্গে সঙ্গে বনের পরিমাণ আরো কমে যাবে তখন হাতিদের জন্য আরো গুরুতর বিপদ দেখা দেবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভারতের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ ৮,০০০) হাতি আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পুবের পাহাড়ি এলাকায় যে মাত্র শ'তিনেক হাতি এখনও টিকে আছে তাদের অবস্থা রীতিমতো শোচনীয়।

অস্ট্রেলিয়ায় কোয়ালারাও

বাংলাদেশ আর ভারতে যেমন বাঘ হল জাতীয় পশু, চীনদেশে যেমন পান্ডা, তেমনি অস্ট্রেলিয়ায় হল কোয়ালা। কোয়ালারা অনেকটা ভালুক আর খরগোশের মাঝামাঝি চেহারার ছোট আকারের প্রাণী। বন্য অবস্থায় এরা খানিকটা হিংস্র, তবে পোষা কোয়ালা খুবই মিষ্টি চেহারার আর পুতুলের মতো দেখতে। এদের নাকটা কালো কুচকুচে লম্বাটে ধরনের, বুকটা সাদা, আর হালকা খয়েরি রঙের লোমে ঢাকা নাদুস-নুদুস শরীর।

কোয়ালাদের যে বৈজ্ঞানিক নাম তাতেই এদের চেহারার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। নামটা হল *Phascolarctos* (থলেযুক্ত ভালুক) *cinereus* (ছাই রঙা) অর্থাৎ সবটা মিলিয়ে—ছাই রঙা থলেওয়ালা ভালুক। এরা এক ধরনের অতিমাত্রায় ঘুমকাতুরে বৃক্ষচারী প্রাণী; দিনরাতের ২০ ঘণ্টাই প্রায় ঘুমিয়ে কাটায়। রাতের বেলা চরতে বেরোয়। এদের প্রধান খাদ্য হল বিশেষ বিশেষ জাতের ইউক্যালিপ্টাসের পাতা; তাই এদের সারা গায়ে যেমন তেমনি বিষ্ঠাতেও ইউক্যালিপ্টাস তেলের কড়া গন্ধ। ইউক্যালিপ্টাস গাছের জাত রয়েছে ছ'শর ওপরে। তার মধ্যে মাত্র দশ-পনের প্রজাতি হল কোয়ালাদের পছন্দ। এগুলো সাধারণত ত্রিশ ফুটের মতো লম্বা হয়, আর পাতা হয় প্রচুর। এক একটি কোয়ালা খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে প্রতি রাতে সাবাড় করে এক থেকে তিন পাউন্ড পরিমাণ পাতা।

অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলের কুইন্সল্যান্ড, নিউ সাউথ ওয়েলস আর ভিক্টোরিয়া প্রদেশের উপকূলীয় বনভূমিতে যে এলাকায় এসব জাতের ইউক্যালিপ্টাস পাওয়া যায় সেখানেই কোয়ালাদের প্রধান আবাস। কিন্তু সমস্যা হল মানুষের সংখ্যা

বৃদ্ধির ফলে এ ধরনের বনভূমির পরিমাণ দ্রুত কমে আসছে; আর তাই কোয়ালাদের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগে একটা জরিপে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়ায় কোয়ালা রয়েছে প্রায় চার লাখ; ১৯৯৩ সালে আরেক জরিপে বলা হয়েছে এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র চল্লিশ হাজারে। ইতোমধ্যে ১৯৯২ সালে আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ ইউনিয়ন (IUCN) অস্ট্রেলিয়ার অনেকগুলো প্রাণীকে বিপন্ন ঘোষণা করেছে; তাদের মধ্যে কোয়ালাও রয়েছে।

উনিশ শতকের শুরুতে ইউরোপীয়রা যখন অস্ট্রেলিয়ায় বসত গাড়তে আরম্ভ করে তখন তাদের একটা অতি লাভজনক রপ্তানি হয়ে ওঠে কোয়ালার তুলতুলে লোমযুক্ত চামড়া। ইউরোপের অভিজাত রমণীরা তাঁদের পোশাকের জন্য এই ফার দারুণ পছন্দ করতেন। বিশ শতকে এসে কোয়ালা নিধন এমন বীভৎস রূপ নেয় যে, ১৯২৭ সালে সরকারিভাবে কোয়ালার চামড়া রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু আজ যে কোয়ালার সংখ্যা কমে যাচ্ছে সেটা যতটা-না কোয়ালা নিধনের কারণে তার চেয়ে বেশি মানুষের আবাস আর কাঠের জন্য বন-জঙ্গল কেটে ফেলায় কোয়ালাদের বাঁচা কঠিন হয়ে উঠছে বলে। সারা অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে তার দক্ষিণ-পুব এলাকায় জনসংখ্যা বাড়ছে সব চাইতে দ্রুত। আর এ অঞ্চলেই হল কোয়ালাদের প্রধান আবাসভূমি। তাই আজ কোয়ালারা শয়ে শয়ে মরছে সড়কপথে গাড়ি চাপা পড়ে, কুকুরের শিকার হয়ে আর লোকালয়ে দুষ্টু ছেলেদের হাতে পড়ে।

অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ মানুষদের মনে কোয়ালা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা এক বিরাট উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। সে দেশে ১৯৯২ সালে বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণ আইন পাশ হয়েছে। কিন্তু আইন থাকার চেয়েও বড় কথা হল কিভাবে তার প্রয়োগ হচ্ছে। কোয়ালাদের আবাস রক্ষার ব্যবস্থা যদি এখনই করা না হয় তাহলে এর বিলুপ্তিকে হয়তো শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যাবে না। এই মহাদেশে আধুনিক কালে ইতোমধ্যে অন্তত বিশটি স্তন্যপায়ী প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে; তার সঙ্গে আর একটি যোগ হবে মাত্র।

শুধু আজকের প্রজন্মের জন্য নয়

জীবজগতের বৈচিত্র্য এ পৃথিবীকে আরো বেশি বাসযোগ্য করে তোলে। জীবজগতের ভারসাম্য বজায় থাকলে শুধু যে চারপাশের পরিবেশের রাসায়নিক ভারসাম্য রক্ষা হয় তাই নয়, জলবায়ু, মাটি-পানির ভারসাম্যও বজায় থাকে। এমনি ভারসাম্য বজায় থাকলে প্রতিটি জীব অন্য অনেক জীবের জীবন যাপনে সহায়ক হয়ে ওঠে; অন্যের জীবনকে ঐশ্বর্যময় করে তোলে। একের বিলুপ্তিতে তাই আরো অনেকের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে।

banglainternet.com

জীবজগতের বৈচিত্র্য এ পৃথিবীর এক অমূল্য সম্পদ। আমাদের সকল খাদ্য এবং অধিকাংশ কাঁচামাল জীবজগত থেকেই আসে। কৃষিজাত পণ্য ছাড়াও বিপুল পরিমাণ ওষুধপত্র এবং শিল্পজাত বস্তু উৎপন্ন হয় জীবজগৎ থেকে। এসব ব্যবহারিক চাহিদা পূরণ ছাড়াও জীবজগৎ আমাদের যে বিপুল সাংস্কৃতিক ও মনোগত চাহিদা মেটায় তার দামও কম নয়।

নানা জীবপ্রজাতির বিলুপ্তি শুধু যে আমাদের কালের বা আমাদের প্রজন্মের জন্যই ক্ষতিকর তা নয়, আগামী দিনের সকল প্রজন্মের জন্যও তা বিপুল ক্ষতির বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। যেসব প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হচ্ছে তার অনেকগুলোর মধ্যেই খাদ্য, ওষুধ বা শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে নানা অজানা সম্ভাবনা লুকানো রয়েছে। পরিবেশের অবনতির ফলে যেসব বাস্তুসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেগুলো শুধু নানা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য নয়, মানুষের বসবাসের জন্যও অনুপযোগী হয়ে উঠছে। নানা বিচিত্র প্রজাতির ফসলের পরিবর্তে মাত্র কয়েকটি উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির ফসলের ওপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হবার ফলে ভবিষ্যতে উন্নত গুণাগুণযুক্ত ফসল সৃষ্টির সম্ভাবনাও নষ্ট হচ্ছে।

আগামী দিনে যখন মানুষের সংখ্যা আরো বাড়বে তখন পৃথিবীর ক্রমবর্ধিষ্ণু চাহিদা মেটাবার জন্য নতুন নতুন গুণাগুণযুক্ত নানা নতুন ধরনের ফসল উদ্ভাবন করতে হবে। উচ্চ উৎপাদনশীলতা, খরা বা উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা, রোগ-জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি—এমনি সব গুণাগুণ লুকানো আছে আজকের অনেক উদ্ভিদ আর প্রাণীর মধ্যেই, তাদের জিনকণার সঞ্চয়ের মধ্যে। এই জিন সম্পদের ভাণ্ডার আগামী বহু প্রজন্মের জন্য যে কোনো মূল্যে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

কিন্তু আজ যেভাবে দুনিয়া জুড়ে প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে এবং জীবজগতের বৈচিত্র্য বিনষ্ট হচ্ছে তার জন্য দায়ী কে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে উত্তরটা তেমন কঠিন বা জটিল নয়। মানুষের সংখ্যা বাড়ার ফলে ব্যাপক আকারে বন-জঙ্গল কেটে বা পুড়িয়ে ধ্বংস করা হচ্ছে, উদ্ভিদ বা প্রাণী অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করে নিঃশেষ করা হচ্ছে; কীটনাশক, আগাছানাশক প্রভৃতি রাসায়নিক বস্তু বেহিসেবীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে; বেহিসেবী মাছ ধরা, অতিরিক্ত রকম বায়ু ও পানিদূষণ—এসব কিছুকেই কারণ বলে নির্দেশ করা যেতে পারে।

কিন্তু একটু গভীরে গেলে দেখা যাবে আসলে এসবের পেছনে রয়েছে মানুষের বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি, বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক প্রবণতা। মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাঠ, আঁশ, খাদ্যশস্য, বন্যপ্রাণী প্রভৃতি নানা পণ্যদ্রব্য ভোগের চাহিদা বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প রচনায় খনিজ প্রভৃতি অজৈব বস্তুর মূল্য যতটা ধরা হয় সে তুলনায় জীবসম্পদের আর্থিক

মূল্য কম ধরা হয়। আবার অন্যদিকে জীবসম্পদ ধ্বংস করা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের জন্য বিপুল মুনাফা সৃষ্টি করে, অথচ তাতে স্থানীয় জনগণ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষের জীবনে অনেক জীবপ্রজাতির প্রভাব সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান এখনও সীমাবদ্ধ। প্রায়শ পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলোও নেহাতই দুর্বল।

অনেক সময় উত্তর-দক্ষিণের অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নটিও এখানে প্রভাব বিস্তার করে। পৃথিবীর জীবপ্রজাতির বেশির ভাগের বাস দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত নিরক্ষীয় অঞ্চলে। অথচ এসব সম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে প্রধানত উত্তরাঞ্চলের শিল্পোন্নত দেশগুলোর মানুষদের ভোগের জন্য। সস্তা শ্রম, কাঁচামালের কম দাম, অসম মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগ প্রভৃতি কারণে দক্ষিণের দেশগুলোর অর্থনীতি যেমন ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের পরিবেশের সম্পদ। এ সমস্যার সমাধানের জন্য তাই যেমন আশু এবং আপাতদৃষ্ট সমস্যাগুলোর দিকে তাকাতে হবে, তেমনি এর গভীরে যেসব অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা রয়েছে সেগুলোর কথাও ভাবতে হবে।

এই শতাব্দীর শুরুতে ভারতের বন এলাকা ছিল দেশের মোট এলাকার প্রায় ৪০ শতাংশ; আজ তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৫ শতাংশ। তার মধ্যে তিন শতাংশকে নির্ধারণ করা হয়েছে বন্যপ্রাণীর জন্য সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে। বাংলাদেশে শতাব্দীর শুরুতে বনের এলাকা ছিল প্রায় ৩০ শতাংশ; আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫ শতাংশ। আর সংরক্ষিত বনাঞ্চল দেশের মোট এলাকার এক শতাংশের অর্ধেকও নয়। এ অবস্থায় আমাদের প্রজাতি সম্পদ রক্ষার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেবার কথা এখনই ভাবতে হবে; কেননা এক্ষেত্রে বিলম্ব হবে আত্মঘাতী।

[উৎস : *পরিবেশের সংকট ঘনিয়ে আসছে*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৬]

banglainternet.com

লবঙ্গ-এলাচের সুরভি ও প্রজাতির উৎস

আজ বাগদাদ ডাকে কোথা বহু দূরে!
যাব স্রোত ফুঁড়ে যাব সব বাঁক ঘুরে
হাতীর হাড়ের সওদা নিয়েছি, নিয়েছি কাবাব-চিনি,
আলমাস আর গওহর নিয়ে বেশাতি ক'রেছি পুরা
শেষ ক'রেছি এ পিপুল, মরিচ, এলাচের বিকি-কিনি:
কিশ্‌তীর মুখ ফেরাও এবার দরিয়ার বন্ধুরা।...

—ফররুখ আহমদ (দরিয়ায় শেষ রাত্রি)

বাগদাদের স্বপ্নচারী কবি ফররুখ আহমদ তাঁর কাব্যের জগতে বারবার যে সাত সাগরের মাঝি আর নোনা দরিয়ার রূপ দেখেছেন সে তো আজকের নোনা দরিয়া নয়। এ হল আজ থেকে পাঁচশ' কি হাজার বছর আগের নোনা দরিয়া যেখানে আরব সওদাগররা হরেক রকম সওদা নিয়ে বেরোতেন দেশ-দেশান্তরে। আর ফিরতেন নানা মণিমানিক্যের বোঝা নিয়ে। ছোট ছোট জাহাজ নিয়ে ভারত মহাসাগরে চলাচল করত তাঁদের বাণিজ্যবহর। এমনি অনেক আরব বণিক বাণিজ্য করতে এসে স্থায়ী বসত গেড়েছিলেন ভারতের পশ্চিম উপকূল কালিকটে। এ এলাকায় জন্মাত প্রচুর মসলা, যার দারুণ চাহিদা ছিল ইউরোপের বাজারে। লবঙ্গ, দারুচিনি, ছোট এলাচ, জায়ফল এমনি নানা ধরনের মসলা জন্মাত আরো পুবে—মোলাক্কা, জাভা এসব দ্বীপেও। ভারতীয় আর মালয়-পলিনেশীয় বণিকরা এসব মসলা যোগাড় করে এনে বেচতেন আরব বণিকদের কাছে।

ইউরোপের ঠাণ্ডা জলবায়ুতে এমনিতে গাছপালার জাত কম, তার মধ্যে মসলার নাম-নিশানা নেই। অথচ মসলা ছাড়া মাছ-মাংস বিস্বাদ; খাওয়ার মজাই মাটি। মসলা বাড়ায় খাবারের স্বাদ, তেমনি তার মনোরম সৌরভ বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে খাওয়ার তৃপ্তি। নানা দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ার ফলে ইউরোপের লোকদের আয়-উন্নতি বাড়ছিল, সেই সঙ্গে খাবারে মাছ-মাংসের পরিমাণও। সেকালে শীতের দেশে মাংস জমিয়ে রাখতে হত শুকিয়ে বা নুন দিয়ে; সে বিস্বাদ মাংস মসলা ছাড়া কারো মুখে রোচে না। অথচ মসলাপাতি

সবই যোগাড় করতে হয় পুবের দেশ থেকে। পুবের এসব দেশ যে কোথায় তা কেউ জানে না; সেসব দেশ থেকে মসলা আসে বহু দূরের পথ পেরিয়ে, অনেক হাত ঘুরে। আর ইউরোপের বাজারে সে মসলা বিকোয় যেন সোনার দামে! তাই তাদের কাছে পুবের দেশ মানে হল স্বপ্নের দেশ। ইউরোপের সব দেশের বণিকেরা স্বপ্ন দেখে পুবের দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করে মুনাফার পাহাড় তৈরির। রাজ-রাজড়ারা স্বপ্ন দেখে এলাচ-লবঙ্গের সুরভিমাখা সোনাদানায় মোড়া সে সব দেশে তাদের সাম্রাজ্য গড়ে তোলার; পাদ্রী-মোহান্তরা স্বপ্ন দেখে সে সব দেশের মানুষদের সবাইকে তাদের শিষ্যের দলে নাম লেখাবার।

ইউরোপ আর এশিয়ার মধ্যে মসলার বাণিজ্য যে কতকালের তা বলা শক্ত। দু'আড়াই হাজার বছর আগে রোমান যুগেও শোনা যেত অকূল দরিয়ার বুকে দক্ষিণ-পুব এশিয়া আর আফ্রিকার মধ্যে এক 'দারুচিনি সড়ক' আছে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রোমক পণ্ডিত প্লিনি বলেছিলেন, ইথিওপিয়া থেকে আমরা যে দারুচিনি পাই তা আসে আরো পুবের বহু দূরের নানা দ্বীপ থেকে—হাল-দাঁড়হীন, পালহীন সব ভেলায় করে ভেসে ভেসে এসব সওদা পৌঁছত আফ্রিকার উপকূলে। সূর্যের দক্ষিণায়নের সময় তীব্র পুবের হাওয়া সে সব ভেলাকে ঠেলে নিয়ে যেত মালদ্বীপ ছাড়িয়ে আফ্রিকার পুব-উপকূলের দিকে। তারপর দক্ষিণ-পুব হাওয়া তাদের নিয়ে যেত আফ্রিকার উপকূলে মাদাগাস্কারের উত্তরে। লোহিত সাগরের তীর থেকে আরব বণিকদের মাধ্যমে হাত বদল হতে হতে সে সব পৌঁছে যেত নীলনদের উপত্যকায়; তারপর ইউরোপে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষীয় বনে মিলত নানারকম ওষুধপত্র, মসলাপাতি; সেই সঙ্গে ব্যবসা চলত ধাতু আর বস্ত্রের। মালয়-ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের মসলা প্রাচীনকালে প্রথমে জড়ো হত জাভায়, সেখান থেকে স্থানীয় বণিকরা নিয়ে যেত চীনে। তারপর স্থলপথে যেত আরো নানা দেশে। দশম শতাব্দীর পর সরাসরি মসলার খোঁজে সমুদ্রপথে এসে হাজির হল চীনা, ভারতীয় আর আরব বণিকরা। এ এলাকায় জমজমাট ব্যবসা গড়ে উঠল সুগন্ধিদ্রব্য, ওষুধপত্র, রেশম, ভারতীয় তুলা, চীনামাটির বাসনকোসন আর মসলার। ১৩-১৫ শতক পর্যন্ত এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত জাভার বণিকরা; তারপর আরব, ভারতীয় আর চীনা বণিকরা এই বাণিজ্যে সরাসরি এগিয়ে আসে।

ভেনিসের পর্যটক মার্কো পোলো ১২৯২ সালে লিখেছেন, আমাদের মরিচ আর আদা আমদানি হয় ভারত থেকে। কিন্তু তখন ভারত পর্যন্ত পৌঁছনো খুব কঠিন। এক পথ হল মিসরের ভেতর দিয়ে, আরেক পথ পারস্যের ভেতর দিয়ে। দুটো পথই বেশ দুর্গম। তখনও সরাসরি সমুদ্রপথে ভারতে আসা যায় না। ভারতের মালাবার উপকূলের বনাঞ্চল থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বেশির ভাগ মসলা যেত ইরান

banglainternet.com

উপসাগর আর লোহিত সাগর হয়ে। এদিকে ক্রুসেডে খ্রিস্টানদের হার হওয়ায় ইউরোপের লোকদের জন্য মুসলিম মিসরের ভেতর দিয়ে বাণিজ্যপথটা মোটেই সুগম নয়। যদি জলপথে কোনোমতে ভারতে পৌঁছনো যায় তাহলে দুর্মূল্য মসলা আর মণিমুক্তার ঝলমলে জগৎটাকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

১৪৮৪ সালে জেনোয়ার নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস ভারতীয় মসলার স্বপ্ন দেখতে দেখতেই তাঁর বিপদসংকুল আর দুঃসাহসিক সাগর যাত্রার পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি ভারতে পৌঁছতে পারেন নি, ১৪৯২ সালে ভুল করে হাজির হয়েছিলেন আমেরিকার উপকূলে। সে ভুলের সাক্ষী হিসেবে আজও সে এলাকার দ্বীপগুলোর নাম হয়ে আছে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।

আমরা সচরাচর যে সব ইতিহাস পড়ি তাতে প্রচুর যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী থাকে। কাদের কাদের মধ্যে লড়াই হয়েছিল, কী নিয়ে বেধেছিল লড়াই, কতদিন চলেছিল, কারা জিতেছিল, কিভাবে জিতেছিল সেসব কাহিনীতে ভরা থাকে ইতিহাসের পাতা। সচরাচর লড়াই বাধে জমিজমা, ধন-দৌলত নিয়ে, কখনো সুন্দরী নারী নিয়েও। কিন্তু উদ্ভিদের প্রজাতি নিয়ে লড়াই? ভাবতেও যেন কেমন লাগে। অথচ এমন লড়াই ইতিহাসে একেবারে কম হয়নি। ষোল-সতের শতক জুড়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মসলার দখল নিয়ে বেধেছে এমনি প্রচুর লড়াই। এদেশের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সত্যেন সেন এ ধরনের লড়াইয়ের কাহিনী নিয়ে 'মসলার যুদ্ধ' নামে একটি বইও লিখেছেন।

কোথায়, কখন, কাদের মধ্যে, কতদিন ধরে চলেছে এসব যুদ্ধ? সেসব কথা জানবার আগে জানা দরকার জীবপ্রজাতি বলতে আমরা কী বুঝি; কতগুলো প্রজাতি আছে পৃথিবীতে, আর সেসব আমাদের কী ধরনের কাজেই বা লাগে!

জীবপ্রজাতির কথা

এ পৃথিবীতে যখন প্রথম জীবনের আবির্ভাব ঘটেছিল তখন খুব সম্ভব সে জীব ছিল খুব সরল ধরনের। সে তুলনায় আজকের পৃথিবীতে বহু বিচিত্র ধরনের জটিল জীবের উদ্ভব ঘটেছে। এদের জাত বিচার করে সাজাবার চেষ্টা করে আসছে মানুষ সেই আদিকাল থেকে। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) জীবজগতকে ভাগ করেছিলেন দুভাগে : তার একভাগ হল প্রাণিজগৎ যাদের চলাচলের ক্ষমতা আছে আর অনুভূতি আছে; যাদের চলাচল নেই বা অনুভূতি নেই তাদের তিনি ফেললেন উদ্ভিদের দলে।

প্রায় দু'হাজার বছর ধরে অ্যারিস্টটলের এই শ্রেণীবিভাগ নিয়ে কেউ তেমন কোনো প্রশ্ন তোলেনি। অ্যারিস্টটল মাত্র ৫০০ জাতের প্রাণীর খোঁজ করতে

পেরেছিলেন। আর তাঁর শিষ্য সেকালের সেরা উদ্ভিদবিদ থিওফ্রেস্টাস (Theophrastus, আনুমানিক ৩৭২-২৮৭ খ্রি. পূ.) হদিস করতে পেরেছিলেন মাত্র ৫০০ জাতের উদ্ভিদের। কিন্তু পনের-ষোল শতকে ইউরোপীয় নাবিকরা নতুন নতুন দেশে সফর করে নানা বিচিত্র উদ্ভিদের খবর নিয়ে আসতে লাগল। দেখা গেল উদ্ভিদজগৎ আগে যা ভাবা হয়েছিল তার চেয়ে আসলে ঢের বড়; অ্যারিস্টটলের সাদামাটা ভাগ দিয়ে আর চলছে না।

তাছাড়া দেখা গেল শুধু চেহারা দেখে জাত বিভাগ করতে গিয়ে সুবিধে হচ্ছে না। যেমন—সব হাতি বা সব উট কি একই জাতে ফেলা যাবে? ভারতীয় হাতি আর আফ্রিকার হাতির মধ্যে প্রজনন হয় না। তেমনি এক-কুঁজওয়ালা আরবী উট আর দু'কুঁজওয়ালা ব্যাকট্রিয়ান উটের মধ্যেও প্রজনন হয় না। কাজেই বোঝা যাচ্ছে আসলে এরা ঠিক এক প্রজাতি নয়। অর্থাৎ জাত ভাগ করতে হলে তা করতে হবে পারস্পরিক প্রজনন হয় কি না তার বিচারে।

উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন বেশি করে দেখা গেল নানা রোগের চিকিৎসায় গাছগাছড়ার ব্যবহারের কারণে। আঠার শতকে ক্যারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnaeus, ১৭০৭-৭৮) নামে সুইডেনের এক ডাক্তার প্রথম একটা বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগের নকশা তৈরি করলেন। কর্মজীবনের শুরুতে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে ল্যাপল্যান্ডের বিজন আর দুর্গম বনে বনে প্রায় চার হাজার মাইল ঘুরে—তার বেশির ভাগই পায়ে হেঁটে—তিনি অনেক নতুন উদ্ভিদ আর প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন। ফুল যে উদ্ভিদের প্রজননের অঙ্গ এ ধারণা বিজ্ঞানীদের মধ্যে তখন নতুন চালু হয়েছে। লিনিয়াস দেখলেন একই জাতের উদ্ভিদের ফুলে পুংকেশরের সংখ্যা সব একই রকম। ফুলের পুংকেশর আর গর্ভদণ্ডের ভিত্তিতে এসব শ্রেণীবিভাগের নকশা নিয়ে ১৭৩৫ সালে তিনি একটা বই লিখলেন, তার নাম *Systema Naturae* অর্থাৎ প্রকৃতির বিন্যাস; ১৭৫৩ সালে বেরলো তাঁর আরেক বই, নাম *Species Plantarum* অর্থাৎ উদ্ভিদের প্রজাতি। তাঁর এসব বই এমন আলোড়ন সৃষ্টি করল যে, নামকরণের জন্য দুনিয়ার নানা জায়গা থেকে তাঁর কাছে অজস্র নতুন নতুন জাতের গাছপালার নমুনা আসতে শুরু করল। তাঁর অসংখ্য শিষ্য গাছপালার সন্ধানে নানা দেশের দুর্গম এলাকায় অভিযানে বেরলো; তাদের অনেকে মধ্যপ্রাচ্যের মরুপ্রান্তরে আর আফ্রিকার জঙ্গলে প্রাণও দিল।

লিনিয়াস যে সব উদ্ভিদ বা প্রাণীর প্রজাতির মধ্যে বেশ মিল আছে তাদের একসঙ্গে করে নাম দিলেন 'গণ'। তারপর প্রতি প্রজাতির নামকরণ করলেন দু'শব্দে—প্রথম শব্দে বোঝায় এটা কোন গণ-এর, দ্বিতীয় শব্দে বোঝায় কোন প্রজাতি। সেকালে সব শিক্ষিত লোকের সাধারণ ভাষা ছিল ল্যাতিন, তাই এই নামকরণ করা হয় ল্যাতিন ভাষায়। যেমন মানুষ একটা প্রজাতি; এর নাম হল

banglainternet.com

Homo sapiens (অর্থাৎ নর, জ্ঞানী)। তিনি ওরাংওটাঙ-এর নামকরণ করলেন *Homo troglodytes* (অর্থাৎ নর, গুহাবাসী)। তবে এত সব শ্রেণীকরণ করলেও লিনিয়াস বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর ধারণা ছিল সব প্রজাতি গোড়ায় যেভাবে সৃষ্টি হয়েছিল বরাবর ঠিক সেভাবেই রয়েছে; এযাবৎ কোনো প্রজাতির বিলুপ্তিও ঘটেনি। কিন্তু শ্রেণীবিভাগ করতে করতে দেশে দেশে এত বিচিত্র রকমের উদ্ভিদ আর প্রাণীর উৎপত্তি কিভাবে হল তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে লাগল। এসব প্রশ্নের মীমাংসা উনিশ শতকের আগে করা সম্ভব হয়নি।

আগেই বলেছি অ্যারিস্টটলের সময়ে গ্রিকদের জানা সব উদ্ভিদ আর প্রাণী মিলিয়ে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মাত্র হাজারখানেক। ১৮০০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াল ৭০,০০০। আজ এই সংখ্যা ধরা হয় মোটামুটি পনের লাখ; তার মধ্যে উদ্ভিদের সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ, আর প্রাণীর সংখ্যা ১১ লাখ। তবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন নিরক্ষীয় অঞ্চলের বিজন বনে, কীটপতঙ্গ আর অমেরুদণ্ডীদের মধ্যে আরো অসংখ্য প্রজাতি আজও রয়েছে মানুষের হিসেবের বাইরে। তাদের সংখ্যা যোগ করলে মোট প্রজাতির সংখ্যা এক কোটি থেকে তিন কোটির মতো হতে পারে।

এত রকম প্রজাতি যে সব দেশে সমানভাবে ছড়িয়েছে তা তো নয়। এক এক দেশের জলবায়ুর প্রভাবে জন্মেছে এক এক জাতের উদ্ভিদ। তারপর মানুষ যখন তার অর্থনৈতিক মূল্যের খোঁজ পেয়েছে তখন তাকে নিয়ে গেছে তার নিজ দেশে বা আর কোনো ভিন্ন দেশে। যেমন কফির উৎপত্তি আফ্রিকায়; সেখান থেকে অভিযাত্রীরা তাকে নিয়ে গেছে এশিয়ায় আর আমেরিকায়। আলু গোড়ায় জন্মাত দক্ষিণ আমেরিকায়; সেখান থেকে স্পেনীয় নাবিকরা তাকে নিয়ে যায় ইউরোপে; সেখান থেকে আমেরিকায় যায় সতের শতকের মাঝামাঝি। আনারসের উৎপত্তি মধ্যআমেরিকায়; সেখান থেকে তা গিয়ে পৌঁছেছে এশিয়া, আফ্রিকা এবং আরো নানা দেশে। রাবারের উৎপত্তি দক্ষিণ আমেরিকায়। ব্রাজিল থেকে ১৮৭৫ সালে এক ইংরেজ গোপনে রাবার বীজ নিয়ে যায় বিলেতে। তা থেকেই শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠেছে আজকের সিংহল, মালয়েশিয়া আর ইন্দোনেশিয়ার রাবার শিল্প।

নানা জাতের অর্থকরী গাছপালা নানা দেশের অর্থনীতিতে যেমন প্রভাব ফেলেছে তেমনি ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর রাজ্য জয়ের নেশাতেও কম প্রভাব বিস্তার করেনি। আর তার মধ্য দিয়ে অসংখ্য নাবিক, অভিযাত্রী, বণিক আর পাদ্রীও দুনিয়া জুড়ে অনেক উদ্ভিদের বিস্তার ঘটিয়েছে।

মসলার দখল নিয়ে লড়াই

মসলার খোঁজে ইউরোপ থেকে ভারতে প্রথম এসে হাজির হল পর্তুগিজরা। পঞ্চদশ শতকে পর্তুগালের রাজার ভাই প্রিন্স হেনরি ছিলেন সমুদ্রযাত্রার ব্যাপারে

খুব উৎসাহী। তাঁর চেষ্টায় লিসবনে গড়ে ওঠে নাবিকদের জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র। এসব প্রশিক্ষিত নাবিক নিয়ে ১৪৮৭ সালে বার্তোলেমিউ দিয়াজ আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারত মহাসাগরে ঢোকার পথ আবিষ্কার করলেন। তার দশ বছর পর ১৪৯৭ সালে সে দেশের নাবিক ভাস্কো দা গামা সমুদ্রপথে কামানসজ্জিত চারটি জাহাজের বহর নিয়ে ভারতের দিকে রওনা দিলেন; দশ মাসের মাথায় তাঁর বহর দক্ষিণ ভারতের কালিকট উপকূলে এসে হাজির হল। কালিকটের শাসনকর্তা জামোরিন-এর কাছ থেকে তাঁরা সেখানে মসলার ব্যবসা করার অনুমতি সহজেই পেয়ে গেলেন। পর্তুগালের একটা বাণিজ্যঘাঁটিও সেখানে বসানো হল। কিন্তু তারা দেখল সেখানে আরব বণিকরা আগে থেকে প্রভাব বিস্তার করে আছে; তাদের প্রভাব কমাতে না পারলে ব্যবসায় তেমন সুবিধে করা যাবে না। তাই পর্তুগিজরা সেখানে আরো অস্ত্রসজ্জিত যুদ্ধজাহাজ নিয়ে এল আর নানা ছলছুতায় একটা হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করতে লাগল। পরিকল্পনামতো একদিন পর্তুগিজ অধিনায়ক কাব্রাল নগরের ওপর কামান দাগতে শুরু করল। কালিকটের কাছে কামান ছিল না; কিন্তু তবু সেখানকার হিন্দু-মুসলমান নাগরিকদের মিলিত প্রতিরোধের মুখে তাকে পরাজয় মেনে হটে যেতে হল। এবার ভাস্কো দা গামার নেতৃত্বে পর্তুগালের যুদ্ধবহর এসে হাজির হল। কিন্তু তাতেও পর্তুগিজ বাহিনীর হার হল।

পর্তুগিজরা কালিকটের খানিকটা দক্ষিণে কোচিনে একটা স্থায়ী ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। সেখান থেকে প্রচুর কামান এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আরেক পর্তুগিজ বহর এসে হাজির হল। কালিকটের শাসনকর্তা জামোরিন বিপদ দেখে মিসরের কাছে সাহায্য চাইলেন; মিসর মীর হুসেন নামে এক সেনাপতির অধীনে কিছু সৈন্য আর অস্ত্রসজ্জিত জাহাজ পাঠালেন। তাঁরা গুজরাটের মধ্যে দিউ দ্বীপে ঘাঁটি করলেন। কিন্তু এ সময়ে দিউ-এর শাসক বিশ্বাসঘাতকতা করে রসদ বন্ধ করে দেওয়ায় মিসরের সেনাপতি বিরক্ত হয়ে দেশে ফিরে গেলেন। কালিকটের সেনাদের হার হল। ভারত সাগরে পর্তুগাল একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসল। ১৫১০ সালে তারা গোয়া বন্দর দখল করে নিয়ে সেখানে তাদের প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করল। এর ফলে তারা প্রায় দেড়শ বছর ধরে ইউরোপের মসলার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। ক্যাথলিক পর্তুগিজরা ছিল প্রচণ্ড রকম মুসলিমবিদ্বেষী; স্থানীয় মুসলিম বাসিন্দাদের ওপর তারা অকথ্য অত্যাচার করে যেতে লাগল।

কিছুদিনের মধ্যেই পর্তুগিজরা দেখল ভারতের চেয়ে মসলা বেশি জন্মায় ইন্দোনেশিয়ায়; তখন তারা সেখানকার মসলাবাণিজ্যও কব্জা করার মতলব আঁটল। পর্তুগিজ সেনাপতি আলবুকার্ক ১৫১১ সালে আঠারোটা রণতরী নিয়ে মসলাদ্বীপ মোলাক্কায় এসে হাজির হলেন। সেখানে তারা নির্বিচারে কামানের

banglainternet.com

গোলা বর্ষণ করতে লাগল, তারপর ব্যাপকভাবে লুটতরাজ আর মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ চলল। এভাবে কামানের জোরে পর্তুগিজরা মোলাক্কাকে আর ইন্দোনেশিয়ার মসলাবাণিজ্যকে তাদের কুক্ষিগত করে ফেলল। এরপরও কালিকট, ক্যাম্বে আর তুরস্কের মধ্যে পর্তুগালের সঙ্গে লড়বার জন্য একটা চুক্তি হয়েছিল। মিসর তখন তুরস্কের অধীন; তুর্কী সুলতানের নির্দেশে মিসরের শাসনকর্তা সুলেমান পাশা ১৫৩৮ সালে একটি সেনাবাহিনীও পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু পর্তুগিজদের কামানের গোলার সামনে তারা টিকতে পারেনি। তার ফলে ১৫৯৯ সাল পর্যন্ত সমুদ্রে পর্তুগালের অপ্রতিহত আধিপত্য বজায় থাকে।

পর্তুগালের এভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারের পেছনে রোমের পোপের সমর্থন ছিল। কিন্তু ইউরোপে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যেতে আরম্ভ করেছিল। মার্টিন লুথার ইউরোপে প্রোটেস্ট্যান্টবাদ প্রচার করতে শুরু করেছিলেন; তাঁর সমর্থকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছিল। মসলার ব্যবসার কেন্দ্রও ক্রমে ক্রমে ক্যাথলিক পর্তুগাল থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট হল্যান্ডের দিকে সরে গিয়েছিল। ওলন্দাজ বণিকরা দেখল পর্তুগিজরা মসলার ব্যবসায় বেপরোয়া রকম মুনাফা করছে। তাই ১৫৯২ সালে তারা ঠিক করল ভারতের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য করার জন্য একটা কোম্পানি গঠন করবে। ১৫৯৫ সালে ওলন্দাজদের প্রথম বহর মসলার খোঁজে ইন্দোনেশিয়া গিয়ে হাজির হল। তারা এই এলাকায় মসলার বাণিজ্যে পর্তুগিজদের নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিল। ১৬০২ সালে ওলন্দাজদের ইউনাইটেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পূর্বদেশে ব্যবসার জন্য সরকারের কাছ থেকে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। তার বলে তারা ১৬০৪ সালে কালিকট রাজ্যের সম্রাট জামোরিন-এর সঙ্গে একটা সন্ধি করল; আসল উদ্দেশ্য এই এলাকা থেকে পর্তুগিজদের তাড়ানো।

বাণিজ্য থেকে উপনিবেশ

ওলন্দাজরা দেখল ইন্দোনেশিয়ায় পর্তুগিজদের অবস্থা কিছুটা দুর্বল। ১৬০৫ সালে তারা পর্তুগিজদের কাছ থেকে আম্বন দ্বীপ দখল করে নিল। এরপর ১৬১৯ সালে জাকার্তা দখল করল। তখন পর্তুগিজদের ইন্দোনেশিয়া থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে হটে আসতে হল। পর্তুগিজরা সিংহলের কলম্বো বন্দরে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল; ১৬৫৪ সালে ওলন্দাজরা সেখান থেকে তাদের হটিয়ে দিল; তারপর ১৬৬০ সালে কোচিনও তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিল। ১৬৬৫ সালে পর্তুগিজরা ইংল্যান্ডের সম্রাটকে বোম্বাই বন্দর উপহার দেয়; কাজেই এরপর তাদের হাতে রইল শুধু গোয়া, দামন আর দিউ।

এদিকে ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজদের সাম্রাজ্য সৃষ্টি এগিয়ে চলেছে। পর্তুগিজদের মতো তারাও স্থানীয় বাসিন্দাদের ওপর নির্মম নির্যাতন আর শোষণ চালাতে লাগল। এদেশে ইংরেজরা যেমন নীল চাষ করার জন্য কৃষকদের দাদন দিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করেছিল ঠিক সেই একই পদ্ধতি গ্রহণ করল ওলন্দাজরা। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে সেখানে নিজেরা মসলার চাষ আরম্ভ করল; সেখানে ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করতে হত স্থানীয় লোকদেরই। তারপর হুকুম জারি করল স্থানীয়রা তাদের বাগানে আর লবঙ্গ চাষ করতে পারবে না। এসব জুলুমের বিরুদ্ধে ক্রমে ক্রমে স্থানীয় লোকেরা ক্ষেপে উঠল; অস্ত্রের জোরে তাদের দমন করা হতে লাগল। যে সব বাগিচায় একদিন প্রচুর লবঙ্গ জন্মাত সেগুলোকে এখন ধান আর সাগুর জমিতে পরিণত করা হল। ওলন্দাজদের অত্যাচার আর অব্যবস্থায় এই দ্বীপগুলোর অর্থনীতি একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। মসলার ব্যবসার মুনাফাও কমে যেতে আরম্ভ করল।

ইউরোপের বাজারে ১৬৬০ সালে কফির চল হল। তার ফলে মসলার দাম পড়ে গেল, কফির ব্যবসায় মুনাফা বেশি হতে লাগল। ওলন্দাজরা দেখল লবঙ্গের চেয়ে কফি চাষে লাভ বেশি। তাই আঠার শতকের শুরুতে তারা ভারতের মালাবার থেকে কফির চারা এনে তার চাষ শুরু করল। জাভা দ্বীপে কফিই এখন প্রধান ফসল হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সে সব কফি বাগানের মালিক হল ওলন্দাজরা আর সেখানে স্থানীয় লোকদের খাটানো হত ক্রীতদাস হিসেবে।

এদিকে ইংরেজরা দেখল ওলন্দাজরা মসলার ব্যবসায় লাগামছাড়া মুনাফা করছে। ওলন্দাজদের ইউনাইটেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সৃষ্টির এক বছর আগেই ইংরেজদের ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রাচ্যে একচেটিয়া ব্যবসা করার জন্য রানী এলিজাবেথের কাছ থেকে সনদ নিয়েছিল। ওলন্দাজদের মুনাফায় ভাগ বসাবার জন্য ১৬০১ সালে তারা ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে হাজির হল। কিছুদিন পর ১৬১২ সালে তারা ভারতের সুরাটেও একটি বাণিজ্য ঘাঁটি করল। তারা দেখল ভারত থেকে বস্ত্র নিয়ে বিক্রি করে তার বদলে মসলা কিনলে লাভ বেশি হয়। অবশ্য ওলন্দাজদের চাপে ইংরেজরা বেশিদিন ইন্দোনেশিয়ায় টিকে থাকতে পারেনি। তার ফলে তারা ভারতের দিকেই বেশি মনোযোগ দেয় অর্থাৎ উপনিবেশ তৈরির ব্যাপারে ওলন্দাজ আর ইংরেজরা ইন্দোনেশিয়া আর ভারতকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল। এই উপনিবেশের জোয়াল থেকে বেরিয়ে স্বাধীন হতে এই দুটো দেশের বহু বছর লেগে গিয়েছিল।

এদিকে পর্তুগিজ নাবিক ম্যাজেলান স্পেনের পক্ষ হয়ে সমুদ্রপথে ভূপ্রদক্ষিণ করতে গিয়ে মসলাদ্বীপ আবিষ্কার করেছেন; তাই স্পেন ভাবল তার পক্ষে এই এলাকার দখলে ভাগ না বসানো হচ্ছে বোকামি। ১৫২২ সালে স্পেন এগিয়ে

banglainternet.com

গেল ইন্দোনেশিয়ার দিকে। কিন্তু ওলন্দাজরা আগে থেকেই এখানে জেঁকে বসে আছে; তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্পেনকে ১৫২৯ সালে এই এলাকা থেকে সরে যেতে হল। মসলার বাণিজ্যে ওলন্দাজদের একচ্ছত্র আধিপত্য পাকাপোক্ত হল।

আঠার শতকে মসিয়ে পিয়ের পোয়াভ্রে (Poivre, একটু অদ্ভুত শোনালেও, নামটার বাংলা করলে হবে 'মরিচ মহাশয়') নামে এক ফরাসি বণিক এলাচ আর জায়ফলের চারা নিয়ে গেলেন ফ্রান্সে; সেখান থেকে সে সব গেল ভারত মহাসাগরের তীরে মরিশাস প্রভৃতি ফরাসি উপনিবেশে। তার ফলে আজ আর শুধু ইন্দোনেশিয়া নয়, মরিশাস, জাঞ্জিবার, মাদাগাস্কার এসব দেশেও প্রচুর মসলা জন্মায়। এসব মসলা সারা পৃথিবীতে রান্নাবান্নায়, সুগন্ধী, ওষুধ, দন্ত চিকিৎসার উপকরণ এমনি নানাভাবে ব্যবহার করা হয়।

নানা দেশে নানা ফসল

এই যে দুনিয়াজোড়া এত বিচিত্র জাতের উদ্ভিদ, তাদের মধ্যে এমন পার্থক্য কেমন করে হল, কেমন করে এসব গাছপালা গেল দেশ থেকে দেশান্তরে—সে সব কথা নিয়ে বিজ্ঞানীরা ভাবছেন বহুকাল থেকে। তাঁরা চালিয়েছেন আরেক ধরনের অভিযান। দেশ জয়ের নয়, উদ্ভিদের উৎপত্তিস্থল জানার অভিযান।

আগস্ত দ্য কাঁদোল (Augustin de Candolle, ১৭৭৮-১৮৪১) নামে এক সুইস বিজ্ঞানী বলেছিলেন, আসলে আমরা আজ যে নানা জাতের উদ্ভিদের চাষ করি তার সবই এসেছে কাছাকাছি কোনো বুনো জাতের উদ্ভিদ থেকে। সে সময়ে কাঁদোল পরীক্ষা করেছিলেন চাষ করা ২৪৭ রকমের ফসল নিয়ে। তার মধ্যে দেখা গেল খুব কাছাকাছি বুনো জাত আছে ১৯৪টি প্রজাতির, ২৭টির রয়েছে প্রায় কাছাকাছি বুনো জাত; বাকি ২৬টি সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত করা যায়নি।

এসব সমস্যা নিয়ে বড় ধরনের গবেষণা শুরু করলেন সাবেক সোভিয়েত দেশের কৃষিবিজ্ঞানী অ্যাকাডেমিসিয়ান নিকোলাই ভ্যাভিলভ (Nikolai Vavilov, ১৮৮৭-১৯৪৩)। ভ্যাভিলভ দেখলেন এক গমের গণের মধ্যেই রয়েছে আটটি প্রজাতি। কিন্তু তাদের মধ্যে গুণাগুণের এমন ফারাক যে সেগুলো যে একই জায়গায় উৎপত্তি হয়েছে তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। এ ধরনের নানা প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্য তাঁকে বার বার বেরোতে হয়েছে অভিযানে। তিনি ১৯১৬ সালে এক বৈজ্ঞানিক তথ্যসন্ধানে গেলেন ইরানে। কাছাকাছি তাইগ্রিস আর ইউফ্রেতিস নদীর উপত্যকায় এক অতি প্রাচীন কৃষিসভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। ইরানে তিনি কতকগুলো সম্পূর্ণ নতুন জাতের গম, যব আর শণগাছের হদিস পেলেন।

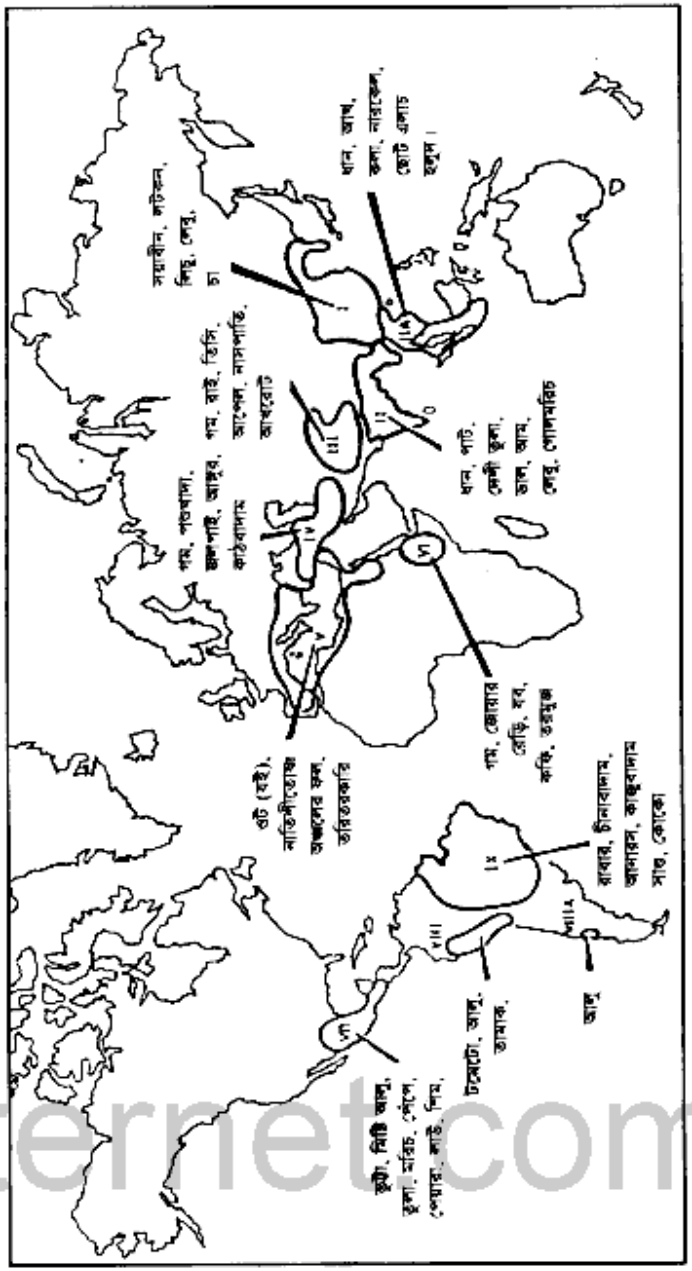

ফসল উৎপাদনের উৎসকেন্দ্রসমূহের মানচিত্র (ভাভিলভের অনুসরণে)

banglainternet.com

১৯২৪ সালে ভ্যাভিলভ গেলেন আফগানিস্তানে। সেখানে দেখলেন এক ধরনের বুনো যব: এ থেকেই কি এসেছে আজকের চাষ করা যব? কিন্তু এ যবের ডাঁটা বড় বেশি ভঙ্গুর। এর বীজ মাড়াইয়ের পর তার গায়ে লেগে থাকে অতি খসখসে রোম। এ ধরনের যব সেকালের মানুষেরা হয়তো চাষ করতে উৎসাহ বোধ করত না। তার আগে ১৯২১ সালে ভ্যাভিলভ গিয়েছিলেন আমেরিকায় এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দিতে। সেখানে তিনি দেখেছিলেন সে দেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা সারা দুনিয়া থেকে নানা রকম ফসলের বীজ এনে তা কৃষকদের কাছে আর বীজবিশেষজ্ঞদের কাছে পরীক্ষার জন্য বিলি করছে।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষে ১৯২৬ সালে ভ্যাভিলভ তাঁর বিখ্যাত বই *The Centres of Origin of Cultivated Plants* (চাষের ফসলের উৎসকেন্দ্রসমূহ) প্রকাশ করলেন। এ বইতে তিনি বললেন, প্রতিটি ফসলের উৎপত্তি খুঁজতে হবে এমন জায়গায় যেখানে সে ফসলের বুনো এবং চাষ করা জাতের সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র্য রয়েছে। এসব জায়গাতেই মানুষ কৃষির প্রথম অবস্থায় তার চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী জাতটি খুঁজে পেয়েছিল। এছাড়া তাঁর আরেকটি সিদ্ধান্ত হল কৃষির উৎপত্তি হয়েছে মূলত পাহাড়ি এলাকায়। কেননা সমতল জায়গায় চাষ করতে হলে দরকার হত খাল আর বাঁধ যা আদিম মানুষের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব ছিল না। পাহাড়ি জমিতে ঝরনার পানি আপনা আপনি পৌঁছায়। তাছাড়া এসব পাহাড়ি এলাকায় বুনো জাত, চষা জাত আর আগাছার মধ্যে জিন বিনিময় সহজ হয়েছে। তাতে প্রতিটি প্রজাতির প্রকরণবৈচিত্র্য সহজেই ঘটেছে।

ভ্যাভিলভ বললেন, মানুষ যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে গিয়েছে তখন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে তার দরকারী বীজগুলোকে। সে সব বীজ কিছু হয়তো নতুন জায়গার প্রতিকূল পরিবেশে টিকতে পারেনি; আবার কিছু টিকে গিয়েছে। এভাবেই নানা ধরনের ফসল ছড়িয়েছে দেশ-দেশান্তরে। তবে মূল কেন্দ্র থেকে মানুষ যত দূরে সরে গিয়েছে প্রজাতির গুণাগুণের তত অবনতি ঘটেছে।

নানা ফসলের জন্মস্থান

ভ্যাভিলভ তাঁর বইতে প্রথমে ফসলের পাঁচটি মূল উৎসকেন্দ্র নির্দেশ করেছিলেন। ১৯২৯ সালে এক সম্মেলনে তিনি একে বাড়িয়ে ছ'টি কেন্দ্রের কথা বললেন। তারপর ১৯৪০ সালে তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর শেষ বই; তাতে তিনি বললেন সাতটি কেন্দ্রের কথা। এই কেন্দ্রগুলো হল : ১. দক্ষিণ-এশীয় কেন্দ্র; ২. পূর্ব-এশীয় কেন্দ্র; ৩. দক্ষিণ-পশ্চিম এশীয় কেন্দ্র; ৪. ভূমধ্যসাগরীয় কেন্দ্র; ৫. আবিসিনীয় (ইথিওপীয়) কেন্দ্র; ৬. মধ্য-আমেরিকা কেন্দ্র; আর ৭. আন্দীয় (আন্দিজ পর্বতাঞ্চল) কেন্দ্র।

banglainternet.com

ভ্যাভিলভ অবশ্য স্বীকার করলেন তাঁর এই হিসেবের কিছু ব্যতিক্রমও আছে। কোনো কোনো ফসলকে মানুষ চাষের উপযোগী করে তুলেছে এই সাতটি উৎসকেন্দ্রের বাইরে। যেমন খেজুরের চাষ শুরু হয়েছে আরবের মরূদ্যানে বা দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায়, সম্ভবত সাহারাতেও; তরমুজের চাষ শুরু হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় আর কালাহারি মরুভূমির ধারে কাছে; উনিশ শতকে আনারস, চীনাবাদাম আর রাবারের চাষ শুরু হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে। কিছু কিছু ফসল যেমন শণ, জোয়ার, আপেল, নাসপাতি পূর্ব গোলার্ধের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে চাষ শুরু হয়েছে, কাজেই তাদের উৎপত্তি কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্রে ফেলা যায় না। তবে ভ্যাভিলভের নির্দেশিত কেন্দ্রের বাইরে উৎপত্তি হয়েছে এ রকম উদ্ভিদের সংখ্যা মোট ফসল সংখ্যার তিন শতাংশের বেশি নয়।

ভ্যাভিলভের পর গত পাঁচ দশকে অন্যান্য বিজ্ঞানী তাঁর উৎসকেন্দ্রের ধারণাকে আরো স্পষ্ট আর স্বচ্ছ করে তুলেছেন। তাঁরা এখন সাধারণভাবে ন'টি উৎসকেন্দ্রের হিসেব ধরেন। সেগুলোর অবস্থান এবং বিভিন্ন উৎসকেন্দ্রে যেসব ফসলের উদ্ভব হয়েছে তা একটি মানচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এসব উৎসকেন্দ্রের ধারণা থেকে আমাদের দেশের বিভিন্ন ফসলের উৎপত্তি কোথায় হয়েছে সে সম্বন্ধেও আজ অনেক কথা জানা যাচ্ছে। যেমন বাংলাদেশ আর দক্ষিণ ভারতসহ যে দক্ষিণ-এশীয় উৎসকেন্দ্র তা ধান, পাট, দেশী তুলা, নানারকম ডাল, আম, লেবু, গোলমরিচ প্রভৃতি ফসলের জন্মস্থান। এসব এখান থেকে ছড়িয়েছে আরো নানা দেশে।

আমাদের কাছাকাছি আরেক উৎসকেন্দ্র হল থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ইত্যাদি মিলিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া: এখানে উৎপত্তি হয়েছে ধান, আখ, কলা, নারকেল, ছোট এলাচ, হলুদ এসব ফসলের। উত্তর ভারত, আফগানিস্তান, ইরান মিলে রয়েছে একটি কেন্দ্র: সেখানে উৎপত্তি হয়েছে গম, রাই, তিসি, আপেল, নাসপাতি, আখরোট এসবের। মধ্যপ্রাচ্যের উৎসকেন্দ্রে জন্মেছে গম, জলপাই, আঙুর, কাঠবাদাম এসব। চীনা উৎসকেন্দ্রে জন্ম হয়েছে সয়াবীন, লটকন, লিচু, চা আর লেবুজাতীয় ফলের। ভূমধ্যসাগরের উপকূলের দেশগুলো মিলে আছে যে উৎসকেন্দ্র তাতে জন্মেছে ওট (যই), নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফল আর তরিতরকারি, যেমন বাঁধাকপি, ফুলকপি ইত্যাদি। ইথিওপিয়া হল গম, জোয়ার, রেড়ি, যব, কফি, তরমুজ এসব ফসলের উৎসস্থল।

পশ্চিম গোলার্ধে রয়েছে গোটা চারেক উৎসকেন্দ্র। তাদের মধ্যে একটি রয়েছে মেক্সিকো আর মধ্যআমেরিকায় : এখানে জন্মেছে ভুট্টা, মিষ্টি আলু, তুলা, মরিচ, পেঁপে, পেয়ারা, লাউ আর শিম। দ্বিতীয়টি রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু আর বলিভিয়ায় : এখানে উৎপত্তি টম্যাটো, আলু আর তামাকের। আরেক কেন্দ্র আছে

আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিল মিলিয়ে : এখানে জন্মেছে রাবার, চীনাবাদাম, আনারস, কাজুবাদাম, সাগু আর কোকো।

এসব ফসলের উৎপত্তিতে মানুষের কি কোনো হাত ছিল?—বিজ্ঞানীরা মনে করেন, যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। বুনো জাতের উদ্ভিদকে বেছে নিয়ে তাকে যত্ন করে চাষ করা, পরিচর্যা করা, তারপর দিনে দিনে বহু হাজার বছর ধরে তার মধ্যে বাঞ্ছিত গুণাগুণগুলোকে উজ্জীবিত করে তোলা—এ কেবল মানুষের সৃষ্টিশীল হাত, মেধা আর শ্রমের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।

[উৎস : *পরিবেশের সংকট ঘনিয়ে আসছে*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৯৬]

banglainternet.com